Contents

আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস

আবদুস সাত্তার

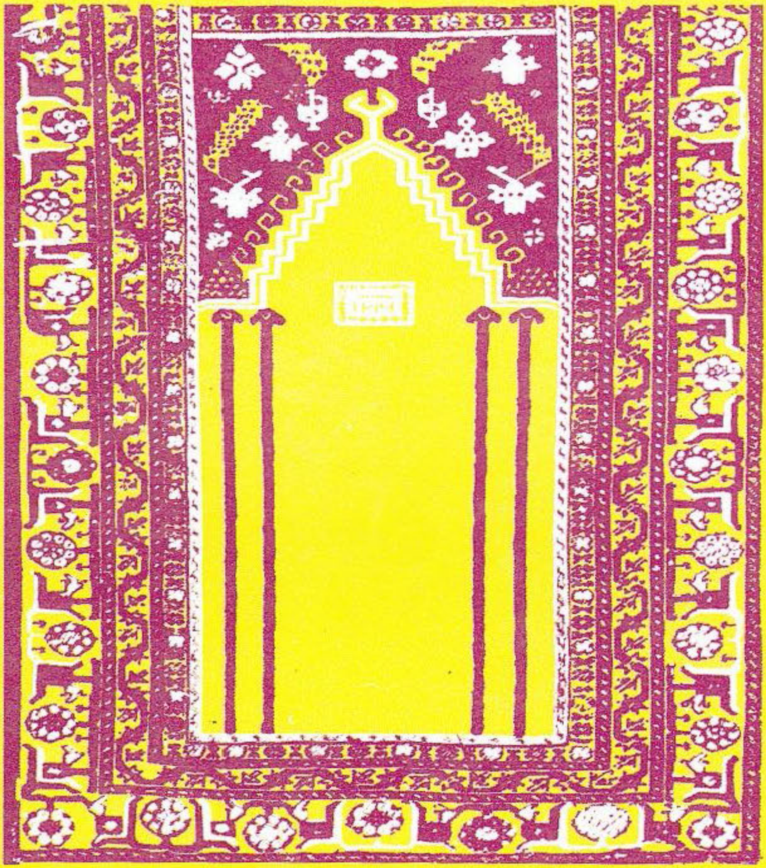

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস

আবদুস সাত্তার

মোস্তফা হারুন
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.waytojannah.com

Contents

আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস
মূল ঃ আবদুস সাত্তার
অনুবাদ ঃ মোস্তফা হারুন

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২১৬

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ৬৯৭/১
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৩৭৭.৯৭০৯

ISBN : 984-06-0910-6

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৮০

দ্বিতীয় সংস্করণ
আগস্ট ২০০৪
ভাদ্র ১৪১১
রজব ১৪২৫

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ শিল্পী
সৈয়দ লুৎফুল হক

বর্ণ বিন্যাস
নবনী কম্পিউটারস
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ৫৫.০০ টাকা

ALIA MADRASHAR ITIHASH (A History of the Madrasha-i-Alia) : Written by Maulana A. Sattar in Urdu and translated by Mustafa Haroon into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 August 2004

Web Site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

PRICE : TK. 55.00 ; US$: 2.00

www.waytojannah.com

সূচিপত্র

মহানবীর আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা	১৫
সোফ্‌ফার মাদ্রাসা	১৬
হযরতের আমলের পাঠ্যবিষয়	১৭
খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা	১৮
পাক-ভারতে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা	১৯
ইংরেজ শাসনের পূর্বে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা	২০
প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা	২১
মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা	২২
মসজিদ এবং খানকাহের শিক্ষা	২২
মুসলিম শাসনামলের কতিপয় মাদ্রাসা	২৩
বখতিয়ার খিলজির মাদ্রাসা	২৩
লক্ষ্মণাবতী ও গৌড়ের মাদ্রাসা	২৩
হোসেন শাহের মাদ্রাসা	২৪
ঢাকার মাদ্রাসা	২৫
মুর্শিদাবাদের মাদ্রাসা	২৬
বোহারের (বর্ধমান) মাদ্রাসা	২৭
আধুনিক এবং পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য	২৯
মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দিনগুলি	৩০
বাংলার দেওয়ানী ইংরেজদের হাতে সোপর্দের কারণ	৩১
সম্রাট শাহ আলমের দূরবস্থা	৩১
মোল্লা মাজদুদ্দিন ও কলিকাতা প্রতিনিধিদলের সহিত হেস্টিংসের সাক্ষাৎকার	৩২
আলিয়া মাদ্রাসার পত্তন	৩৬
মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোম্পানীকে গভর্নরের সুপারিশ	৩৬
মাদ্রাসার ব্যয়নির্বাহ	৩৮
মাদ্রাসার আদর্শ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরো ব্যাখ্যা	৩৮
মাদ্রাসা মহালের ইতিবৃত্ত	৪০
মাদ্রাসা মহালের জন্য আমিন নিয়োগ	৪২
আমিনের পদচ্যুতি এবং কালেক্টর নিয়োগ	৪২

গ্রন্থাগার স্থাপন প্রকল্প ● ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ● পাকুন্দিয়া উপজেলা মডেল মসজিদ লাইব্রেরী
২০৭

www.waytojannah.com

মাদ্রাসা মহালের উপর নদীয়ার জমিদারের দাবি	৪৩
মাদ্রাসার সংস্কার এবং দরসে নিজামিয়ার ইতিবৃত্ত	৪৩
মাদ্রাসার জন্য প্রবর্তিত প্রাথমিক আইন-কানুন	৪৭
ইংরেজ সেক্রেটারী নিয়োগের জল্পনা-কল্পনা	৪৮
মাদ্রাসার প্রথম সেক্রেটারী	৪৯
মাদ্রাসা সংস্কারের দ্বিতীয় পর্যায়ের ধারাসমূহ	৪৯
পরীক্ষার প্রবর্তন ও তাহার বিরোধিতা	৫০
সেকালের পরীক্ষার রীতিনীতি	৫১
মাদ্রাসার প্রথম নিয়মতান্ত্রিক পরীক্ষা	৫২
১৮১৩ সালের শিক্ষা-নীতি	৫২
মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন	৫৩
আলিয়া মাদ্রাসা এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের খরচের তারতম্য	৫৪
১৮২৩ সালের শিক্ষা কমিটি	৫৪
সহকারী সেক্রেটারী নিয়োগ	৫৫
মাদ্রাসার দ্বিতীয় ভবন	৫৫
মাদ্রাসার শিলালিপি	৫৬
লাইব্রেরীর পত্তন	৫৭
সংস্কৃত কলেজ	৫৭
আলিয়া মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা	৫৮
মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা ব্যর্থতার কারণ	৫৮
ইংরেজদের শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য	৫৯
শিক্ষানীতি সমর্থিত	৬১
এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কলেজের গোড়াপত্তন	৬২
মিঃ গ্রান্টের স্বপ্ন সফল	৬৩
মাদ্রাসা সংস্কারের আসল উদ্দেশ্য	৬৭
ইংরেজি শিক্ষা এবং আলেমদের বিরোধিতা	৬৮
হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষাকে স্বাগত জানায়	৬৮
ইংরেজি শিক্ষার আরো সম্প্রসারণ	৬৯
পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম নিয়া মতবিরোধ	৭০
লর্ড ম্যাকালের সিদ্ধান্ত	৭১
লর্ড ম্যাকালের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মেজর বাসু	৭১
১৮৩৭ সালের শিক্ষা এ্যাক্ট ও ফারসীর চিরবিদায়	৭৪
ফারসী ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে কতিপয় ব্যাখ্যা	৭৬
লর্ড অকল্যান্ডের ঘোষণা	৭৭

www.waytojannah.com

মাদ্রাসায় প্রিন্সিপাল নিয়োগ	৭৭
প্রিন্সিপালের সংস্কার প্রয়াস ও মাদ্রাসায় গোলযোগ	৭৮
গোলযোগের কারণ	৭৯
আলিয়া মাদ্রাসার দুইটি বিভাগ	৭৯
মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যর্থতার কারণ	৮০
এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের প্রস্তাব	৮০
মেট্রোপলিটন কলেজের ইতিবৃত্ত	৮১
ব্রাঞ্চ স্কুল	৮১
এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের প্রাথমিক বাজেট	৮২
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন	৮৩
মাদ্রাসার প্রতি লে. গভর্নরের কোপদৃষ্টি	৮৪
মাদ্রাসা বন্ধ করিবার প্রস্তাব	৮৬
গভর্নর জেনারেল কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান	৮৬
মিঃ লিজের দ্বিতীয় রিপোর্ট	৮৭
প্রিন্সিপালের আরো একটি প্রস্তাব	৮৭
১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ও আলিয়া মাদ্রাসা	৮৯
প্রিন্সিপাল ও লেঃ গভর্নরের টাগ অব ওয়ার	৮৯
মুসলমান কাযী নিয়োগ ব্যবস্থা বাতিল	৯০
মাদ্রাসায় কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস	৯১
পুনরায় মাদ্রাসা তদন্ত কমিটি গঠিত	৯১
কমিটির রিপোর্ট	৯২
হুগলী মাদ্রাসা	৯৩
প্রিন্সিপাল পদ বিলোপের ষড়যন্ত্র	৯৩
হুগলী মাদ্রাসার সংস্কার	৯৪
তদন্ত কমিটির বিশেষ সুপারিশ	৯৫
রিপোর্ট সম্পর্কে লেঃ গভর্নর	৯৫
মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি	৯৬
কমিটির উদ্দেশ্যে লেঃ গভর্নরের চিঠি	৯৭
ম্যানেজিং কমিটির রিপোর্ট	১০০
রিপোর্ট সম্পর্কে ডিরেক্টরের মতামত	১০৫
লেঃ গভর্নরের পক্ষ হইতে সেক্রেটারীর জবাব	১০৮
মাদ্রাসার নূতন পাঠ্য পুস্তক	১১০
ভারত সরকারের বিশেষ সার্কুলার	১১১
১৮৭২ সালে বাংলার শিক্ষা পরিস্থিতি	১১৪

www.waytojannah.com

মোহসীন ফান্ড	১১৫
হাজি মোহাম্মদ মোহসীন	১১৬
অসিয়ত নামা	১১৭
মুতাওয়াল্লীদের দুর্নীতিপরায়ণতা	১১৯
মোহসীন ফান্ড সম্পর্কে সরকারের নীতি	১২০
হুগলীর মোহসিন কলেজ	১২২
বাংলা সরকারের নূতন শিক্ষানীতি	১২৩
প্রিন্সিপাল পদের শর্তাবলী	১২৫
তিনটি নূতন মাদ্রাসা	১২৬
মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য	১২৭
১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশন	১২৮
নওয়াব আবদুল লতিফের বিবৃতি	১২৮
মকতব	১২৯
প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষা-মাধ্যম	১২৯
প্রাইমারী শিক্ষার উন্নতির উপায়	১৩০
মাধ্যমিক শিক্ষা	১৩৩
উচ্চ বিদ্যালয়	১৩৪
বাংলা ও বিহারের মুসলমানদের মাতৃভাষা	১৩৫
সৈয়দ আমীর আলীর মতামত	১৩৬
মাদ্রাসা শিক্ষা	১৩৬
প্রাইমারী শিক্ষা	১৩৭
মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা	১৩৮
ইংরেজির প্রতি ঔদাসীন্যের অন্যান্য কারণ	১৩৯
উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা	১৪১
কমিশনের ১৭টি প্রস্তাব	১৪৩
রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের প্রস্তাব	১৪৪
আলিয়া মাদ্রাসায় কলেজ প্রবর্তন	১৪৬
এই সময় মাদ্রাসার সামগ্রিক অবস্থা	১৪৭
মুসলমান ইন্সপেক্টর নিয়োগ	১৪৮
১৮৮৮ সালের পরীক্ষার্থীদের বিবরণ	১৪৯
ছাত্রাবাস সমস্যা	১৫১
পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্ট	১৫৩
১৮৯২-৯৩ সালে মাদ্রাসার খরচের তালিকা	১৫৪
প্রিন্সিপালের রদবদল	১৫৫
মাদ্রাসা সংস্কারের নূতন উদ্যোগ	১৫৬

www.waytojannah.com

জনশিক্ষা বিভাগের পাঁচসালা রিপোর্টের উদ্ধৃতি (১৯০২-৬)	১৫৭
মুসলিম ইন্সটিটিউট	১৫৯
মুসলিম ইন্সটিটিউটের গোড়াপত্তন	১৬০
মিঃ চীপম্যানের বিবৃতি	১৬১
আর্ল কনফারেন্স	১৬৩
বঙ্গভঙ্গ	১৬৩
আর্ল কমিটির রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার	১৬৩
আর্ল রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পদক্ষেপ	১৭১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৭৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়াত বিভাগ	১৭৪
মাদ্রাসার জন্য আরেকটি স্কীম	১৭৫
মোহামেডান এডভাইজারী কমিটি : ১৯১৫	১৭৭
কমিটির আলোচ্য বিষয়াদি	১৮১
পরীক্ষাসমূহ	১৮৬
শিক্ষক মণ্ডলী	১৮৭
ম্যানেজিং সাব-কমিটি	১৮৮
এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ	১৮৯
এই বিভাগের স্টাফ	১৯০
হোস্টেলদ্বয়	১৯১
মুসলিম ইন্সটিটিউট	১৯২
রিপোর্ট ও সরকারী পদক্ষেপ	১৯৩
১৯২২ সালের পুরানাপন্থী মাদ্রাসাসমূহ	১৯৫
১৯৩২ সাল নাগাদ নবপ্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহ	১৯৫
মুসলিম এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি	১৯৬
ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার জন্য সরকারী সাহায্য	১৯৮
এ. কে. ফজলুল হকের ভাষণ	১৯৮
মওলা বখ্‌শ কমিটির সদস্যবৃন্দ	১৯৮
মোয়াজ্জেম উদ্দিন কমিটি (১৯৪৬)	২০১
মোয়াজ্জেম উদ্দিন সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবসমূহ	২০২
মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড	২০৬
১৯৫২ সালে আলিয়া মাদ্রাসা	২০৭
হোস্টেল	২০৮
মাদ্রাসার নূতন ভবন	২০৮
বিভিন্ন সময়ে নিয়োজিত আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপালবৃন্দ	২০৯
মুসলমান প্রিন্সিপালদের সংক্ষিপ্ত জীবনী	২১১

www.waytojannah.com

প্রকাশকের কথা

১৭৫৭ সালে সুবায়ে বাংলার শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ার পর এ অঞ্চলের মুসলমানদের তাহজীব-তমদ্দুন ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অধঃপতন শুরু হয়। ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষা থেকে মুসলমানরা নিজেদেরকে দূরে রাখার ফলে দিনে দিনে তারা অবহেলিত ও অসহায় হয়ে পড়তে থাকে। সরকারী চাকরি-বাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা অর্থনৈতিকভাবে দীনতার শিকারে পরিণত হয়। মোটকথা, শিক্ষা-দীক্ষা, তাহজীব-তমদ্দুন, রাজনীতি-অর্থনীতি সকল বিষয়ে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়তে থাকে। এমনি এক ক্রান্তিকালে কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান তৎকালীন বাংলার শাসনকর্তা লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই মর্মে একটি আবেদন করেন যে, তিনি যেন এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন যেখানে মুসলমানদের ছেলে-সন্তানরা ইসলামী ও যুগোপযোগী লেখাপড়া শিখতে পারে।

এই পটভূমিতে ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতার শিয়ালদা স্টেশনের কাছে একটি ভাড়া বাড়িতে প্রস্তাবিত মাদ্রাসার উদ্বোধন করে এর যাত্রা শুরু করা হয়। যা পরে 'আলিয়া মাদ্রাস' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মাদ্রাসার বৃহত্তর অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। এখানে প্রথমে ভিক্টোরিয়া পার্কের সন্নিকটে ইসলামিয়া কলেজের একটি অংশে অস্থায়ীভাবে কার্যক্রম চালানো হয়। পরবর্তীতে বকশী বাজারে এর স্থায়ী কাঠামো স্থাপন করা হয়।

তৎকালীন কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিল মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, তাহজীব-তমদ্দুন, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চেতনা। এই মাদ্রাসা থেকে হাজার হাজার আলেমে দীন সৃষ্টি হয়েছেন, যাঁরা পরবর্তীতে উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তাই আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস নয় বরং একে বাংলা-আসামের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাসের মুখবন্ধ বলা চলে। 'আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস' শীর্ষক মূল গ্রন্থটি উর্দুভাষায় রচনা করেন আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রভাষক মাওলানা আবদুস সাত্তার এবং তা ১৯৫৯ সালে আলিয়া মাদ্রাসার গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক জনাব মোস্তফা হারুন।

www.waytojannah.com

গ্রন্থটি প্রাচীন নথিপত্র ও দলিলনির্ভর। এধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুবই দুর্লভ। এ বিবেচনায় গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ১৯৮০ সালে আলিয়া মাদ্রাসার ২০০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়।

গ্রন্থটি প্রকাশের পর পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তাই পাঠক চাহিদার কারণে এবার এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এধরনের একটি মূল্যবান গ্রন্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে পুনঃপ্রকাশ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থটি ইতিহাসবেত্তা ও 'সাধারণ পাঠকদের এ উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও তাহজীব-তমদ্দুন বিকাশের ইতিহাস জানতে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.waytojannah.com

উৎসর্গ

হাজী মোহাম্মদ মোহসীন

মোল্লা মাজদুদ্দিন

www.waytojannah.com

ভূমিকা

আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস কোন একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষের ইতিহাস নয়, এটা মূলত তদানীন্তন সুবায়ে বাংলার আরবী শিক্ষা তথা গোটা মুসলমান জাতির শিক্ষা, মর্যাদা এবং আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষার সংগ্রাম বিধৃত একটি করুণ আলেখ্য।

আজ বক্ষ্যমাণ এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে স্বভাবতই মন কতগুলো বিশেষ কারণে আবেগ-আপ্লুত হয়ে ওঠে। আর তা হলো অতীতে প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনৈক্য। ভাবতে অবাক লাগে, ইংরেজ শাসিত দেশে মুসলমানরা আলিয়া মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল আজও তা কেন ফলবতী হতে পারেনি, আজ নতুন করে ভেবে দেখার সময় এসেছে।

মুসলমানরা ছিল বীরের জাতি, ইংরেজ বেনিয়ারা ছলে-বলে-কৌশলে তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাদের প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা ও মর্যাদা হরণ করার জন্য পদে পদে যেসব ষড়যন্ত্র আরোপ করেছিল, আলিয়া মাদ্রাসা তারই একটি ফসল। বাহ্যত এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন করা হয়েছিল আলাদা জাতি হিসাবে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত, যাতে মুসলমানদের ধর্ম, কৃষ্টি ও আদর্শ রক্ষা পায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়াই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য। গ্রন্থটির আদ্যপান্ত পাঠ করলে স্বভাবতই মনে হবে আলিয়া মাদ্রাসা পত্তন করে ইংরেজরা কোনদিনই এই প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়নি। বরং কৌশলে এই প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করে এবং ইংরেজি ভাষা ও কৃষ্টি চাপিয়ে দেয়ার জোর চেষ্টা চালায়। ফলে, এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সত্যিকারভাবে ইংরেজদের আশা যেমন পূরণ হয়নি, তেমনি পুরোপুরিভাবে মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষারও পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি। সেই একই রকম দ্বন্দ্ব এবং মিশ্র প্রয়াস নিয়ে এই আলিয়া মাদ্রাসা (এবং অসংখ্য অনুসৃত মাদ্রাসা) আজো দাঁড়িয়ে আছে।

দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আলিয়া মাদ্রাসার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে হলে পুরনো দিনগুলোর দিকে দৃকপাত করতে হয়। মনে পড়ে ১৭৭৫ খৃস্টাব্দের ১২ই আগস্ট সুবায়ে বাংলার (বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যা) দিওয়ানী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে হস্তান্তরিত হয়। ক্রমে অন্যান্য অঞ্চলের শাসনও হস্তচ্যুত হতে শুরু হয়েছিল। চারদিকে ব্যাপক অরাজকতা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৭৮৮ খৃস্টাব্দে জনৈক গোলাম কাদির খান রোহিলা কর্তৃক দিল্লীর 'কস্‌রে মুআল্লায়' প্রবেশ করে মোগল সম্রাট শাহ-আলমের চক্ষু দুটি উৎপাটনের ঘটনা থেকেই দিল্লী শাসনের শেষ দিনগুলোর নমুনা প্রমাণিত হয়।

সে সময় মুসলমানদের একতা ছিল না — অন্তত যারা দেশ শাসন করতে পারে তাঁদের মধ্যে। তাঁদের সামরিক শক্তি, আর্থিক শক্তি, সাহস, বল—সবই ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা পুরোদমে ছিল। যার ফলে সব শক্তিই জাতির বিপক্ষে ব্যয়িত হয়েছিল।

www.waytojannah.com

সম্রাট শাহজাহানের সময়ে অবাধ বাণিজ্যের সনদ লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তখন কি কেউ চিন্তা করতে পেরেছিল এই বণিকের মানদণ্ড একদিন দেখা দেবে রাজদণ্ড রূপে ? তখন থেকে ব্যবসায়ের মাধ্যমে এরা এখানকার মুসলিম শাসকদের দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হতে থাকে এবং নেকড়ের মতো ওঁৎ পেতে আক্রমণ ও দেশ দখলের সুযোগ খুঁজতে থাকে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দিওয়ানী লাভের পর থেকে এরা আরও সুযোগ পেয়ে যায়। এবং এই সুযোগকে কূটনৈতিকভাবে কার্যকরী করতে সচেষ্ট হয়।

মুসলিম জাতির হাত থেকে ভারতবর্ষ ইংরেজদের হাতে চলে যাবে, তা মীর জাফররাও কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু যে সময়ে বুঝতে সক্ষম হয়েছিল তখন আর কোন উপায় ছিল না। তার পক্ষে নবাবীর চেয়ে মুসলিম শাসনের অবসান কামনা করা কি সম্ভবপর ছিল ?

কবি আকবর ইলাহাবাদী গাদ্দারীর ইতিহাস তাঁর ভাষায় সংক্ষেপে পুরোটাই তুলে ধরেছেন।

জাফর আজ বাঙ্গালা, সাদেক আজ দক্ন
তঙ্গে কওম, তঙ্গে দ্বীন, তঙ্গে ওয়াতন

ইংরেজদেরকে ভারতের দুই অঞ্চলে দুই মহাজন সাহায্য করেছিলেন। একজন নিযাম-হায়দ্রাবাদের মীর সাদিক, দ্বিতীয় হচ্ছেন মীর জাফর আলী খান। যার ফলে ধীরে ধীরে এই জাতির ধর্ম ও স্বাধীনতাও পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইংরেজরা নিজেরা যুদ্ধ করে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়নি। হয়তো সে সময় তাদের পক্ষে তা করা সম্ভবও ছিল না। মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর লোভী নেতৃত্বের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। পলাশী যুদ্ধের এই প্রহসনে ১৭৫৭ সালে সুবায়ে বাংলার শাসনভার ইংরেজদের হাতে রাজনৈতিকভাবে হস্তান্তরিত হয়। মনে হয় তখনও দিল্লী অঞ্চলের দিওয়ানী ইংরেজদের হাতে অর্পিত হয়নি। সুবায়ে বাংলার শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার পর থেকে আরম্ভ হয় মুসলমানদের তাহজীব-তমদ্দুন ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর কূটনৈতিক আক্রমণ। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্তন ব্যতীত এটা সম্ভব নয়, তাই ইংরেজরা সন্তর্পণে শিক্ষা পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে।

দিওয়ানী বিভাগে স্বয়ং ইংরেজরা এবং তাদের পদলেহনকারী হিন্দুরা নিয়োজিত ছিল। এদিকে মুসলমানদেরকে পদে পদে বঞ্চিত করা ছিল তাদের আসল ইচ্ছা। ফলে, মুসলিম জাতি ধীরে ধীরে দারিদ্র্যের পথে অগ্রসর হতে থাকে।

দিওয়ানী ছাড়া প্রশাসন বিভাগে তখনও মুসলমানরা সমাসীন ছিল। এরপর থেকে মুসলমানদের কিভাবে উৎখাত করা যায় প্রশাসন বিভাগে সেই ষড়যন্ত্র চলল। কারণ, তখনও রাষ্ট্র ভাষা ফারসী পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি।

রাষ্ট্রভাষা ফারসীকে পরিবর্তন করে সে স্থলে ইংরেজি প্রতিষ্ঠা করাও সহজসাধ্য ছিল না। এবং সেকালে ফারসী জানা হিন্দু মুসলমানদের সংখ্যাও কম ছিল না।

১৭৮০ সালে কলিকাতাতে এই মাদ্রাসার বুনিয়াদ রাখা হয়। নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে অবশেষে ওয়েলেসলী স্কোয়ারে মাদ্রাসার ইমারত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু

www.waytojannah.com

এখানকার উলামারা ভারত বর্ষকে 'দারুল হরব' বলে বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং ছাত্রগণও ঐভাবে শিক্ষিত হতে থাকে।

অতঃপর মুসলিম জাতির হাত থেকে প্রশাসন বিভাগ হস্তান্তরিত করবার পালা আসে। পূর্বে মাদ্রাসার শিক্ষিত ছাত্ররাই কাযী, এসেসর ও জজ ইত্যাদি পদে নিযুক্ত হতো। পরে তাও না হওয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

বাহ্যত মাদ্রাসা সংস্কারের নামে নানা কমিটি ও সুপারিশ গৃহীত হতে থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্বল করার ব্যাপারে সকল প্রচেষ্টা চালানো হয়।

জীবিকার ক্ষেত্রে মাদ্রাসার ছাত্ররা যাতে একটা পথ খুঁজে পেতে পারে এজন্য আলিয়া মাদ্রাসাতে 'ইল্‌মে তিব্ব' সিলেবাসভুক্ত করারও প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকার তা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষাবধি শুধু ধর্ম শিক্ষার জন্যই এই মাদ্রাসা কোন রকমে টিকে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আলিয়া মাদ্রাসাকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাই ছিল মুসলমানদের আসল শিক্ষার মাধ্যম। কিন্তু কালক্রমে ইংরেজরা এর পাশাপাশি একটি বিকল্প শিক্ষা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলে।

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার এক শতাব্দী পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এবং সামগ্রিকভাবে ইংরেজি এই দেশের রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হয়। এভাবে মুসলমানরা ধীরে ধীরে রাজ্যহারা, ধনহারা, মান-সম্মানহারা হয়ে এমন দরিদ্র জাতিতে পরিণত হয়, যা কোনদিন তারা কল্পনা করতে পারেনি।

এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভাষা হিসাবে ফারসী, আরবী ইত্যাদি ছিল এবং ভালভাবে এর শিক্ষাসূচিতে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। মূলত তা ছিল ধর্মভিত্তিক, এমনকি হিন্দুদের শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিল ধর্মভিত্তিক। তাই বিদেশী ভাষার মাধ্যমে নৈতিকতাহীন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণে মুসলমান কিছুতেই রাজী হয়নি। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু মুসলমান ইংরেজি পড়তে বাধ্য হয়েছে এবং ইংরেজি শিখে তাদের গোলাম হয়েছে। এ ব্যাপারে আকবর ইলাহাবাদী তাঁর ভাষায় বলেন ঃ

আহবাব কেয়া নুমাযাঁ কর গ্যায়ে
বি, এ, কিয়া, নওকর হুয়ে, পেনশন মিলি আওর মর গ্যায়ে।

বন্ধুগণ কি কীর্তিই না করলেন। বিএ পাস করার পর, ইংরেজের চাকর হলেন, চাকরির অবসানে পেনশন পেয়ে মৃত্যুবরণ করলেন।

মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন-বর্জিত এই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণতি এ ছাড়া আর কি হতে পারে ?

এদেশে ইংরেজ সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালেও আকবর ইলাহাবাদী বলেছিলেন ঃ

বকুন তাজিন পায়ে খোদ ববুট ডাসেন অ পাতলুন
জে স্যার সৈয়দ খবরদার অ জেরাহ্ অ রসম মনযেলেহা

ডাসেন কোম্পানি কর্তৃক প্রস্তুত উচ্চ গোড়ালি যুক্ত বুট জুতা পরিধান কর, স্যুট কোটে সুশোভিত হও এবং মস্তক-বাস ইত্যাদি সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আহমদের পরামর্শ গ্রহণ কর।

www.waytojannah.com

এই ধর্মহীন, নৈতিকতাহীন ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে বেপর্দা, চরিত্রহীনতা ও ধ্বংস এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এ সত্যের নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন মোটেই নেই।

তবে এই শিক্ষার ফলে শিল্প-কারখানা, চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে জনগণ যে সুযোগ পেয়েছে তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

যে জাতি ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়, তাকে কে রক্ষা করতে পারে ? একটা জাতির মধ্যে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ বিদ্যমান এবং রাষ্ট্রও এগুলিকে নিয়ে গঠিত। একটি জাতির উত্থান প্রকৃতপক্ষে তার ত্যাগ ও কুরবানীর ভিত্তিতে সম্ভব হয়। লোভ-লালসা, ইন্দ্রীয়পরায়ণতা, ঈর্ষা-হিংসার ফলে জাতি পরাধীন ও দাসত্বে পদানত হয়ে থাকে। ইক্‌বালের ভাষায় ঃ

শামসীর অ সেনান আওয়াল তাউস অ রবাব আখের

আদর্শ এবং ত্যাগের প্রেরণা ছিল না বলেই সিরাজউদ্দৌলা, টিপু, হায়দার আলী ও ওয়াহাবী আন্দোলন এদেশের স্বাধীনতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। যে কালে তারা স্বাধীন ছিল এবং পরবর্তী কালে নীতি বিবর্জিত অবস্থায় তাদের কি পরিণাম হয়েছে তা সহজে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আজ তাদের সম্পর্কে জানতে হলে শুধু পুস্তকের পাতা উল্টানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মুসলমানান্ দর গোর, মুসলমানী দর কিতাব

মুসলমান কবরে শায়িত এবং মুসলমানী কিতাবে সুরক্ষিত?

সুতরাং স্বাধীনতা লাভের পরও এই দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা নৈতিকতাভিত্তিক সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত হতে পারেনি। এখন আর আমাদের উপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের শিক্ষা ব্যবস্থা চাপানোর প্রশ্ন যেমন উঠে না, তেমনি ধর্ম শিক্ষা সর্বস্তরে বাধ্যতামূলক করার জন্যও কোন বিদেশী সাহায্যের আবশ্যক হয় না। এ ব্যাপারে আমরাই যথেষ্ট। বলা বাহুল্য,

আফসোস করার অবসর নাই,
আফসোস বুঝবারও অনুভূতি নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে জাতির মাঝে নৈতিক দিক শূন্য থেকে শূন্যতর হয়ে আসছে। এই মানসিকতা জাতির সম্মান, স্বাধীনতা ও অস্তিত্বের প্রতি দৈনন্দিন এক হুমকিস্বরূপ বিরাজ করছে।

আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস আজ জাতির পতনের ইতিহাস। অনুভূতিহীন জাতির সম্মুখে এ আলোচনা কি ভাল বোধ হবে ? তবে নিরাশ হওয়া চলবে না। মানুষ যেখানে পতিত হয় সেখান থেকে উত্থানের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। অনুভূতি জাগ্রত হলে উন্নতির পথ সুপ্রশস্ত হয়।

বিনীত

শবেবরাত, ১৪০০ হিজরী।

মোহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ
অধ্যক্ষ, আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা

www.waytojannah.com

মহানবী (সা)-কে প্রেরিত আল্লাহর বাণীর সর্ব প্রথম নির্দেশে শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইসলামী বিধানে শিক্ষা ও ধর্ম সংরক্ষণের প্রশ্ন সম্পূর্ণ একীভূত এবং তাহা একে অপরের সহিত গভীরভাবে সম্পৃক্ত। শিক্ষা সম্পর্কে কুরআন মজিদে বারংবার উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে এবং ইহার মাহাত্ম্যের প্রতি লোকদেরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করা হইয়াছে। ধর্ম শিক্ষার ব্যাপারে বুখারী শরীফে বলা হইয়াছে, আল্লাহ যাহার প্রতি প্রসন্ন হন তাহাকে ধর্মীয় প্রজ্ঞা অনুধাবনের ক্ষমতা প্রদান করেন। আবূ যর (রা) বর্ণিত এক হাদীসে বলা হইয়াছে, জ্ঞানীগুণিদের সমাবেশে অবস্থান করা এক হাজার রাকাত নামায, এক হাজার রোগী পরিচর্যা এবং এক হাজার জানাযায় অংশগ্রহণের চাইতেও উত্তম।

মহানবীর আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা

ইসলামের উন্মেষকাল হইতেই রসূলে করিম (সা) শিক্ষা বিস্তারকল্পে সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি সাফা পাহাড়ের পাদদেশে 'দারুল আরকামে' সর্ব প্রথম মাদ্রাসার পত্তন করেন। এই শিক্ষাগারে রাসূল (সা) নিজেই শিক্ষকতা করেন। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষায়তনের প্রথম ছাত্র ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা), হযরত ওমর (রা) ও অন্যান্য গণ্যমান্য সাহাবী।

পরবর্তী পর্যায়ে হযরত যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন এই শিক্ষালয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় হযরত ইবনে উম্মে মকতুম ও মাসআব বিন উমায়রের উপর। মদীনায় হিজরতের পর হযরত ধর্ম প্রচারের ব্যাপক পরিমণ্ডলে জড়াইয়া পড়েন। সকল ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সময় করিয়া শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারকল্পে চেষ্টা করিতেন এবং স্থায়িভাবে উক্ত শিক্ষালয়ে শিক্ষানবীশদের লেখাপড়া তদারকের জন্য আবদুল্লাহ বিন সাইদ ইবনুল আসকে নিয়োজিত করেন। হযরতের এই প্রচেষ্টা হইতে প্রতীয়মাণ হয় যে, যখন একমাত্র ইহুদী সম্প্রদায়ের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন শিক্ষার প্রচলন ছিল না, তখন মুসলমানদের আলাদা শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনে কতখানি চেষ্টা এবং শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। হিজরতের দেড় বছর পর বদরের যুদ্ধ হইতে যখন ষাট-সত্তরজন অমুসলিমকে

Contents

গ্রেফতার করিয়া মদীনায় আনয়ন করা হয় তখন তাহাদের 'ফেদিয়ার' বিনিময়ে মাথাপিছু দশটি শিশুকে লেখাপড়া শিক্ষা দিবার কাজে নিয়োজিত করা হয়। কেননা এসব বন্দীর কোনরকম আর্থিক যোগ্যতা ছিল না, তবে তাহারা লেখাপড়া জানিত।

হযরত উবাদাহ্ বিন সামেত (রা) বলেন, হযরত আমাকে সুফ্ফাতে লোকদেরকে লেখাপড়া এবং কুরআন পড়াইবার কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

সোফ্ফার মাদ্রাসা

মসজিদে নবুবী সংলগ্ন শিক্ষায়তনকে মাদ্রাসা-ই-সোফ্ফা বলা হইত। এখানে স্থানীয় গরীব ছাত্র এবং বহিরাগত ছাত্রদের আবাসিক বন্দোবস্ত ছিল। এখানে কুরআন-হ্দীস এবং ফিক্হ পড়ানো হইত। এখানে হযরত নিজেই শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করিতেন। হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত মায়াজ বিন জাবাল, হযরত আবূ যর গিফারী প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী সাহাবী (রা) ছিলেন এই মাদ্রাসার অন্যতম ছাত্র। দূর-দূরান্ত হইতে ছাত্ররা আসিয়া এখানে শিক্ষা লাভ করিত এবং পুনরায় দেশে ফিরিয়া যাইত। এভাবে সোফ্ফা মাদ্রাসাটি মদীনার কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তন হিসাবে মর্যাদা লাভ করে। শিক্ষা সমাপ্তির পর এই মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইত এবং তাহারা বিভিন্ন গোত্রে গিয়া দ্বীনিয়াত ও কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করিত। বিভিন্ন গোত্রের লোকরা এই মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করিবার জন্য তাহাদের অঞ্চল হইতে প্রতিনিধিও প্রেরণ করিতেন। তাহারা এখান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া গোত্রের লোকদের কাছে ফিরিয়া যাইত এবং তাহাদের লেখাপড়া শিখাইত। এ ধরনের সকল বহিরাগত ছাত্রের খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত এখানেই হইত। ইহাদের দেখাশোনা ও চরিত্রগঠনের সকল বন্দোবস্ত হযরত নিজেই পরিচালনা করিতেন।

এছাড়াও মদীনার বিভিন্ন মহল্লার মসজিদ সংলগ্ন আরো অনেক এই ধরনের মাদ্রাসার পত্তন হয়। এই সব মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনাও হযরত নিজেই করিতেন। অতঃপর অল্পকালের মধ্যেই এই শিক্ষা-ব্যবস্থা এতখানি উৎকর্ষ লাভ করে যে, ইহার পর আয়াত নাজিল হইল যে, এখন কুরআন হইতে সকল ধারকর্জ ও ব্যবসায়িক লেনদেন লিখিতভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে।[১]

স্বভাবতই কায়কারবার ও লেনদেনের পরিমাণ অত্যধিক হইয়া থাকে। এসব লেনদেন ও ধার সম্পর্কিত কাগজপত্র লিখিবার জন্য বহু শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন হয়। কুরআনের বাণী অনুযায়ী জানা যায় যে, তখন এত লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, এই কাজ সম্পন্ন করিতে আর তেমন বেগ পাইতে হয় নাই।

১. কুরআন ২/২৮২

www.waytojannah.com

Contents

শুধু দেশীয় ভাষা (আরবী) শিখিয়াই যে তাঁহারা সন্তুষ্ট রহিয়াছেন এমন নয়, বিদেশী ভাষাও তাঁহারা আয়ত্ত করিলেন। কেননা, হযরতের জন্য বিদেশী ভাষাসমূহের বেলায় অনুবাদকের প্রয়োজন ছিল। হযরত জায়েদ বিন ছাবেত (রা) বিদেশী ভাষার বিশেষজ্ঞ হিসাবে হযরতের দরবারের 'মীর মুন্সী' হিসাবে আখ্যায়িত হন। তিনি ফারসী, হাবসী, হিব্রু এবং রোমানদের ভাষা জানিতেন।[২] তদানীন্তন জাগ্রত বিশ্বের এই ভাষা চতুষ্টয়ই ছিল প্রধান ভাষা।

হযরতের আমলের পাঠ্য বিষয়

তদানীন্তন কালে পাঠ্য বিষয়ে প্রধানত কুরআন, হাদীস, ফরায়েজ (উত্তরাধিকারের সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কিত) চিকিৎসা শাস্ত্র, ইলমুল আনছাব (কুষ্ঠি গণনা) ও তাজবীদ পাঠ্যভুক্ত ছিল। যে শিক্ষক যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ থাকিতেন তিনি সেই বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেন।

শারীরিক ব্যায়াম সম্পর্কেও তখন শিক্ষা দান করা হইত। শারীরিক ব্যায়ামের পাশাপাশি অশ্বারোহণ, তীরন্দাজী ও অভিযানমূলক কসরতও শিখানো হইত।[৩]

অতঃপর এই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে মদীনার বাইরেও ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মরুভূমির বেদুইন এবং সভ্য নাগরিক ক্রমান্বয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। ইসলামের ক্রমবর্ধমান জনশক্তি বৃদ্ধির সাথে এই শিক্ষাও দ্রুততালে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মহানবী (সা)-এর জীবনের শেষ অধ্যায়ে আরব ভূখণ্ডের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ইসলাম ছড়াইয়া পড়ে এবং শিক্ষার জন্য অবশ্যম্ভাবীরূপে একটি সুষ্ঠু কাঠামো তৈরির প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই পরিকল্পনাধীনে প্রত্যেক গোত্রের লোকদের কুরআন-হাদীস শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গরুত্ব আরোপ করা হয়। এই শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য প্রধানত দুইটি পন্থা গ্রহণ করা হয়। হযরতের দরবার হইতে সরাসরি বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্তদের আঞ্চলিকভাবে বাহিরে পাঠানো হইত অথবা বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদেরকে নির্দেশ দেওয়া হইত তাঁহারা যেন স্ব-স্ব এলাকায় উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর দরবার হইতে আমর বিন হাজমকে যে সারগর্ভ নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল তাহা অদ্যাবধি ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে।[৪]

---

২. কেত্তানী ১/২০২ ইবনে আবদ্ রাব্বাহু কৃত।

৩. জমউল জওয়ামে লিস্ সয়ূতী

৪. তারিখে তিবরী, পৃ. ১৭৩৭

www.waytojannah.com

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শিক্ষার গুরুত্ব এবং পরিমণ্ডল আরো সম্প্রসারিত হয়। খোলাফাদের কাছে মহানবীর বাণী ছিল অমৃত সমান। হুযূরের ফরমান, 'বাল্লেগু আন্নি অলাও আয়া' মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহারা শিক্ষার প্রচারকে আরো ব্যাপকতর করেন এবং ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা ছড়াইয়া দিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁহাদের আশংকা ছিল, পাছে আবার শিক্ষার প্রতি আমরা অবহেলা করিয়া অন্যান্য কওমের মত আমরাও শাস্তি ডকিয়া না আনি।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শিক্ষা বিস্তারের প্রতি সকল নব্য মুসলমান ও সাহাবীদের ছিল এক ধরনের অন্ধটান। কুরআন বা শিক্ষামূলক যে কোন জ্ঞানকে তাঁহারা প্রতি দ্বারে দ্বারে বিলি করিয়া যাইতেন অকাতরে। এ সময় পারিশ্রমিক-ভিত্তিতে শিক্ষা দানের ব্যাপারে কোনরকম মূল্যবোধেরও জন্ম হয় নাই। ইসলামী ইতিহাসে শিক্ষা বিস্তারের এই সময়টি ছিল একটি ক্রান্তিকাল। ঐতিহাসিকগণ ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা বিস্তারের এই সময়কে একটি যুগ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। ইসলামের উন্মেষকাল হইতে উমাইয়া খলীফাদের প্রাথমিক কাল পর্যন্ত শিক্ষার এই ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বিতীয় কাল শুরু হয় ওমর বিন আবদুল আজিজের শাসনামল হইতে। এই সময় শিক্ষা বিস্তারের জন্য সারা মুসলিন জাহানে সরকারী ফরমান জারি হয় এবং শিক্ষকদের জন্য সরকারী পর্যায়ে বেতন ও ভাতা নির্ধারিত হয়। এই ব্যাপারে তখনকার সরকারী ফরমান ছিল নিম্নরূপ ঃ

'যাহারা পার্থিব সম্পর্ক বর্জন করিয়া ইল্‌মে ফিক্‌হর জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করিয়াছেন, আর্থিক সাহায্য হিসাবে বায়তুলমাল হইতে তাদেরকে একশো দিনার হিসাবে দেওয়া হইবে।'[৫]

এরপর সকল শিক্ষা-দীক্ষার উপর ভিত্তি করিয়া গ্রন্থাদি রচনার প্রচলন শুরু হয়। মানুষের স্মরণ শক্তির আশ্রয় হইতে এবার তাহা কাগজে-কলমে স্থান লাভ করিল। এই সময় শিক্ষক ছাড়া ছাত্রদের জন্যও বৃত্তির বন্দোবস্ত করা হয়। ব্যাপকভাবে শিক্ষাদানের জন্য মসজিদে মসজিদে বিদ্যালয় স্থাপন করা হইল। যেখানেই কোন নূতন বিদ্যালয় পত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইত, রাতারাতি সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হইত। মোটকথা, এই যুগে মাদ্রাসা এবং মসজিদ একীভূত ছিল।

ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থার তৃতীয় যুগ আরম্ভ হয় আব্বাসীয় রাজন্য বর্গের শাসন আমল হইতে। এই সময় মসজিদে আর ছাত্রদের সংকুলান হইত না। এজন্য আলাদা

৫. সিরতে ওমর বিন আবদুল আজিজ (ইবনে জুজীকৃত) পৃ. ৯৫

www.waytojannah.com

বিদ্যালয় ভবন তৈরির প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। মসজিদকেন্দ্রিক মাদ্রাসা (বিদ্যালয়) ভবন নির্মাণ করা হয় এবং শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা এসব মাদ্রাসায় মোটা বেতন এবং বিশেষ পদমর্যাদাসহ যোগদান করেন। এসব মাদ্রাসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন এবং ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর জন্য আলাদা হোস্টেলের পত্তন করা হয়। এসময় ছাত্রদের জন্য বরং বেশি সুযোগ-সুবিধা এবং স্থায়ী বৃত্তি নির্ধারণ করা হয়। ছাত্রদের থাকা-খাওয়া এবং পোশাক-আশাক ইত্যাদির ব্যাপারেও বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান করা হইত। এ সময় শিক্ষকের যোগ্যতা এবং গুরুত্বের উপরই শিক্ষাকেন্দ্রের গুরুত্ব নির্ধারিত হইত। একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ যেখানে অবস্থান করিতেন সেখানেই যেন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিত। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর উপর ছাত্রের যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়। কিন্তু সেকালে একজন ছাত্র কেমন শিক্ষকের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করিয়াছে সে কথার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইত এবং ইহাই তাহার শিক্ষার সনদ হিসাবে পরিগণিত হইত।

পাক-ভারতে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা

পবিত্র ভূমি আরবদেশ হইতে ক্রমশ মুসলমানরা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞান, ধর্মীয় প্রজ্ঞা ও শিক্ষার আলোকবর্তিকা নিয়া তাঁহারা এসব দেশের আশীর্বাদস্বরূপ আসিয়াছেন। স্পেন, মিসর, ত্রিপলি এমনকি আফ্রিকার অরণ্যানীর অসভ্য বর্বরদের মাঝেও মুসলমানরা শিক্ষা ও সভ্যতার আলো ছড়াইয়াছেন। ইরান ভূখণ্ডকে মুসলমানরা জ্ঞান ও গবেষণার পীঠস্থানে পরিণত করিয়াছেন। ইরানের প্রভাব আসিয়া অতঃপর সিন্ধু এবং ভারতের জনপদকে স্পর্শ করিয়াছে। এদেশে মুসলমানদের আগমনের সাথে ইসলামী শিক্ষাবিদ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরাও আসিয়া দেশের আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া পড়েন এবং বসতি স্থাপন করেন। তাঁহারা আল্লাহ্‌র এবং মহানবীর আদর্শ চারিদিকে ছড়াইয়া দিলেন। দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে ইসলাম ও মহানবীর বাণীর সওগাত নিয়া তাঁহারা হাজির হইয়াছেন।

www.waytojannah.com

ইংরেজ শাসনের পূর্বে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

এই সম্পর্কে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে ঃ

ভারতের মুসলমানদের অনুপ্রবেশের পর অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো এখানকার মসজিদগুলিও শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। যেহেতু হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের শিক্ষার ভিত্তিভূমি হইল তাহাদের ধর্ম। এজন্য এই ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রে সরকারের তেমন ব্যয়ভার বহন করিতে হয় নাই। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব মাদ্রাসা ওয়াক্ফ সম্পত্তি ও উইলের টাকায় পরিচালিত হয়। ধর্মপরায়ণ লোকেরা পরকালীন পুণ্য অর্জনের জন্য এইসব শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য ওয়াকফ এবং সম্পত্তি প্রদানের অসিয়ত করিয়া যান। পাক-ভারতীয় মসজিদকেন্দ্রিক মাদ্রাসার এই অবস্থা ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। এরপর কোম্পানী দেশে চার ধরনের শিক্ষার প্রবর্তন করে। হিন্দু ব্রাহ্মণ, পাণ্ডা ও পূজারীদের জন্য এক ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা এবং নবীন শ্রেণীর জন্য সংস্কৃত মাধ্যমে চণ্ডীমণ্ডপকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন করে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের জন্য গ্রামের আনাচে-কানাচে মকতব ধরনের প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। এসব মকতবে গ্রাম্য কৃষক ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী লোকদের ছেলেপিলেরা পড়াশুনা করিত। মুসলমানদের দ্বিতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাটিই ছিল তখনকার দিনের প্রচলিত মাদ্রাসা।

এইসব শিক্ষাকেন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেন দেশের আমীর ওমারা এবং নবাব বাদশাগণ। তাঁহারা এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য মুক্তহস্তে অর্থ-সম্পদ দান করিতেন। বড় বড় জায়গীর এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি প্রদান করিয়া এইসব মাদ্রাসাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন। ইহাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা এইসব প্রতিষ্ঠানের সমুদয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলিয়া লইতেন। হাফিজ রহমত আলী খানের জীবন চরিতে উল্লেখ আছে, দিল্লীর কেন্দ্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িলে শুধু রোহিলা খণ্ডের জেলাসমূহে ছোট-বড় মাদ্রাসার পত্তন করিয়া প্রায় পাঁচ হাজার আলেম শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহারা হাফেজুল মুল্ক্-এর রাষ্ট্র হইতে নিয়মিত ভাতা পাইতেন। এই উপহাদেশের সকল জেলা এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ প্রায় এক ধরনেরই ছিল।[৬] সরকার ও দেশীয় রাজ্য এবং প্রদেশের নবাব বাদশাগণ ছাড়াও দেশের

৬. সৈয়দ আলতাফ হোসেন (আলীগড়) কৃত হাফেজ রহমত আলী খানের জীবন চরিত

www.waytojannah.com

জনসাধারণের এই ব্যাপারে কতটুকু মমত্ববোধ ছিল তাহা নবাব সদর ইয়ার জঙ্গ-এর এই লেখা হইতে অনুমান করা যায় ঃ

এই সময় মুসলিম রাষ্ট্রের পাড়া গাঁ ও মহল্লা (কসবা) সমূহে এক চমৎকার বিধান প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইসব মহল্লা জীবন ও প্রাণ চাঞ্চল্যের মূল কেন্দ্র ছিল। শহর এবং রাজধানী ইহার প্রভাবে সজীব ও সতেজ থাকিত। শহুরে আবহাওয়া ও রুক্ষ পরিবেশ মানুষের বংশ সোপানের দুই-তিন সিঁড়ির পরই লোকদের অলস এবং নির্জীব করিয়া তোলে, এমতাবস্থায় নগরের বাইরে মহল্লার লোকেরা নতুন স্বাদ এবং প্রাণচাঞ্চল্যের সঞ্চার করেন। দিল্লীর শাহ্ সাহেবদের পরিবার এবং লক্ষ্ণৌর ফিরিঙ্গি মহলের পরিবার উহার জলজ্যান্ত উদাহরণ।

দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ ছাড়াও রামপুর, মাদ্রাজ, ঢাকা ও পাক-ভারতের বড় বড় শহরে এবং বন্দরে এই ধরনের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশ্য একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে পাক-ভারতে সর্বপ্রথম কোথায় এবং কবে মাদ্রাসার পত্তন করা হয়। 'তারিখে ফেরেস্তা' হইতে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম মাদ্রাসা ভবন নির্মিত হয় মুলতানে। সম্ভবত জনাব নাসিরুদ্দিন কাবাচা মওলানা কুতুবুদ্দিন কাসানীর জন্য এই ভবন তৈরি করেন। এই শিক্ষাকেন্দ্রে হযরত শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানী শিক্ষা লাভ করেন (জন্ম ৫৭৮ হিঃ)।[৭]

প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা

সারা পাক-ভারতে কতগুলি প্রাইমারী বিদ্যালয় (মকতব) ছিল তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে ম্যাক্সমুলারের এক সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ইংরেজ শাসনের পূর্বে শুধু বাংলাদেশেই আশি হাজার মক্তব ছিল। অতএব গড়ে প্রতি চারশ জন-বসতি এলাকায় একটি মক্তব ছিল, ইহা ছাড়াও লাডলু তাহার ইতিহাসে বর্ণনা করেন যে, যেসব গ্রামে প্রাচীন পন্থী হিন্দুরা বসবাস করিত তাহাদের ছেলেপিলেরা মোটামুটিভাবে লেখাপড়া জানিত। কিন্তু আমরা সে সব অঞ্চলে পুরানো শিক্ষাব্যবস্থার উচ্ছেদ করিয়াছি (বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা) সেখানে গ্রামের মক্তবগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।[৮]

এইসব প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলি স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত হইত। ছাত্রদেরকে কোন ফিস দিতে হইত না।

---

৭. তারিখে ফেরেস্তা, পৃ. ৪০৮

৮. Education in India - - M. Basu

www.waytojannah.com

মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা-ব্যবস্থা

মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা-ব্যবস্থারও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছিল। এই সম্পর্কে 'ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া'তে বলা হইয়াছে ঃ

সেকালের উচ্চশিক্ষার চাবিকাঠি ছিল আলেমদের হাতে। তাঁহারা ছাত্রদেরকে শিক্ষাদানে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। প্রত্যেক মাদ্রাসা এবং খানকাতে (উপাসনালয়) মাদ্রাসার প্রচলন ছিল। এইসব শিক্ষাকেন্দ্রে এককালীন সরকারী সাহায্য অথবা জায়গীর বা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি প্রদান করা হইত। তাছাড়া জনসাধারণও এই সব প্রতিষ্ঠানে মুক্তহস্তে দান করিত। এইসব প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করাকে লোকেরা ধর্মীয় কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। আমীর ওমারা এবং পদস্থ ব্যক্তিবর্গ এই ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক বদান্যতায় অবতীর্ণ হইতেন। পাক-ভারতের গোপময়, খয়রাবাদ, জৌনপুর, আগ্রা ইত্যাদি শহরের শিক্ষাকেন্দ্রের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। এইসব শিক্ষায়তনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শিক্ষার্থীরা আসিয়া ভিড় জমাইত। এসময় এইসব মাদ্রাসার শিক্ষা বিষয়ের সূচিতে ইল্‌মে ছর্‌ফ, নহু, বালাগত, মানতেক (তর্কশাস্ত্র), কালাম, তাসাউফ, আদব (সাহিত্য) ফিক্‌হ এবং ফালসাফা (দর্শন) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল।

মসজিদ এবং খানকাহের শিক্ষা

মসজিদ এবং উপাসনালয়ের এইসব মাদ্রাসার শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার দরুন এই দেশের মুসলিম অধ্যুষিত বড় বড় শহর বন্দরে প্রতি পদে বৃহদায়তনের মসজিদ সৃষ্টি হয়। এইসব বৃহদাকার মসজিদের নির্মাণ এবং অবস্থান প্রত্যক্ষ করিলে সহজেই এইকথা প্রতীয়মান হয় যে, এইসব মসজিদ শুধু নামায এবং উপাসনার জন্যই নির্মাণ করা হয় নাই। ইহাতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পড়াশুনাও চালু ছিল। প্রাঙ্গণের বাইরে এখনো বহু বড় বড় মসজিদে ছোট ছোট কক্ষ বিশিষ্ট হুজ্‌রা রহিয়াছে। এইসব হুজরাতে মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্ররা অবস্থান করিত। অদ্যাবধি দেশের বিভিন্ন মসজিদে এই ধরনের শিক্ষা চালু আছে। প্রাচীন খানকাগুলিতেও অনুরূপভাবে লেখাপড়া ও ধর্মীয় দীক্ষা চলিত। জ্ঞানানুশীলন ও তপস্যা নিয়া যেসব আলেম ও সুধীবৃন্দ খানকাতে অবস্থান করিতেন তাঁহারা এইখানে তাঁহাদের শিষ্যদেরকে ধর্মীয় এবং অধ্যাত্ম শিক্ষা দিতেন। দূর-দূরান্ত হইতে শিষ্যরা এইখানে আগমন করিত এবং জ্ঞানলাভ করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া যাইত। খানকা এবং মসজিদে প্রচলিত এই শিক্ষা-ব্যবস্থার ধারা এখনো কিছু কিছু দৃষ্ট হয়। এই ব্যবস্থার পাশাপাশি সাধারণ মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে আলাদা বন্দোবস্তও গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বর্তমানে সর্বত্র তাহা বিশেষভাবে বিরাজমান

www.waytojannah.com

মুসলিম শাসনামলের কতিপয় মাদ্রাসা

এই প্রসঙ্গে এখানে কতিপয় এমন মাদ্রাসার উল্লেখ করিতে হয় যাহা শুধু বাংলাদেশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইতিহাস এবং পুরনো নিদর্শন হইতে প্রমাণিত হয় যে, অনুরূপভাবে এই উপ-মহাদেশের অন্যান্য প্রদেশেও বহু মাদ্রাসা ছিল, এই স্বল্প পরিসরে তাহার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। তদানীন্তন বাংলাদেশের কতিপয় মাদ্রাসার বিবরণ হইতেই উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মাদ্রাসা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেওয়া যাইবে।

বখতিয়ার খিলজির মাদ্রাসা

মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীই একমাত্র মুসলিম জেনারেল যিনি ১১৯৭ হিজরীতে সর্ব প্রথম বাংলাদেশ জয় করেন। যদিও নামমাত্র মোহাম্মদ ঘোরীর নামে খোৎবা পাঠ করা হইত, আসলে তিনিই ছিলেন এই দেশের আসল শাসনকর্তা। বখতিয়ার খিলজীর বিজিত এলাকা নদীয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাংলাদেশ অধিকার করার পর তিনি নদীয়ার (রাজধানী) পরিবর্তে রংপুর নামে একটি শহরের পত্তন করেন। তিনি বহু মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাও স্থাপন করেন। তারিখে ফেরেস্তায় এই সম্পর্কে উল্লেখ আছে ঃ

অদর ছেরহদে বাংলা দর এওজে শহরে নদীয়া শহরে মউসুমবিহ্ রংপুর বানা করদা দারুল হুকুমত খোদ ছাখতা অ মাসাজেদ অ খানকা অ মাদারেছ দরা শহর অ বেলায়েত বরহম ইছলাম বরওনক দয় দাজে তামাম মোজায়েন অ মহলী গরদানিদ।[৯]

লক্ষ্মণাবতী ও গৌড়ের মাদ্রাসা

সুলতান গিয়াসউদ্দিন প্রথম ১২১২ খৃ. হইতে ১২২৭ খৃ. পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি একটি সুরম্য মসজিদ, একটি মাদ্রাসা এবং প্রবাসীদের জন্য লক্ষ্মণাবতীতে একটি সরাইখানা স্থাপন করেন। বর্তমানে এইসব স্থাপত্যের মধ্যে শুধু মাদ্রাসা ভবনটির ভগ্নাংশ রহিয়াছে।[১০] গিয়াসউদ্দিন জ্ঞানী-গুণীদের বিশেষ কদর করিতেন। তবকাতে নাসেরীতে এ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ঃ

কেঁ চু ছেক্কা অ খোতবা বেলাদে লাখনুতী (গৌড়) বনামে হেসামুদ্দিন হোসাইন খিলজি শোদ অ খাতাবাশ সুলতান গিয়াসউদ্দিন গরদিদ। শহরে লাখনুতিরা দারুল মুল্‌কু ছাক্‌ত্। খালায়েকে আজ আতরাফ রুয়ে বদদ আওরদন্দ! উ মর্দে বগায়াতে নেকু

৯. তারিখে ফেরেস্তা, দ্বিতীয় খণ্ড
১০. Archeological survey of India Vol X VI, p - 76

www.waytojannah.com

Contents

জাহের অ বাতেন বুদ আজ বজলে অ আতায়ে উ হাম গুনান নসিব তামাম ইয়াফ্তান্দ অ নে'মতে বেছিয়ার গেরেফতান্দ ....

সুলতান দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দিন জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি নিজেও মাঝে মাঝে কাব্য চর্চা করিতেন। তাঁহার শাসনামলেও একটি মাদ্রাসা নির্মিত হয়। দরসে বাড়ী' নামক এই মাদ্রাসাটির বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল।[১১] পুরানো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমাবনতি এবং পতন সম্পর্কে মিঃ নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পুস্তকে বলিয়াছেন যে, "এইভাবে পুরানো শিক্ষা ব্যবস্থার নিদর্শন ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এবং অচিরেই এমন সময় আসিবে যখন মাদ্রাসার আর কোন চিহ্ন বর্ণ থাকিবে না। যেমন অস্থিপুরার মাদ্রাসা (হিন্দু প্রবাদে বলা হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্রের আঠার দিনের যুদ্ধে যাহারা নিহত হইয়াছিল এইখানে তাহাদের হাড় একত্রিত করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছিল)। এই মাদ্রাসার পুরানো নিদর্শন হিসাবে শুধুমাত্র একটা ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নাই। লোকেরা এখনো ইহাকে 'টিলার মাদ্রাসা' বলে।[১২] কিন্তু ঐতিহাসিক এই জায়গাটি প্রদেশের কোন্ অঞ্চলে অবস্থিত সেই কথা উল্লেখ করেন নাই।

হোসেন শাহের মাদ্রাসা

হোসেন শাহ এবং তাঁহার পুত্র নসরত শাহের সহিত বাংলার হোসাইনী বংশের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। তাঁহারা দুইজনই বহু মাদ্রাসা এবং খানকা স্থাপন করেন। গৌড়ের সাগর দীঘির উত্তরাংশে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট একটি মাদ্রাসা ভবন এখনো তাহাদের স্মৃতি বহন করিতেছে। বর্তমান নিদর্শন হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কালে এই মাদ্রাসা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ শিক্ষায়তন ছিল। চত্বর এবং দেওয়ালে রকমারি পাথর দেখিয়া এইকথা প্রমাণিত হয় যে, গৌড়ের অন্যান্য প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে ইহাই ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও জলুসপূর্ণ প্রাসাদ। এই ভবনের দেওয়ালে প্রাপ্ত শিলালিপিতে হোসেন শাহের নাম উৎকীর্ণ করা আছে। উৎকীর্ণ লেখার তরজমা অনেকটা এই ধরনের দাঁড়ায়।

মহানবী (সা) বলেন, জ্ঞান আহরণের জন্য প্রয়োজনবোধে চীন দেশেও গমন করা উচতি। এই আলীশান মাদ্রাসা সুলতান হোসেন শাহ আল মালেকুল হোসাইনী মহানবীর আদেশক্রমে ১৪৯৩ সালের (৯০৭ হি) পহেলা রমযানে স্থাপন করেন।[১৩]

১১. স্টুয়ার্ট কৃত History of Bengal.
১২. Promotion of learning in India by N. N. law
১৩. Education in Muslim India by S. M. Jafar.

www.waytojannah.com

ঢাকার মাদ্রাসা

আমিরুল উমারা শায়েস্তা খান (সম্রাট আলমগীরের মামা) সম্রাট শাহজাহান ও আলমগীরের আমলের বিশিষ্ট আমীর ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োজিত হইয়াছিলেন। শাসনোপলক্ষে তিনি যেখানেই গিয়াছেন নিজের স্মৃতি চিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে 'আচরারুল উমারার' লেখক বলেন ঃ

আছারে খায়ের আজ কাবিলে রেবাত অ মসজিদ ....

তিনি ১৬৬৪ খৃস্টাব্দ হইতে ১৬৮০ খৃ. অবধি ঢাকার সুবেদার ছিলেন। এই সময় তিনি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে একটি মাদ্রাসা এবং মসজিদের পত্তন করেন। এই মাদ্রাসা বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার পর কিছুকাল অব্যবহৃত থাকার পর মাদ্রাসা ভবনে হাসপাতাল চালু করা হয়। বর্তমানে নদীতীরে একটি ভগ্নঘাট ও একটি মসজিদ তাঁহার চিহ্ন বহন করিতেছে। অগ্নিকাণ্ডের দরুন মসজিদের দেওয়ালে উৎকীর্ণ লেখা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবুও যতটুকু পাঠোদ্ধার করা গিয়াছে নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন ওয়াল্ আকিবাতুলিল মুত্তাকীন আম্মা বা'দ চুঁ ঈঁ মাকামে খাজস্‌তা ফরজাম খায়র খাহ্ ফোকারা উমেদ্ ওয়ারে রহমতে হুক জাল্লা ওয়া আলা শায়েস্তাখান আমীরুল উমারা আহ্‌দাস্ নামুদা ওয়াক্‌ফে শরঈ ক্যরদাকে তামাম মাহ্‌সূলে ঈঁ ব-সরফে তা'মীর ওয়া ওয়াযীফায়ে খেদমতে মসজিদ মুস্তাহ্‌কীন ও মুতাওয়াকিলীন .... হোককাম জাবীউল ইক্‌তিদার ওয়া উমারা নামদার ঈঁ খায়র মুস্তামির ও মুস্তাকির দারান্দ কে দরী ওয়াকত ....নামাইয়াদ .... হুক মাহ্‌রূম খাহাদ্ শোদ্ .... কারদা মুস্তাহেক্‌কীন .... শোদ মাল ....।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই জন্য কিছু নির্দিষ্ট আমদানীর উৎস ছিল, যদ্বারা মাদ্রাসা এবং মসজিদ পরিচালিত হইত।

ঢাকায় হাকিম হাবিবুর রহমান তাঁহার এক নিবন্ধে বলেন যে, ঢাকার উপকণ্ঠের বিশিষ্ট ব্যক্তি শাহনুরী (র) তাঁহার কিবরিয়াতে আহমর গ্রন্থে বলেন, (গ্রন্থটি দুর্লভ) তিনি রোজ চার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মগবাজার হইতে শায়েস্তা খানের মাদ্রাসায় পড়িতে আসিতেন। এই অধ্যয়নকাল সম্ভবত ১৭০৮ খৃস্টাব্দ। ইহা ছাড়াও হাকিম সাহেব বলেন যে, তাঁহার কাছে 'ফাতোয়ায়ে খানিয়া' নামক একখানি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আছে। ১৭৩৩ খৃস্টাব্দে জনৈক ছাত্র এই মাদ্রাসাতে বসিয়া এই পাণ্ডুলিপিখানা তৈয়ার করে। শায়েস্তা খানের অসমাপ্ত কেল্লার অনতিদূরে একখানি জমকালো মসজিদ রহিয়াছে। এই মসজিদকে খান মোহাম্মদ মির্ধার মসজিদ বলা

www.waytojannah.com

Contents

হয়। এই ভবনটি দ্বিতল বিশিষ্ট। নিচে অনেক বড় বড় কামরা রহিয়াছে। এই কামরাগুলি ছাত্রদের হোস্টেল বা ছাত্রাবাস হিসাবে ব্যবহৃত হইত। মসজিদের চারিদিকে খোলা বারান্দা রহিয়াছে। এই মসজিদের নিচের অংশকে এখনো মাদ্রাসা হিসাবে অভিহিত করা হয়। মসজিদের দেওয়ালে কয়েক চরণ ফরাসী কবিতা উৎকীর্ণ করা হইয়াছে।

এই ধরনের আরো একটি মসজিদ ঢাকার আজমপুরে (আজিমপুর) রহিয়াছে। এই মসজিদখানাও দ্বিতল। সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের পুত্র মোহাম্মদ আজম বা আজিমুশ্ শানের নামানুসারে পরিচিত এই মসজিদের দ্বিতলের উত্তরপ্রান্তে কতিপয় আলো-বাতাসযুক্ত কামরা রহিয়াছে। অদ্যাবধি মসজিদের এই অংশকে মাদ্রাসা বলা হয়।

উৎকীর্ণ ফরাসী লেখা হইতে জানা যায় যে, এই মাদ্রাসা মূলত আত্মশুদ্ধি এবং ইল্‌মে বাতেন শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে এই অধ্যাত্ম শিক্ষার পাশাপাশি ইল্‌মে জাহেরও (সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষা) শিক্ষা দিবার প্রচলন হয়। মসজিদ সংলগ্ন একটি খানকাও রহিয়াছে। এই খানকাতে তপস্যাপ্রিয় লোকেরা এখনো পূর্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী যোগ সাধনার জন্য বিশেষ সময়ে আসেন। এই মসজিদে উৎকীর্ণ লেখাগুলিও কতিপয় ফরাসী কবিতার সমষ্টি মাত্র। আওরঙ্গজেব আলমগীরের রাজত্বকালে ১১১৬ হিজরীতে এই মসজিদ নির্মিত হয়। খান মুহাম্মদ কর্তৃক ইহা শীলালিপিতে লিখিত আছে।

ইহা ছাড়াও ঢাকাতে এই ধরনের আরো বহু মসজিদ আছে এবং মসজিদ সংলগ্ন বিভিন্ন মাদ্রাসার অবস্থান সম্পর্কে ঢাকার লোকমুখে শোনা যায়।

মুর্শিদাবাদের মাদ্রাসা

সিয়ারুল্ মুতা'খেরীন পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, নবাব আলীবর্দী খান তাঁহার জীবদ্দশায় আজিমাবাদের (পাটনা) আলিম-ফাজিল ও শিক্ষাবিদদেরকে মুর্শিদাবাদে আসিয়া অবস্থান করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং তাহাদের জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তি বরাদ্দ করেন। নবাব আলীবর্দী খানের আমন্ত্রণক্রমে আজিমাবাদ হইতে যাঁহারা মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে মীর মোহাম্মদ আলী, হোসাইন খান ও হাজি মোহাম্মদ খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পণ্ডিতত্রয়ের প্রথমোক্ত ব্যক্তির একটি বৃহদাকার লাইব্রেরী ছিল। এই লাইব্রেরীতে দুই হাজার গ্রন্থ ছিল। যেকালে পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনা একরকম দুরূহ কাজ ছিল, সেইকালে এত পরিমাণ গ্রন্থ-সংগ্রহ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস বলা যাইতে পারে। লাইব্রেরীর মালিক কতকখানি বিদ্বজ্জন এবং গ্রন্থকীট ছিলেন এই লাইব্রেরীর সংগ্রহ সম্ভার হইতেই তাহা

www.waytojannah.com

অনুমান করা যায়। মুর্শিদাবাদের একটি বিখ্যাত মাদ্রাসার নাম 'কাটারা মাদ্রাসা'। মাদ্রাসাটি এখনো অক্ষত অবস্থায় দাঁড়াইয়া তাহার পূর্ব গৌরব ঘোষণা করিতেছে। নওয়াব জাফর মুরশিদ আলী খান এই মাদ্রাসার পত্তন করেন।[১৪]

বোহারের (বর্ধমান) মাদ্রাসা

বর্ধমান জেলার একটি গ্রামের নাম বোহার। এখানকার প্রখ্যাত জমিদার মুনশী সদরুদ্দিন একজন যথার্থ পণ্ডিত এবং জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি ছিলেন। জ্ঞানীগুণীদের তিনি বিশেষ কদর করিতেন। তাঁহার আমন্ত্রণক্রমে লক্ষৌর বিখ্যাত আলেম মাওলানা আবদুল আলী, বাহরুল উলুম (বিদ্যাসাগর) বোহারে আগমন করেন। মুনশী সদরুদ্দিন মাওলানার জন্য বোহারে একটি স্বতন্ত্র মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই মাদ্রাসায় তিনি বহুকাল শিক্ষাদান করেন। সম্ভবত ১১৭৮ হিজরীতে তিনি এইখানে শিক্ষকতা করেন। তখন তাঁহার মাসিক বেতন ছিল চারশত টাকা। এই মাদ্রাসার একশত বহিরাগত ছাত্রকেও বৃত্তি (অজিফা) দেওয়া হইত। এই ছাত্ররা মাওলানার সাথেই লক্ষ্মৌ হইতে আসিয়াছিল। বর্ধমানের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সৈয়দ গোলাম মোস্তফা এই মাওলানারই শিষ্য ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিদ্যোৎসাহী গুণপনার জন্য তাঁহাকে আটোয়া জেলার মুফতী পদে নিয়োজিত করা হয়েছিল। অতঃপর তিনি স্বদেশ বীরভূমের মুফতী হইয়াছিলেন।[১৫] কালক্রমে বোহার মাদ্রাসা বন্ধ হইয়া যায়। পরে এই মাদ্রাসার বৃহৎ কুতুবখানা (লাইব্রেরী) ইংরেজ সরকারের তত্ত্বাবধানে রাখা হয় এবং সমুদয় কেতাবপত্র ও হস্তলিখিত অসংখ্য পাণ্ডুলিপি কলিকাতার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীতে স্থানান্তরিত করা হয়। ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর 'বোহার বিভাগ' অদ্যাবধি এই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

বোহারের মতো মঙ্গলকোটও বিশিষ্ট আলেম-উলামা ও শিক্ষাবিদদের কেন্দ্রস্থল ছিল। এইখানে মাওলানা হামিদুদ্দিন দানেশমন্দ বাঙ্গালীর (মুজাদ্দেদে আলফেসানীর শিষ্য) (র) খানকা শরীফ ছিল। অতঃপর এইখানে কালক্রমে ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব স্তিমিত হইয়া আসে এবং সেস্থলে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভিত্তিভূমি রচিত হয়। মাদ্রাসা এবং কুতুব খানায় রক্ষিত মূল্যবান ধর্মীয় গ্রন্থাবলী ইহার পর আর কেহ স্পর্শও করিত না। এইসব অমূল্য সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় বিনষ্ট হইবে এই কথা চিন্তা করিয়া মাওলানা মীর মোহাম্মদ মঙ্গলকোটির পৌত্রী এবং খোন্দকার মৌলবী এজহারুল হকের পত্নী তাহাদের পরিবারিক কুতুবখানার সমুদয় কেতাবপত্র ১৯২৮ খৃস্টাব্দে মাদ্রাসা-ই-আলীয়ায় (কলিকাতা) দান করেন। দানকৃত এইসব গ্রন্থ এখনো ঢাকার মাদ্রাসা-ই-

১৪. Promotion of learning In India by N. N. Law
১৫. তাজকেরায়ে ছুবে' গুলশান

www.waytojannah.com

Contents

আলীয়ার লাইব্রেরীতে সুরক্ষিত আছে। এইসব কেতাবের আলমারিকে 'মঙ্গলকোট বিভাগ' হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই বিভাগে সর্বমোট ৭০৪ খানি গ্রন্থ রহিয়াছে, তন্মধ্যে ৪৬০ খানি মুদ্রিত এবং বাকিগুলি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি।

পাক-ভারতের তদানীন্তন শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করিতে গিয়া যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইল ইংরেজ শাসনের প্রাক্কাল পর্যন্ত পাক-ভারতের সাধারণ শিক্ষা ছিল ধর্মভিত্তিক। ধর্মের অনুশাসনে আমাদের অনাগত নাগরিকদের চরিত্র এবং মানসিকতা গঠিত হইবে ইহাই ছিল সেকালের শিক্ষার উদ্দেশ্য।

সেকালের শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে ছিল ধর্মীয় আবেগের সেতুবন্ধন। ওস্তাদ যেমন ছাত্রের চরিত্র গঠন এবং শিক্ষাদানের ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকৃত্রিম চেষ্টা করিতেন তেমনি শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদেরও ছিল অগাধ ভক্তি এবং শ্রদ্ধা। তদানীন্তন মসজিদকেন্দ্রিক মাদ্রাসার আসল যে উদ্দেশ্যটি কার্যকরী ছিল তাহা ছাত্রদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা হাতেকলমে শিখাইয়া দেওয়ার সুবন্দোবস্ত মাত্র।

www.waytojannah.com

আধুনিক এবং পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য

পুরাতন ও নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান আছে তাহা এই যে, পুরাকালে শ্রেণীবিন্যাস অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল ন। কিন্তু বর্তমানে যে শিক্ষাই হউক না কেন শ্রেণীবিন্যাস ব্যতীত সম্ভবপরই নহে। কেন না বেতনভোগী সীমিত শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক শিক্ষা পাওয়া এই পদ্ধতি ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু বর্তমান শ্রেণী ব্যবস্থা সম্পর্কে যতই প্রশংসা করা হউক, এই সত্য অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে, এই ধরনের শিক্ষার দ্বারা ছাত্রদের উপকারের স্থলে অপকার হয়। কলেজে এক ক্লাসে একশত বা দেড়শত ছাত্র ভর্তি করা হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষকের কথার শব্দ না কান পর্যন্ত পৌছিয়া থাকে, না এই গণ্ডগোলের মধ্যে ছাত্ররা ওস্তাদের কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হয়। ওস্তাদের পক্ষে ছাত্রদের ব্যক্তিগত দেখাশুনার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ওস্তাদ উপস্থিত হইয়া ধরা-বাঁধা শব্দসমূহের একটি বক্তব্য প্রদান করেন এবং সময় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যান। তিনি না এই কথা উপলবদ্ধি করিতে পারেন যে, তাঁহার বক্তৃতা ছাত্ররা বুঝিতে পারিয়াছে অথবা পারে নাই এবং ছাত্রগণ এই সুযোগও পায় না যেসব ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে সেইগুলি দূর করার জন্য প্রশ্ন করিবে। একজন অপরিচিত লোক মাদ্রাসা বা কলেজের প্রত্যেক শ্রেণীতে ছাত্রের ভিড় দেখিয়া মনে করিতে পারে যে, আমাদের শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু পুরাকালের সঙ্গে তুলনা করার পর বুঝিতে পারে যে, তখন অধ্যাপকদের সামনে পাঁচ-দশজন ছাত্রই শিক্ষা গ্রহণ করিত। অধ্যাপকগণ প্রত্যেক ছাত্রকে দেখাশুনা করিবার সুযোগ পাইতেন। যাহা বর্তমানে অসম্ভব। আধুনিক কালের জাঁকজমক ও ছাত্রবৃদ্ধির প্রবণতার দরুন চাত্রদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ব্যাপারে ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণে অভিজ্ঞতায় দৈন্য সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে কলেজের আসবাবপত্র ইমারত্যাদির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অধ্যাপকদের ডিগ্রীসমূহের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও শিক্ষার মান দিন দিন নিম্নগামী হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? কারণ ইহা ছাড়া আর কিছুই নয়, ছাত্রগণ শিক্ষকদের সংস্পর্শ হইতে বঞ্চিত এবং শিক্ষকগণও ছাত্রদের লেখাপড়ার উন্নতির খবর হইতে দূরে অবস্থান করেন। এই জন্য শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্পর্কে ছাত্রগণ

www.waytojannah.com

অনবহিত। এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞ অনভিজ্ঞ সর্বস্তরের শিক্ষকদের স্থান হইয়া থাকে। যাহার কারণে দৈনন্দিন শিক্ষার মান নীচের দিকে ধাবিত হইতেছে।

অপরপক্ষে যখন আমরা পুরাকালের দিকে দৃকপাত করি, সেই সময়ে এই ধরনের শ্রেণী বিন্যাস ছিল না। সেই সময়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদের ভুলত্রুটি ধরিতেন, সন্দেহ অপনোদন করিয়া দিতেন এবং ছাত্রগণ শিক্ষকের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করিত। ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হইত তাহা পিতা-পুত্রের সম্পর্কের চাইতেও গভীরতর ছিল।

এই কথা প্রকাশ্য যে, ওস্তাদ শাগরিদের দৃষ্টির ভিতরে মায়া-মহব্বত ও শ্রদ্ধার কারণে তাহাদের সম্পর্ক আজীবন দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিত। বর্তমানের ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের অবনতির দৃশ্য দেখিয়া বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, উভয় কালের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণতি কি ?

কবির ভাষায়—

"পথের এই পার্থক্য কোথা হইতে
কোথায় পৌঁছিয়াছে।"

শিক্ষাব্যবস্থার যে খসড়া উপরে আলোচিত হইয়াছে, যাহা কয় শত বৎসর যাবৎ এই দেশে প্রচলিত ছিল, মোগল শাসনের অধঃপতন ও অবসানের পর হইতে এই পদ্ধতির উপর প্রতিক্রিয়া হইতেছিল। অবশেষে ইহা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পলাশীর আম্রকাননে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ প্রহসনের পর বাংলাদেশের মুসলিম জাতির মান-সম্মান এবং নামেমাত্র মীর জাফর আলী খানের যে শাসন ছিল, উহাও শেষ হইল এবং ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণই দেশ শাসন করিতে লাগিল। অদৃষ্টের পরিহাস, আমাদের ভাগ্য লইয়া এভাবে ইংরেজগণ খেলা করিতে লাগিল।

মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দিনগুলি

দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার তখন শুধু নামেমাত্র ছিল। কিন্তু আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ, ষড়যন্ত্র ও বহিরাক্রমণের দরুন রাজদণ্ড এতই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, দিল্লীর শেষ সম্রাট শাহ আলমের কোন গুরুত্বই ছিল না। তাঁহার চোখের সামনে রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিরা নির্বিবাদে চলাফেরা করিত এবং রাজত্ব বিনষ্ট করিবার জন্য অহোরাত্র চেষ্টা করিত। ক্ষমতাসীন এবং পদস্থ ব্যক্তিবর্গ নিজেদেরকে নিরাপদ এবং শক্তিসম্পন্ন মনে করিত না। ফলে, পাক-ভারতের দূর-দূরান্তের প্রদেশের শাসনদণ্ডের কাঠামো দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল এবং সব সমস্যা কেন্দ্রের আওতার বাহিরে চলিয়া যাইতে লাগিল। সুদূর বাংলাদেশেও এই অরাজকতা আসিয়া দানা বাধিয়া উঠিল। অন্যদিকে ইংরেজরাও এমন জাল বিস্তার করিয়াছিল যে, তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না।

www.waytojannah.com

বাংলার দেওয়ানী ইংরেজদের হাতে সোপর্দের কারণ

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়া ১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট দিল্লীর সম্রাট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে বাংলার দেওয়ানী সোপর্দ করাকেই শ্রেয় মনে করিলেন। কিন্তু এই কথা কে জানিত যে, দেওয়ানী নয় বরং মুসলমানদের সাতশত বৎসরের রাজত্ব তাহাদের হাতে সমর্পণ করা হইল। দেওয়ানী সোপর্দের সময় শর্ত করা হইয়াছিল যে, মুদ্রা, খোতবা এবং শাসন নিয়ম যেমন ছিল তেমনই থাকিবে। কিন্তু এই শর্ত কাগজে-কলমেই রহিয়া গেল কার্যত তাহা আদায় করিবার কোন শক্তিই আর মুসলমানদের ছিল না।

সম্রাট শাহ আলমের দুরবস্থা

দিল্লীর নামমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার তখন স্তিমিত প্রায়। বিশৃংখলা এবং অরাজকতা শেষাবধি এত চরমে পৌছিয়াছিল যে, রোহিলার গোলাম কাদির খান ১৭৮৮ খৃস্টাব্দে 'কসরে মোয়াল্লায়' প্রবেশ করিয়া অতর্কিতে দিল্লীর শেষ সম্রাট শাহ্ আলমের চক্ষু দুইটি উপড়াইয়া ফেলে। এই মর্মান্তিক এবং করুণ মুহূর্তে তাঁহাকে সাহায্য করিবার মতো কেহই ছিল না।

মোট কথা, মোগল সাম্রাজ্য পতনের এই দুর্দিনে বাধ্য হইয়া বাংলাদেশের দেওয়ানী ফিরিঙ্গীদের হাতে সোপর্দ করা হয় এবং সোপর্দ না করিয়া কোন গত্যন্তর ছিল না। দিওয়ানী সোপর্দ করার সময় ইংরেজদের সহিত যে শর্ত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল প্রথম দিকে ইংরেজরা তাহা মানিয়া চলিল। কিন্তু কিছুকাল পর ইংরেজরা সে শর্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিল। এই সময় বাংলা দেশের শাসন পদ্ধতির তেমন কোন রদবদল হয় নাই। তখন সরকারী ভাষা ফারসীই ছিল। বিচার বিভাগ, ভূমি সম্পর্কিত আইন এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত পূর্বে যেমন ছিল তেমনই রহিল। ইহাতে ইংরেজরা শর্ত পূরণ করিতেছিল ধারণা করিলে ভুল হইবে। আসলে এতদিনের পুরনো শাসনযন্ত্র হঠাৎ পরিবর্তন করা সম্ভব নয় বলিয়া যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। অতএব এই পুরনো নিয়মের উপরই দেশের শাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্য ইসলামী বিধান সম্পর্কে কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ লোকের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। ইসলামী শাসন বিধান ও ইসলামীশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এমন বহু আলেম উলামা তখন ছিলেন। কিন্তু সরকারী কাজের বেলায় তাঁহাদের যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার উপর কোম্পানীর কোন আস্থা ছিল না। অতএব এই সমস্যার সমাধানের জন্য কোম্পানীর প্রধান কর্ণধার বা গভর্নর লর্ড হেস্টিংস স্বয়ং চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

www.waytojannah.com

Contents

মোল্লা মাজদুদ্দিন ও কলিকাতা প্রতিনিধিদলের সহিত হেস্টিংসের সাক্ষাৎকার

১৭৭৬ সালে মোল্লা মাজদুদ্দিন কলিকাতায় বসবাস করিতেন। ইনি শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী ও মোল্লা নিজামুদ্দিন (দরসে নিজামিয়ার প্রবর্তক)-এর শিষ্য ছিলেন। জনসাধারণের কাছে তিনি মৌলবী মদন হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত গুণপনা এবং দক্ষতা লোকদের মাঝে কিংবদন্তি হিসাবে প্রচলিত আছে।

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজের রচনাবলীতে যে মৌলবী মদনের উল্লেখ আছে, বলা বাহুল্য ইনিই সেই ব্যক্তি। কলিকাতা আগমনের পূর্বে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে 'আজমুত তাফাছির'-এর গ্রন্থকার মৌলবী রহিম বখ্শ্ তাঁহার অন্য লেখায় বলেন ঃ

একদা মৌলবী মদন বহছ (তর্ক) করার জন্য শাজাহানপুর হইতে দিল্লীতে আসেন। তাঁহার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। দিল্লীতে আসিয়া তিনি শাহ সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য মাদ্রাসাতে আসেন। মাদ্রাসা গৃহ খুবই প্রশস্ত এবং উন্মুক্ত ছিল। মাদ্রাসার চত্বরে এই প্রান্ত হইতে সেই প্রান্ত পর্যন্ত ফরাশ বিছানো ছিল। ফরাশের একপ্রান্তে একটা পালং ছিল। শাহ সাহেব যখনই ক্লান্তি অনুভব করিতেন পালং-এ সটান শুইয়া পড়িয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। মৌলবী মদনকে দেখিয়া শাহ সাহেব তাঁহাকে নিচের ফরাশে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু মৌলবী মদন সেখানে বসিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। শাহ সাহেব অতঃপর খাদেমদেরকে আলাদা পালং পাতিয়া ভালো বিছানা দিবার আজ্ঞা করিলেন। অতঃপর মৌলবী মদন পালং-এ বসিয়া বলিলেন, আমি একটি মাত্র উদ্দেশ্যে এইখানে আসিয়াছি। তাহা হইল আমি আনপার সাথে 'বহছ' (ধর্ম এবং মতবাদ সম্পর্কে তর্ক) করিতে চাই, আপনার শিক্ষা-দীক্ষার বেশ জয়ডাক শুনিয়াছি। প্রস্তাব শুনিয়া শাহ সাহেব প্রথমতঃ অস্বীকৃতি জানাইলেন। কিন্তু মৌলবী মদনের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া বহছে অবতীর্ণ হইলেন। উচ্চতর মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে মৌলবী মদন বেশ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, শাহ সাহেব এই সম্পর্কেই সমাধান হয় না এমন কতগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন মৌলবী মদন চোখের পলকে পালং হইতে নামিয়া নিচে যাইয়া বসিলেন। বলিলেন, সাধারণের জুতা রাখার জায়গাতেও বসিবার যোগ্য নই আমি। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, অতঃপর শাহ সাহেব তাঁহাকে তুলিয়া বসাইলেন এবং ক্ষমা করিয়া দিলেন।

www.waytojannah.com

মোটকথা, মৌলবী মদন একজন আদর্শবাদী বিজ্ঞজন ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের গভীরতা ছিল অপরিসীম। দলে দলে শিক্ষার্থীরা তাঁহার কাছে আসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। এইভাবে চারিদিকে যখন তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িল, কলিকাতার মুসলমানরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, এমন একজন জ্ঞানীগুণী লোককে যেভাবেই হউক কলিকাতায় স্থায়িভাবে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই সময় তাঁহাকে কলিকাতায় রাখিবার বড়ই প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা হইল, কলিকাতায় তখন মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। একটা প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিয়া তাঁহাকে টিকাইয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। শিক্ষকের পর্যাপ্ত বেতন, তদুপরি ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করা কলিকাতার মুসলমানদের দ্বারা তখন সম্ভব ছিল না। তাহারা এই সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। বাংলার শাসনকর্তার (লর্ড হেস্টিংস) নিকট এই মর্মে একটি আবেদন করিতে হইবে যে, তিনি যেন এমন একটি প্রতিষ্ঠান তৈরির আজ্ঞা করেন যেখানে মুসলমানদের ছেলে পিলেরা পড়াশুনা করিতে পারে এবং মোলা মাজদুদ্দিনের মতো সুশিক্ষিত এবং বিজ্ঞ লোককে কাজে লাগানো যাইতে পারে।

অতঃপর কলিকাতার বিশিষ্ট মুসলমানরা এই মর্মে একটি দরখাস্তসহ বাংলার শাসনকর্তা লর্ড হেস্টিংস-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বয়ং লর্ড হেস্টিংস-এর জবানীতে রহিয়াছে। হেস্টিংস-এর বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর কাছে পেশকৃত এই বিবরণ (১৭৮১ খৃঃ ৭ই জুন) সংরক্ষিত আছে। বিবরণটি নিম্নরূপ ঃ

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল আমার সহিত সাক্ষাৎ করে এবং আমাকে অনুরোধ করে যে, প্রেসিডেন্সীতে মোল্লা মাজদুদ্দিন নামক জনৈক ব্যক্তিকে কলিকাতায় স্থায়িভাবে রাখিবার জন্য আমি যেন সচেষ্ট হই, যাহাতে এখানকার মুসলমান ছাত্ররা প্রচলিত ইসলামী বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। এই প্রতিনিধি দল আমাকে অবহিত করে যে, এই ব্যক্তি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগাধ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন, এই ধরনের গুণীলোক সচরাচর পাওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য, কলিকাতা এখন একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নগরপীঠ হিসাবে উন্নীত হইয়াছে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্য অঞ্চল হইতেও লোকেরা এই শহরে চলিয়া আসিতেছে। অন্যান্য প্রাচ্য দেশীয় রীতি অনুযায়ী ভারত এবং ইরানের জন্য ইহা খুবই গৌরবের বিষয় যে, এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লোকেরা তাহাদের মানসিক উন্নতির প্রয়াস পাইতেছে। ভারতে মোগল সাম্রাজ্য পতনের পর এখানকার শিক্ষা-দীক্ষার অবনতি ঘটিয়াছে এবং এই লুপ্ত প্রায় শিক্ষা পদ্ধতিকে পুনরুজ্জীবিত করার খুবই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

www.waytojannah.com

তাছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সরকারেরও এমন অসংখ্য অফিসারের প্রয়োজন যাহাদের প্রচুর যোগ্যতা রহিয়াছে। কেননা অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, ফৌজদারী আদালতে এবং দেওয়ানী আদালতে এসময় জজ নিয়োগের ব্যাপারে খুবই যোগ্যতাসম্পন্ন এবং নির্ভরযোগ্য লোকের প্রয়োজন। এই গণ্যমান্য মুসলমান প্রতিনিধিরা মনে করেন ব্যক্তিগতভাবে আমি যথার্থ যোগ্য লোকদের মর্যাদা দিতে জানি। এই জন্য তাঁহারা এই ধরনের আবেদন লইয়া সরাসরি আমার কাছে আসিয়াছেন। মোটামুটিভাবে তাঁহাদের দরখাস্তের বিষয়-বস্তু ইহাই ছিল। সম্মিলিতভাবে পেশকৃত এই দরখাস্তের আসল বক্তব্য উদ্ধার করিতে যাইয়া আমাকে আমার স্মৃতি শক্তির উপর জোর দিতে হইয়াছে। কেননা, তাঁহাদের মূল দরখাস্তখানা পাওয়া যাইতেছে না।

আমি এই প্রতিনিধিদলকে এই আশ্বাস দিয়া বিদায় করিয়াছি যে, যতটুকু সম্ভব আমি এই ব্যাপারে চেষ্টা করিব। আমি উক্ত মোল্লা মাজদুদ্দিনকে অতঃপর ডাকিয়া পাঠাই এবং জিজ্ঞাসা করি যে, মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তিনি এই গুরু দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন কি না। তিনি আমার কথায় সম্মত হইলেন এবং ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রস্তাবিত মাদ্রাসার জন্য কার্যক্রম শুরু করিয়া দিলেন। এই ব্যক্তি সত্যি এই মাদ্রাসার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং তাঁহার সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণাকে অক্ষুণ্ণ রাখেন।

যেহেতু তিনি জানিতেন যে, সীমাবদ্ধ ব্যয়-বরাদ্দের ভিতর দিয়া মাদ্রাসার কার্য পরিচালনা করিতে হইবে এইজন্য তিনি বেশি ছাত্রকে পড়ার সুযোগ দিতে পারিতেন না। ইহা ছাড়া চল্লিশজন ছাত্রের আবাসিক ব্যবস্থা করার দায়িত্বও ছিল মাদ্রাসার উপর। এইসব ছাত্র মফস্বল হইতে অথবা অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। বিগত বড়দিনের সময় আমি ইহা দেখিয়া যার পর নাই খুশি হইলাম যে, মাদ্রাসার কতিপয় ছাত্র কাশ্মীর এবং গুজরাটের মত দূরাঞ্চল হইতে আসিয়াছে। মাদ্রাসায় কর্ণাটের একজন ছাত্রকেও দেখিতে পাইলাম। আমাকে এই ব্যাপারে অবহিত করা হইল যে, যেহেতু মাদ্রাসায় আবাসিক বন্দোবস্ত সীমিত এইজন্য বেশি ছাত্র ভর্তি করা সম্ভবপর নয়। মাদ্রাসার এই দৈন্য ঘুচাইবার জন্য আমি বৈঠকখানায় (বৌদ্দপুকুর নামে পরিচিত) একখণ্ড জমি খরিদ করিয়া চতুষ্কোণ বিশিষ্ট একটি দালান তৈরিরও ভিত্তি স্থাপন করিলাম। কলিকাতার অন্যান্য স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী এই ভবনের নির্মাণ কার্য অগ্রসর হইতে থাকে।

ইহার পর আমি এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম। অবশ্য ইহার খরচও তেমন বেশি কিছু ছিল না। কিন্তু আমি কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর কাছে এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানাইয়া সুপারিশ করিতে চাই যাহাতে

www.waytojannah.com

এই প্রতিষ্ঠানটির ঔজ্জ্বল্য আরো বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠানটি আবহমান কাল ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

মাদ্রাসা ভূমির জমির মূল্য ছয় হাজার দুইশত আশি টাকা দুই আনা এগার পাই। অতঃপর মাদ্রাসা ভবন নির্মাণে জমির মূল্যসহ সর্বমোট সাতান্ন হাজার সাতশত পঁয়তাল্লিশ টাকা দুই আনা এগার পাই খরচ হইতেছে। অবশ্য এই খাতে ইহার চাইতে বেশি যেন আর খরচ না হয় আমি এই ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখিব।

এখন আমার অনুরোধ, এই খরচ অনুমোদন করিয়া তাহা কোম্পানীর হিসাবে শামিল করা হউক। অতঃপর এই কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য আমাকে অনুমতি প্রদান করা হউক। ইহা ছাড়া মাদ্রাসার ক্রমবর্ধমান খরচ নিবৃত্তি করার জন্য এক খণ্ড জমিও বিধিবদ্ধ করা হউক। বর্তমানে মাদ্রাসার খরচ নিম্নরূপ ঃ

১.	অধ্যাপকদের বেতন	৩০০	টাকা	মাসিক
২.	৫ টাকা এবং ৭ টাকা হারে চল্লিশ জন ছাত্রের নিয়মিত ভাতা	২২২	"	"
৩.	ঝাড়ুদার	৩	"	"
৪.	বাড়ি ভাড়া	১০০	"	"

দিবাভাগে যাহারা পড়াশুনা করে তাহারা কোন ফিস্ দেয় না। আগামীতে সর্বোচ্চ একশত ছাত্রের জন্য একহাজার টাকা মাসিক ভাতা বা বৃত্তি বরাদ্দ রাখিতে হইবে। এই জন্য এই ব্যাপারে আমি সুপারিশ করিতে চাই যে, কলিকাতার পার্শ্ববর্তী কোন মৌজা বা গ্রাম মাদ্রাসার খরচের জন্য বরাদ্দ করা হউক এবং এই ব্যাপারে নিয়মিত কার্য নির্বাহের জন্য রেভিনিউ কমিটিকেও অবহিত করা হউক।

আদায় উসুল এবং জমা-খরচের জন্য নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করিতে হইবে, যাতে কোনরকম হিসাবের গণ্ডগোল বা আত্মসাৎ মূলক সমস্যা দেখা না দিতে পারে এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম সুশৃঙ্খলভাবে অব্যাহত গতিতে চলিতে পারে।

স্বাক্ষর/ওয়ারেন হেস্টিংস
ফোর্ট উইলিয়াম
১৭ই এপ্রিল ১৭৮১ ইং

মঞ্জুর করিলাম, নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, এই আনুমানিক খরচ পরামর্শের পর হিসাবে শামিল করিয়া লইতে হইবে। গভর্নরের এই মতামতে আমিও একমত। এই ব্যাপারে স্থায়ী বন্দোবস্ত করা আমিও অনুমোদন করি। নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, এই বিবৃতি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের নকল মাদ্রাসা ভবনের নকশাসহ এই জাহাজেই অনারেবল কোর্ট অব ডাইরেক্টরস-এর সমীপে বিলাতে প্রেরণ করা হউক।

www.waytojannah.com

আলিয়া মাদ্রাসার পত্তন

মোট কথা, মোল্লা মাজদুদ্দিনকে কলিকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস করিবার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং তিনিও ইহাতে সম্মত হন। অতঃপর মুসলমানদের আসল উদ্দেশ্য অনুযায়ী ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে বৈঠক খানার (শিয়ালদা স্টেশন) একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে প্রস্তাবিত মাদ্রাসার উদ্বোধন করা হয়। 'দরসে নিজামিয়া' রীতি অনুযায়ী মাদ্রাসার শিক্ষা বিষয় প্রবর্তন করা হয়। কেন না, মোল্লা সাহেব নিজেই দরসে নিজামিয়ার ছাত্র ছিলেন। মাদ্রাসা ব্যয় নির্বাহের সকল দায়িত্ব গভর্নর নিজেই গ্রহণ করেন।

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোম্পানীকে গভর্নরের সুপারিশ

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল মাদ্রাসা সম্পর্কে তাহার উদ্যোগ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোম্পানীর ডিরেক্টরদেরকে অবহিত করিয়া বলেন ঃ

'আমি এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিয়াছি যেখানে মুসলমান ছাত্রদের আইন শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষা-লাভের পর ইহারা সরকারের অধীনে জজ এবং পরিসংখ্যানবিদের (এসেসর) পদ অলংকৃত করিবেন। এতকাল আমি এই মাদ্রাসার যাবতীয় খরচপত্র আমার বিশেষ তহবিল হইতেই পূরণ করিয়াছি। কিন্তু এখন কোম্পানীকে এই প্রতিষ্ঠানের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় আসিয়াছে। মাদ্রাসার জন্য ইতিপূর্বে যে জমি নেওয়া হইয়াছে কোম্পানী সেখানে উপযুক্ত মতো মাদ্রাসা-ভবন নির্মাণের বন্দোবস্ত করিবে। আমার হিসাবে আনুমানিক ইহাতে একান্ন হাজার টাকা ব্যয় হইবে।[১৬]

যদিও কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরস মাদ্রাসা সম্পর্কে গভর্নরের এই প্রস্তাব বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর কাছে প্রেরণ করিয়াছেন কিন্তু ১৭৮২ সাল নাগাদও মাদ্রাসা সম্পর্কে কোন মঞ্জুরি পাওয়া যায় নাই। অতঃপর গভর্নর নিজেই এই মাদ্রাসার খরচাদি নিজের তহবিল হইতে বহন করিতে লাগিলেন। কোন মতেই মাদ্রাসা বন্ধ হইতে দিলেন না।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস পুনর্বার মাদ্রাসার যাবতীয় খরচ পত্রের একটি বিরাট ফিরিস্তি তৈয়ার করিয়া বোর্ডে পেশ করিলেন। এ যাবত মাদ্রাসায় পনের

১৬. Past and Present of Bengal Vol vii-P-99

www.waytojannah.com

Contents

হাজার দুইশত একান্ন টাকা, এবং জমি খরিদ বাবদ পাঁচ হাজার ছয়শত একচল্লিশ টাকা, সর্বমোট বিশ হাজার আটশত নব্বই টাকা আদায়ের ব্যাপারে বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেন এবং এই অংক আদায় করিয়া নেন। এই সংক্রান্ত বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

গভর্নরের পক্ষ হইতে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, অর্থনৈতিক কমিটি অদ্যাবধি মাদ্রাসার খরচ নির্বাহের জন্য শহরতলি এলাকায় এক বা একাধিক মৌজা আলাদা করিবার জন্য এখনো কোন নির্দেশ প্রদান করেন নাই। অথচ ১৭৮১ সালের ১৮ই এপ্রিলের বৈঠকে বোর্ড এই ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই যাবত মাদ্রাসার যাবতীয় খরচপত্র আমার বিশেষ তহবিল হইতে পূরণ করা হইতেছে। আমি এ ব্যাপারে আর একবার অনুরোধ করিতেছি যে, অর্থনৈতিক দফতরে এই মর্মে পুনর্বার আদেশ জারি করা হউক যে, আমি এবাবদ যাহা খরচ করিয়াছি তাহা যেন পরিশোধ করা হয়। এযাবত আমি মাদ্রাসাতে আট হাজার দুইশত একান্ন টাকা বার আনা খরচ করিয়াছি। মাসিক খরচের তালিকা ১৭৮১ সালের ১৮ই এপ্রিলে উল্লেখ করিয়াছি। যখন খরচ সত্যি মিলাইয়া দেখা হইল, দেখা গেল মুনশীর ভুলক্রমে খরচ কম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এজন্য আমার অনুরোধ, বোর্ড অর্থনৈতিক বিভাগকে এই মর্মে উপদেশ দেন, যেন মাদ্রাসার খরচ নির্বাহ করিবার জন্য এক বা একাধিক মৌজা বরাদ্দ করেন, যাহার মাসিক আয় বারশত টাকা এবং এই মাসের এক তারিখ হইতেই এই আমদানী কার্যকরী করা হউক।

ইহাও জানিতে পারিলাম যে, মাদ্রাসার জন্য যে জমি খরিদ করা হইয়াছে তাহার মূল্য সম্পর্কেও ভুল অংক পরিবেশন করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে আমি ইহার মূল্য ছয় হাজার দুইশত আশি টাকা লিখিয়াছিলাম। প্রকৃত পক্ষে উহার মূল্য পাঁচ হাজার ছয় শত একচল্লিশ টাকার বেশি নয়। নিম্নে প্রদত্ত এই তালিকা হইতেই তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। এজন্য আমার অনুরোধ যে, বোর্ড যেন সাব-ট্রেজারির নামে নির্দেশ জারি করেন, মাদ্রাসার ব্যাপারে আমি আগাম যে টাকা খরচ করিয়াছি তাহা যেন চলতি মাসের হিসাবে তুলিয়া নেয় এবং এ সমুদয় টাকার সুদসহ একখানি চেক আমার নামে ইস্যু করে। আমি যখন হইতে টাকা খরচ করিয়াছি তখন হইতে উহা কার্যকরী হিসাবে পরিগণিত হইবে। উপরন্তু আমি ইহাও বলিতে চাই যে, অর্থ সংক্রান্ত দফতর বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকট হইতে এতদসংক্রান্ত অনুমোদন লাভ করিয়া সরকারী কাগজ-পত্র যেন সংরক্ষণ করিয়া রাখেন।

www.waytojannah.com

মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহ

মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থায়ী আমদানী হিসাবে বোর্ড চব্বিশ পরগণার কতিপয় মৌজা বিধিবদ্ধ করেন যাহার মাসিক আয় ছিল বার শত টাকা। এ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে অবহিত করিয়া যে বিবরণ পাঠানো হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ ঃ

'প্রাচ্য শিক্ষার সম্প্রসারণ বা উন্নতির জন্য আমার ১৮ই এপ্রিলের (১৭৮১ খৃঃ) প্রস্তাব অনুযায়ী মাদ্রাসা বা কলেজ স্থাপন করা হইয়াছে এবং নিয়মিতভাবে তাহা চলিতেছে। এই মাদ্রাসার জন্য একটি ভবনও নির্মাণ করা হইয়াছে। বোর্ড এই মাদ্রাসার খরচ নির্বাহের জন্য শহরের কাছাকাছি কিছু জমি বরাদ্দ করিয়াছেন। এই জমির মাসিক আয় বার শত টাকা। আমার বিশ্বাস, এই আমদানী মাদ্রাসার বর্তমান ব্যয় নির্বাহের যথার্থ পরিপূরক হইবে।

মাদ্রাসা ভবনের জন্য সম্পত্তি কবলার তালিকা ঃ

	বিক্রেতার নাম	কাঠা বিঘা	প্রতি কাঠা সালামি	মূল্য
১.	ফকির চান্দ তেওয়ারী	৫—২	৮০ টাকা	৩৬০১ টাকা
২.	বানীকর	৩—	”	২৪০ ”
৩.	আরুমী রাওন	৪ ১/২—	”	৩৬০ ”
৪.	তাজুর মুরমেন	২—	”	১৬০ ”
৫.	হায় ওয়াটি	৬ ১/২—	”	৫২০ ”
৬.	হিরানী রাওন	৫—	”	৪০০ ”
৭.	এলিজাবেথ এবং রবার্ট	৬—	”	৩৬০ ”
		১২—৩		৫৬৪১*

স্বাক্ষর

ওয়ারেন হেস্টিংস

মাদ্রাসার আদর্শ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরো ব্যাখ্যা

১৭৮৫ খৃস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি মাদ্রাসার উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সম্পর্কে আরো

* Consultation no 283 dt. 3rd June 1782.

www.waytojannah.com

Contents

বিস্তৃত ব্যাখ্যা দান করেন। পরিশেষে মাদ্রাসার আরো উন্নতি এবং সম্প্রসারণ সম্পর্কে কতিপয় প্রস্তাব পেশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

'সময়োপযোগী নীতির চাহিদা অনুযায়ী বর্তমানে ফৌজদারী বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগের অধিকাংশ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমান অফিসারদেরকে বহাল করা উচিত। কিন্তু এইসব পদের দায়িত্ব সম্পাদনের বেলায় শুধু ব্যক্তিগত এবং প্রচলিত সতর্কতা অবলম্বনই যথেষ্ট নহে। বরং আরবী এবং ফারসী ভাষার মাধ্যমে ইসলামী ফিক্‌হর নিরিখে সূক্ষ্ম সমস্যাবলী সমাধানের যোগ্যতা থাকাও নেহাত প্রয়োজন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, কিছুকাল হইতে এ ধরনের অনুসন্ধিৎসু শিক্ষাবিদরা ক্রমান্বয়ে দুর্লভ হইয়া পড়িতেছেন।

আমরা যেহেতু অর্থ বিভাগ নিজেদের আয়ত্তেই রাখিয়াছি। এজন্য এই বিভাগের সকল কর্মচারী হয় ইংরেজ নয়ত হিন্দু। তাহাদের পরিমিত শিক্ষা, মিতব্যয়ী স্বভাব এবং সহজাত দক্ষতা গুণে অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহারা মুসলমানদের চাইতে সকলাংশে অগ্রসর। এইজন্য এই বিভাগে মুসলমান কর্মচারী নাই।

এইখানে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, মুসলমানদের রাজত্বের পতনের পর তাহাদের পারিবারিক কাঠামো রীতিমত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে আর্থিক সঙ্গতি নাই বলিয়া তাহাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া উচ্চতর সরকারী পদে বহাল করিতে পারে না। তাহাদের এই অবনতি রোধ করিবার জন্য গভর্নর বাহাদুর আলিয়া মাদ্রাসার পত্তন করেন। যাহাতে ভবিষ্যতে মুসলমানরা উপযুক্ত হইয়া সরকারী পদে বহাল হইবার সুযোগ পায়। সেই উদ্দেশ্যে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে চব্বিশ পরগণার কতিপয় মৌজা মাদ্রাসার খরচ নির্বাহের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। বর্তমানে এই মৌজার ব্যবস্থাপনা ও লগ্নি সংক্রান্ত ব্যাপার চব্বিশ পরগণার কালেক্টরীর অধীনে রাখা হইয়াছে। কিন্তু গভর্নর জেনারেল এই পদ্ধতি পছন্দ করেন না। তিনি বরং এ ব্যাপারে নিম্ন লিখিত স্কীম পেশ করেন ঃ

১. মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসার সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা একটি লিখিত অনুমতির মাধ্যমে মাদ্রাসার বর্তমান প্রধান অধ্যাপক মোল্লা মাজদুদ্দিনের হাতে সমর্পণ করা হউক। সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহার কার্যক্রম পরিচালিত হইবে এবং যখনই এস্থলে অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত করার প্রয়োজন হইবে গভর্নর জেনারেলের উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদনক্রমে তাহা হইবে।

২. মাদ্রাসার জন্য যে জমি বরাদ্দ করা হইয়াছে, পাবলিক রেভেনিউ হইতে উহাকে আলাদা করিতে হইবে। তাহার সমস্ত দায়িত্ব মাদ্রাসার বর্তমান প্রধান অধ্যাপকের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে।

www.waytojannah.com

৩. মাদ্রাসার ছাত্রদের জায়গীর, বৃত্তি, কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য যাবতীয় খরচাদি প্রধান অধ্যাপক এই জমির আয় হইতে নির্বাহ করিবেন। রাজস্ব কমিটিকে এ ব্যাপারে আর কোন ব্যয় করিতে হইবে না।

৪. প্রধান অধ্যাপক প্রতি মাসে ছাত্রদের সংখ্যা এবং প্রদত্ত বৃত্তির পরিমাণের বিবরণ লিখিয়া রাজস্ব কমিটিতে পেশ করিবেন।

৫. রাজস্ব কমিটির একজন সদস্য ন্যূনপক্ষে তিনমাসে একবার মাদ্রাসা পরিদর্শন করিবেন এবং মাদ্রাসার কার্যক্রম সন্তোষজনক কিনা তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন।[১৭]

বোর্ড গভর্নর জেনারেলের এই সমুদয় প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং গভর্নর জেনারেলকে এই মর্মে উপদেশ দেন যে, বাংলার সহকারী প্রশাসক মোহাম্মদ রেজা খানের (সেকালে গভর্নরের পর ইহাই ছিল দেশের সর্বোচ্চ পদ) নামে এই মর্মে ফরমান জারি করা হউক যে, আগামীতে ফৌজদারী আদালতে যখনই কোন পদ খালি হইবে সেস্থলে যাহাদের নিকট আলীয়া মাদ্রাসার সনদ থাকিবে তাহাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।[১৮]

মাদ্রাসা মহালের ইতিবৃত্ত

রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া জানা যায় যে, মাদ্রাসা মহালের সম্পত্তি কিছুকাল মোল্লা মাজদুদ্দিনের পরিচালনাধীনে ছিল। কিন্তু সরকার লিখিতভাবে এই সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছেন কিনা তাহার কোন লিখিত রেকর্ড পাওয়া যায় না। রেকর্ডে মোটামুটিভাবে উল্লেখ আছে যে, মাদ্রাসা মহাল নামে যে সম্পত্তি চিহ্নিত করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে আলিয়া মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ। কিন্তু এতদসংক্রান্ত কোন ওয়াক্ফ নামার উল্লেখ নাই। ১৭৯০ সালে সরকার যখন এই মাদ্রাসা নূতন পদ্ধতিতে সংস্কার করিবার চেষ্টা করেন তখন মুসলমানেরা এই মর্মে বিরোধিতা করেন যে, মাদ্রাসা ওয়াক্ফ সম্পত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। এইজন্য মাদ্রাসার সংস্কার বা পরিবর্তন করা অন্যায় হইবে। বরং এজন্য মাদ্রাসা মহালের সম্পত্তির সম্যক তদন্ত হওয়া উচিত। অতঃপর এই কাজের জন্য রাজস্ব বোর্ডের সদস্য মি. সলোমনকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তিনি মাদ্রাসা মহালের প্রকৃতি ও অবস্থান সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সঠিক অবস্থার নির্ণয় করিবেন। মি. সলোমন এই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তাহার রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন। এই রিপোর্টের সারাংশ নিম্নরূপ ঃ

'মাদ্রাসার খাস মহালের তিপ্পান্নটি মৌজা রহিয়াছে (সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ রেকর্ডে রহিয়াছে)। এই সম্পত্তির সর্বমোট আমদানী আনুমানিক বাৎসরিক ছত্রিশ

---

১৭. Revenue records dt. 15.8. 1785 P. no. 92

১৮. চব্বিশ পরগণাস্থিত মাদ্রাসার এই সম্পত্তিকে 'মাদ্রাসা মহাল' বলা হইত। মাদ্রাসা মহাল নামে বন্দোবস্তকৃত এই সম্পত্তি সরকারী রেকর্ডে সংরক্ষিত আছে।

www.waytojannah.com

হাজার আটাশ টাকা। তন্মধ্যে উনত্রিশ হাজার এক'শ বিয়াল্লিশ টাকা নিশ্চিত এবং বাকি আমদানী অনিশ্চিত ধরা যায়।

কমিটি এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে হুকুম দিলেন যে, উপরে বর্ণিত তফসিলী সম্পত্তি কলিকাতা (২৪ পরগণা) হইতে খারিজ করা হউক। ২৪ পরগণার কালেক্টর মি. টেচেন্টকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন অচিরেই এই সম্পত্তি দেখাশুনা এবং পরিচালনার জন্য একজন নির্ভরযোগ্য লোককে নিয়োজিত করেন। কেননা, এই সম্পত্তির আয় মাদ্রাসার খরচের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। গভর্নর জেনারেল এই মর্মে যতদিন না বিশেষ কোন ফরমান জারি করিবেন ততদিন এই হুকুম বলবৎ থাকিবে।

কিন্তু ১৭৮২ সালের জুন অবধিও এই সম্পর্কে গভর্নর কোন নির্দেশ দেন নাই। অবশ্যই বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর সেক্রেটারী মি. জে. পি. অরিয়েল রাজস্ব কমিটিকে প্রদত্ত এক লিখিত বিবৃতিতে বলেন ঃ

আপনারা হয়ত এই ব্যাপারে ওয়াকিফহাল যে, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে গভর্নর জেনারেল একটি মাদ্রাসা বা ইসলামী কলেজের পত্তন করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আমি আরো আলোকপাত করিতে চাই যে, এই সঙ্গে প্রদত্ত যে সব জমির কবলা এবং দলিলপত্র প্রেরণ করিলাম তাহা মাদ্রাসা ভবন নির্মাণের জন্য খরিদকৃত সম্পত্তির তালিকা বিশেষ। ইহা ছাড়া গভর্নর জেনারেলের আরো একটি হুকুম সম্পর্কেও আপনাদেরকে অবহিত করিতে চাই যে, মাদ্রাসার যাবতীয় খরচ নির্বাহের জন্য কলিকাতার কাছাকাছি কতিপয় মৌজা বরাদ্দ করিতে হইবে এবং যাহার মাসিক আয় বার শত টাকা হইতে হইবে। মাদ্রাসার খরচপত্রের ব্যাপারে জরুরী আইন কানুনও প্রণয়ন করিয়া দিতে হইবে যাহাতে বাহুল্য খরচের অবকাশ না থাকে। এই সম্পত্তির আমদানী ১৭৮২ সালের পয়লা জুন হইতে মাদ্রাসার জন্য কার্যকরী করিতে হইবে। (মাদ্রাসা ভবন নির্মাণের জন্য খরিদকৃত সম্পত্তির তালিকা ৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

মিঃ সলোমনের তদন্ত এখানে আসিয়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। কেননা তিনি অতঃপর ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ঘটনার সূত্রপাত করেন এবং ইহার মধ্যবর্তী সময়ে গভর্নর জেনারেল মোল্লা মাজদুদ্দিনের হাতে সম্পত্তির ভার অর্পণ করেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারিতে প্রদত্ত রাজস্ব কমিটির রিপোর্ট ইহার অনুকূলে রহিয়াছে। উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে ঃ

'মাদ্রাসা মহালের দায়িত্ব মোল্লা মাজদুদ্দিনের হাতে সমর্পণ করা ঠিক হয় নাই। কেননা তিনি ইহার তদারক করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। বিগত তিন বৎসর যাবত তাঁহার হাতে এই সম্পত্তির দায়িত্ব রহিয়াছে, ফলে দিন দিন এই সম্পত্তির আয় অনেক হ্রাস পাইয়াছে। এজন্য এই সম্পত্তির যথার্থভাবে তদারকের জন্য একজন আমিন নিয়োগ করার প্রয়োজন রহিয়াছে।

www.waytojannah.com

এই বিবরণে একথা পরিস্ফুট যে, ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মোল্লা মাজদুদ্দিনকে এ সম্পত্তি তদারকের ভার অর্পণ করার পর তাঁহার বিরুদ্ধে রাজস্ব বিভাগে গুরুতর অভিযোগ সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ মোল্লা সাহেব সম্পত্তি তদারকের ব্যাপারে ব্যর্থ হইয়াছেন।

মাদ্রাসা মহালের জন্য আমিন নিয়োগ

অতঃপর এই সম্পত্তি দেখাশুনার জন্য একজন মুতাওয়াল্লী আমিন নিয়োগ করা হইল। আমীন এই সম্পত্তির হিসাবে পরিগণিত হইতেন, উক্ত আমিন সম্পর্কে আরো জানা যায় যে, তিনি শুধু সম্পত্তি দেখাশুনার কাজেই নিয়োজিত ছিলেন না বরং মাদ্রাসার কতগুলি আভ্যন্তরীণ দায়িত্বও তাঁহার উপরে ন্যস্ত ছিল। মাদ্রাসার আইন-কানুন, ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে মতামত প্রদান, মাদ্রাসার ছুটিছাটা ও শিক্ষকদের পদত্যাগ মঞ্জুর করা ইত্যাদি তাঁহার দায়িত্বের আওতাভুক্ত ছিল। এভাবে মাদ্রাসার পরিচালনা দণ্ড দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গেল। মাদ্রাসার ছাত্ররা তখন আর প্রধান অধ্যাপক বা শিক্ষকদের মুখাপেক্ষী ছিল না। সবাই আমিনের কাছে তোষামোদ করিতে লাগিল। ফলে, শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের সমীহভাব কমিয়া আসিতে লাগিল এবং শিক্ষকের ব্যাপারে তাহারা বেপরোয়া হইয়া গেল। শিক্ষকদের সহিত তাহাদের শুধু পড়াশুনার সম্পর্কই রহিল। মোটকথা, ছাত্র-শিক্ষকের পবিত্র সম্পর্কে ফাটল ধরিল এবং মাদ্রাসার স্বচ্ছন্দ পরিবেশে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হইল। আমিন নিয়োগের পর মাদ্রাসার আমদানীরও তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই বরং মাদ্রাসার আমদানীর অধঃপতন ঘনাইয়া আসিল। ফলে, শিক্ষকদের বেতন এবং ছাত্রদের বৃত্তির টাকা বাকি পড়িতে লাগিল। অথচ মাদ্রাসার এই সম্পত্তি সরাসরি কৃষকরাই চাষাবাদ করিত।

আমিনের পদচ্যুতি এবং কালেক্টর নিয়োগ

অবশেষে বাধ্য হইয়া রাজস্ব কমিটির সভাপতি মিঃ জনশুর আমিনকে পদচ্যুত করেন এবং মাদ্রাসার সকল আর্থিক সংক্রান্ত ব্যাপার নিজের হাতে নেন। আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রধান অধ্যাপকের হাতেই পূর্ববৎ বহাল হইল। মি. সলোমনের রিপোর্টে এই সমুদয় বৃত্তান্তের কিছুই নাই। মি. সলোমনের রিপোর্টে পুনরায় ফিরিয়া আসা যাক। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আমিন এবং প্রধান অধ্যাপকের অদক্ষতার কারণে বোর্ড অব রেভিন্যু ১৭৯০ সালে সুপারিশ করেন যে, চব্বিশ পরগণাস্থ মাদ্রাসা সম্পত্তি পুনরায় স্থানীয় কালেকটরীতে লওয়া হউক এবং এই সম্পত্তির আনুমানিক আমদানী সম্পর্কে মতামত প্রদান করা হউক। কেননা এই আয়ের পরিমাণ জানার পরই প্রতি মাসে ট্রেজারি হইতে মাদ্রাসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ সম্ভব হইবে। রাজস্ব বিভাগ এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় কত টাকা নির্ধারণ করিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে কোন কিছুই জানা যায় না। শুধু এতটুকুই জানা যায় যে, ১৭৯০ সালে উক্ত

www.waytojannah.com

সম্পত্তি পুনরায় সরকারী কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া যায় এবং সরকার মাদ্রাসার সমুদয় খরচ বহন করিতে থাকেন। এইসময় মাদ্রাসার বার্ষিক ব্যয় ছিল ত্রিশ হাজার টাকা।[১৯]

মাদ্রাসা মহালের উপর নদীয়ার জমিদারের দাবি

১৭৯৫ সাল অবধি এই সম্পত্তি সরকারের অধীনে ছিল। ইতিমধ্যে নদীয়ার জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র রায় আদালতে মামলা দায়ের করিয়া দাবি করিলেন যে, এই মাদ্রাসা মহালের সম্পত্তি আসলে তাঁহার। এই দাবি সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অনুকূলে রায় দেয় এবং ১৮০০ সাল নাগাদ এই সমুদয় সম্পত্তি চব্বিশ হাজার আট শত সত্তর টাকায় সরকারী লগ্নির বিনিময়ে রাজাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। এই মোকদ্দমার সময় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কোন রকম উচ্চবাচ্য করে নাই এবং উহা যে মাদ্রাসার ওয়াক্‌ফ ছিল তাহারও কোন দলিল পেশ করিতে পারে নাই। অতঃপর এভাবে মাদ্রাসা মহাল চিরতরে নদীয়ার জমিদারের অধীনে চলিয়া যায়।

সমসাময়িক ঘটনা হইতে অনুমান করা যায় যে, ১৭৮৫ সালে গভর্নর জেনারেলের আদেশক্রমে মোল্লা মাজদুদ্দিনকে এই সম্পত্তি তদারকের ভার দেন, কিন্তু লিখিতভাবে কোন ওয়াক্‌ফনামা বা হস্তান্তরের দলিল প্রদান করা হয় নাই। অতঃপর গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস সেই বৎসরই বিলাত প্রত্যাবর্তন করেন। লর্ড হেস্টিংস যদি আরো কিছুকাল থাকিতেন তাহা হইলে এই সম্পত্তির নিয়মতান্ত্রিক দলিল হয়তো প্রদান করা হইত।

এই সম্পত্তি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের হাত হইতে যখন সরকারের অধীনে চলিয়া যায় এবং সরকার সরাসরি মাদ্রাসার ব্যয় বহন করিতে থাকেন, তখনই মূলত এই সম্পত্তির সহিত মাদ্রাসার সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। নদীয়ার জমিদারের দাবি বরং সরকারী সম্পত্তির উপরই করা হইয়াছিল।

মাদ্রাসার সংস্কার এবং দরসে নিজামিয়ার ইতিবৃত্ত

১৭৯০ সাল অবধি মাদ্রাসার শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষাবিষয় দরসে নিজামিয়ার অনুরূপ ছিল। কেননা এই সিলেবাস অনুযায়ী পাক-ভারতের অন্যান্য মাদ্রাসায় শিক্ষাদান করা হইত। এই দরসে নিজামিয়ার প্রবর্তক ছিলেন লক্ষ্ণৌর ছাহালী নিবাসী মোল্লা কুতুবুদ্দিনের পুত্র মোল্লা নিজামুদ্দিন ছাহালুভী। তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং বহু গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। দরসে নিজামিয়ার প্রবর্তক হিসাবে তাঁহার নাম চিরকাল ইসলামী শিক্ষার ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। অদ্যাবধি পাক-ভারতের প্রাচীন

---

১৯. Education In India under E. I. Company by Major Basu, P-39

www.waytojannah.com

মাদ্রাসাগুলি দরসে নিজামিয়ার রীতিতে পরিচালিত হইতেছে। এই সিলেবাসের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

১. প্রত্যেক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত দুই একখানি পুস্তক।

২. প্রত্যেক বিষয়ের অত্যন্ত সুলিখিত এবং অনবদ্য একখানি পুস্তক।

৩. তর্ক শাস্ত্র (মান্‌তেক) এবং দর্শন শাস্ত্রের প্রাধান্য সর্বাধিক।

৪. হাদীস গ্রন্থাবলী হইতে শুধু মেশকাত শরীফ।

৫. সাহিত্য পুস্তকের পরিমাণ নেহাত সীমিত।

এই সিলেবাস প্রণয়নে মোল্লা নিজামুদ্দিন সাহেবের একটি উদ্দেশ্য বিশেষ কার্যকরী ছিল, তা হলো কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত এইসব কেতাব পড়ার পর ছাত্রদের এতখানি ক্ষমতা হইবে যাহাতে সে যে কোন বিষয়ের যে কোন পুস্তক পড়িয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এই কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত দরসে নিজামিয়ার গ্রন্থাবলী রপ্ত করার পর আরবী ভাষার কোন গ্রন্থই আর তাহাদের কাছে দুরূহ ঠেকে না। একজন মাঝারি মেধার ছাত্র ষোল-সতের বৎসর বয়সেই এই সিলেবাসের সকল কোর্স সমাপ্ত করিতে পারে। দরসে নিজামিয়া এতখানি জনপ্রিয় শিক্ষা মাধ্যম যে, বাংলাদেশ হইতে সুদূর পেশোয়ার পর্যন্ত সকল ছোট এবং বড় মাদ্রাসায় এই সিলেবাস অনুসরণ করা হইত।

কালের বিবর্তনে বর্তমানে দরসে নিজামিয়ার মৌলিক রূপ অনেকখানি বিকৃত হইয়াছে। বর্তমানে এই দেশের মাদ্রাসাগুলিতে যে দরসে নিজামিয়া চালু আছে আসল দরসে নিজামিয়ার সহিত তাহার সাদৃশ খুবই কম। আজকাল দরসে নিজামিয়ার নামে যেসব কেতাবপত্র পাঠ্য করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং নিজামিয়ার পরিপন্থী। মোল্লা নিজামুদ্দিন ১০৮৯ হিজরীতে জন্মলাভ করেন এবং ১১৬১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[২০] মোল্লা নিজামুদ্দিন দরসে নিজামিয়ার জন্য যেসব পুস্তক এবং গ্রন্থাবলী অনুমোদন করিয়াছেন বিষয় ভেদে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

ছরফ	ঃ	মিজান মুনশাব, ছরফেমীর, পাঞ্জেগাঞ্জ, জুবদা, ফসুলে আকবরী ও শাফিয়া।
নহু	ঃ	নহুমীর, শরহে মিয়াতে আমেল, হেদায়াতুন্‌নহু, কাফিয়া ও শয়হে জামি।
মনতেক	ঃ	ছোগরা, কোবরা, ইছাগুজি, তাহজিব, শরহে তাহজিব, কিবতী মা' মীর ও ছুল্লমুল উলুম।

২০. মাকালাতে শিবলী

www.waytojannah.com

হেকমত (বিজ্ঞানী) ঃ মায়বুজী, ছদরা, শামছেবাজেগা।

অংক ঃ খোলাসাতুল হেছাব, তাহরিরে আকলিদাস (মকালায়ে উলা), তাশরিহুল আফলাক, রেছালায়ে কুশজিয়া, শরহে চগমুনী (১)।

বালাগাত (ভাষাশৈলী) ঃ মুখতাসারুল মা 'আনী, মোতাওয়াল।

ফেকা ঃ শরহে বেকায়া, হেদায়া (আখীরাইন) ও আওয়ালাইন।

উসুলে ফেকা ঃ নূরুল আনওয়ার, তাওজিহ, তালবিহ, মুছল্লমুছ ছবুত।

কালাম ঃ শরহে আকায়েদে নছফী, শরহে আকায়েদে জালালী, মীরজাহেদও শরহে মওয়াকেফ।

তফসীর ঃ জালালাইন ও বয়জাবী।

হাদীস ঃ মেশকাত

দরসে নিজামিয়ার বর্তমান সিলেবাস

ছরফ ঃ মিজান মুনশা'ব, পাঞ্জেগাঞ্জ, জুবদা, মোবতাদী, ছরফে মীর, ইলমুস সীগা, ফছুলে আকবরী ও শাফিয়া।

নহু ঃ নহুমীর, মেয়াতে আমেল, শরহে মেয়াতে আমেল, হেদায়াতুন্নহু, কাফিয়া ও শরহে জামী।

বালাগাত ঃ মোখতাছারুল মায়ানী কামেল ও মোতাওয়াল।

আদব (সাহিত্য) ঃ নাফ্হাতুল ইয়ামন, ছাবয়া মোয়াল্লাকা, দিওয়ানে মোতানাব্বী, মাকামাতে হারিরি ও হাম্মাসা।

ফেকা ঃ শরহে বেকায়া আওয়ালইন ও হেদায়া আখিরাইন।

অসুলে ফেকা ঃ নূরুল আনওয়ার, তাওজিহ্, তালবিহ ও মুছল্লমুছ ছবুত।

মানতেক (তর্কশাস্ত্র) ঃ ছোগরা, কোবরা, ইছাগুজি, তালে আকওয়াল, মিজান মনতেক, তাহজিব, শরহে তাহজিব, কুতবী, মীরে কুতবী, মোল্লাহাসান হামদুল্লাহ, কাজী মোবারক, মীর জাহেদ রেছালা, হাশিয়া, গোলাম ইয়াহিয়া, মোল্লা জালাল ও বাহরুল উলুম, শরহে মোছাল্লাম ইত্যাদি।

www.waytojannah.com

হেকমত (বিজ্ঞান)	ঃ	মাইবুজি, ছোদরা ও শামছে বাজেগা।
কালাম	ঃ	শরহে আকায়েদে নছফী, খায়ালী ও মীর জাহেদ উমুরে আম্মা।
রিয়াজী (অংক)	ঃ	তাহরিরে আকলিদাস মকালায়ে উলা, খোলাছাতুল হেছাব, তাছরিহ শরহে তাশরিহ শরহে চগমনী।
ফরায়েজ	ঃ	শরিফিয়া ও ছেরাজী।
মোনাজেরা	ঃ	মোনাজারোয়ে রশিদিয়া।
তাফসীর	ঃ	তফসীরে জালালাইন ও বয়জাবী (সুরায়ে বাকারা পর্যন্ত)।
হাদীস	ঃ	বোখারী, মুসলিম, মুতা, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা।

আলিয়া মাদ্রাসাতেও এই পাঠ্য পুস্তকাদি প্রচলিত ছিল। অন্যান্য বন্দোবস্তও দরসে নিজামিয়ার অনুরূপ ছিল। কিন্তু ১৭৯১ সালে সরকার এই পদ্ধতিকে আরো মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। মাদ্রাসা শিক্ষার আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য সরকার সচেষ্ট হইলে মুসলমানরা তাহাতে বাধা দেন এবং মাদ্রাসায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে পরিচালিত হয় এই দোহাই প্রদান করেন। সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার ও সংশোধন করিতে গিয়া বাধা প্রাপ্ত হন এবং বাধ্য হইয়া সরকার মাদ্রাসার তাবৎ বিষয়াদি সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং তথ্য উদ্ধারের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটি মাদ্রাসার সকল অব্যবস্থা তদন্ত করিয়া বোর্ডের সমীপে তাহা পেশ করেন।

১৭৯১ সালের ১৮ই মার্চের রেকর্ডপত্র হইতে জানা যায় যে, মি. জিপম্যান মাদ্রাসা তদন্ত করেন এবং মাদ্রাসাটির বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে বলিয়া তিনি জানান। মাদ্রাসার রেজিস্টারে বৃত্তিভোগী ছাত্রদের নাম ছিল। কিন্তু তাহারা মাদ্রাসায় কোনমতে হাজিরা দিত, পড়াশুনা এবং নিয়মতান্ত্রিক উপস্থিতি সম্পর্কে তাহাদের ঔৎসুক্য ছিল না। ছাত্রদের নৈতিক এবং চারিত্রিক অধঃপতনও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মি. জিপম্যানের নেতৃত্বে এই রিপোর্ট বোর্ডের সামনে পেশ করা হইলে মোল্লা মাজদুদ্দিনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও পদচ্যুতির জন্য গভর্নর জেনারেলের কাছে সুপারিশ করা হইল।

গভর্নর জেনারেল বোর্ডের সুপারিশক্রমে মোল্লা মাজদুদ্দিনকে পদচ্যুত করেন এবং সেস্থলে মোহাম্মদ ইসরাইল সাহেবকে প্রধান অধ্যাপক নিয়োগ করেন। এই সঙ্গে

www.waytojannah.com

মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কড়া নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি নিম্নরূপ ঃ

১.	রাজস্ব বোর্ডের সভাপতি	সভাপতি
২.	সরকারী ফারসী অনুবাদক	সদস্য
৩.	সরকারী রিপোর্টার	সদস্য

মাদ্রাসার পূর্বেকার কমিটি নিম্নরূপ ছিল ঃ

১. মি. টি গ্রাহাম

২. মি. জে, এফ চেরি

৩. মি. জি মায়ার

মাদ্রাসার জন্য প্রবর্তিত প্রাথমিক আইন-কানুন

১. কমিটির সদস্যরা দুই মাস অন্তর একবার মাদ্রাসা পরিদর্শন করিবেন।

২. কমিটি প্রধান অধ্যাপকের গতিবিধির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

৩. প্রধান অধ্যাপকের নিয়োগ ও বরখাস্ত গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল সম্পাদন করিবেন। অবশ্য এক্ষেত্রে তাঁহার সম্পর্কে প্রচুর অযোগ্যতার প্রমাণ থাকিতে হইবে।

৪. অন্যান্য শিক্ষকের নিয়োগ এবং বরখাস্ত কমিটির হাতে থাকিবে।

৫. সকল শিক্ষক অনুশাসনের ব্যাপারে প্রধান অধ্যাপকের অধীনে থাকিবেন এবং তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিবেন।

৬. ছাত্রদের প্রমোশন দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারে প্রধান অধ্যাপকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিবেচিত হইবে।

৭. উচ্চতর ক্লাশগুলির পড়াশুনা প্রধান অধ্যাপকের আওতায় থাকিবে।

৮. ছাত্রদের মাঝে শৃংখলা বজায় রাখা এবং শৃঙ্খলার প্রশ্নে কোন ছাত্রের শাস্তি, বৃত্তি বন্ধ অথবা মাদ্রাসা হইতে নাম খারিজ করিয়া দিবার সম্পূর্ণ অধিকার প্রধান অধ্যাপকের থাকিবে।

৯. মাদ্রাসার ফেকা ও ইসলামী বিধান সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষার সনদ প্রাপ্ত ছাত্রদেরকে ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আদালতের চাকুরীতে বহাল করিতে হইবে।

১০. কোন ছাত্রকেই সাত বছরের বেশি মাদ্রাসায় পড়াশুনা করিতে দেওয়া হইবে না।

www.waytojannah.com

Contents

১৭৯১ সালে মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনের তালিকা

১. হেড মওলবী (প্রধান অধ্যাপক)	মাসিক	৪০০	টাকা
২. দ্বিতীয় শিক্ষক	মাসিক	১০০	টাকা
৩. তৃতীয় শিক্ষক	মাসিক	৮০	টাকা
৪. চতুর্থ শিক্ষক	মাসিক	৬০	টাকা
৫. পঞ্চম শিক্ষক	মাসিক	৪০	টাকা
৬. খতিব	মাসিক	২০	টাকা
৭. মুয়াজ্জিন	মাসিক	১০	টাকা
		মোট ৭১০	টাকা

প্রত্যেক ছাত্রকে প্রতিমাসে ছয় টাকা হইতে পনের টাকা পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হইত। তাছাড়া ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতর-এর সময় বিশেষ খরচাদির জন্যও গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন ছিল।[২১]

ইংরেজ সেক্রেটারী নিয়োগের জল্পনা-কল্পনা

১৭৯১ সালের সংস্কার প্রচেষ্টার পর মাদ্রাসার আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং পড়াশুনার ক্ষেত্রে বেশ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ছাত্র সংখ্যাও বেশ বৃদ্ধি পাইল। এই ভাবে ১৮১১ সাল অবধি মাদ্রাসার কার্যক্রম স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে এবং কোনরকম উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে ১৮১১ সালের পর কমিটি মাদ্রাসার সার্বিক উন্নতি এবং দেখাশুনার জন্য একজন ইংরেজ অফিসার নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইতিপূর্বে এতদুদ্দেশ্যে একজন আমিন নিয়োগ করা হইয়াছিল সেকথা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু আমিনের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা প্রাপ্তি অবশেষে মাদ্রাসার শৃংখলা বিধানের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু ইদানীং কমিটি মনে করিলেন একজন ইংরেজ সেক্রেটারী সম্ভবত অনুরূপ কাজে বিশেষ সাফল্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন। অতঃপর এই মর্মে একজন ইংরেজ সেক্রেটারী নিয়োগের সুপারিশ করিয়া কমিটি সরকারের কাছে একখানি দরখাস্ত পেশ করেন। দরখাস্তে মাদ্রাসার যুগোপযোগী সংস্কার সাধনেরও জোর সুপারিশ করা হয়।

১৮১৩ খৃস্টাব্দে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস পুনরায় পাক-ভারতের গভর্নর জেনারেল নিয়োজিত হন। কমিটির এই দরখাস্ত তাঁহার খেদমতে পেশ করা হয়। তিনি কমিটির প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। কিন্তু একজন সেক্রেটারীর ব্যয়ভার

২১. Revenue report. dt. 11. 12. 1817.

www.waytojannah.com

মাদ্রাসা বহন করিতে পারিবে কিনা এই কথা চিন্তা করিয়া তিনি গড়িমসি করিতে লাগিলেন। তিনি কমিটির দরখাস্তের প্রতি উত্তরে বলেন ঃ

'আমিও কমিটির প্রস্তাবে একমত। মাদ্রাসার সংস্কারের বিধানের জন্য কমিটি যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহাও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তাহা অত্যন্ত ধীর মন্থর গতিতে করিতে হইবে। কেননা ইহাতে স্থানীয় জনগণের ভাবাবেগে আঘাত লাগিতে পারে। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারেও কমিটি যে প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছে তাহাও গভর্নর অবান্তর বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান না। তবে ইহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য প্রয়াস। কেননা, মুসলমানদের প্রচলিত এই শিক্ষা-ব্যবস্থা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই শিক্ষার গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য মুসলমানদের মন-প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অতএব এখন এই ধরনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা ঠিক হইবে না। তবে আস্তে আস্তে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার উপকারিতা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে মুসলমানদের মানসিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হইবে তখন উহা কার্যকরী করা তেমন কঠিন হইবে না।"

মাদ্রাসার প্রথম সেক্রেটারী

কমিটির অনেক লেখালেখি ও চেষ্টা-চরিত্রের পর গভর্নর জেনারেল অতঃপর ১৮১৯ সালে ক্যাপ্টেন এ্যারোনকে (AYRON) (পূর্বে তিনি চতুর্থ ইনফেন্ট্রীর কাপ্তান ছিলেন) আলীয়া মাদ্রাসার সেক্রেটারী পদে নিয়োজিত করেন। সামরিক বিভাগের এই ব্যক্তির নিয়োগ সম্পর্কে স্বয়ং গভর্নর মন্তব্য করিয়া বলেন ঃ

"এই ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কার্যদক্ষতা এই পদের জন্য খুবই সুসমঞ্জস হইয়াছে।"

কমিটি মাদ্রাসা সংস্কার ও যুগোপযোগী করিবার জন্য যে প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন তাহার নকল উদ্ধার কারা সম্ভব হয় নাই। এজন্যে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, তাহারা কি ধরনের সংস্কার চাহিয়াছিলেন।

মাদ্রাসা সংস্কারের দ্বিতীয় পর্যায়ের ধারাসমূহ

১৮২০ সাল নাগাদ কমিটি মাদ্রাসার আরো কিছু সংস্কার প্রার্থনা করিয়া একটা খসড়া গভর্নর জেনারেলের খেদমতে পেশ করেন। গভর্নর তাহা মঞ্জুর করিয়া যথাশীঘ্র কার্যকরী করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ধারাসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১. শুক্রবার ব্যতীত সপ্তাহে প্রত্যেক দিন ক্লাশ চলিবে। মাদ্রাসার কার্যকাল সকাল আট টা হইতে বিকাল দুইটা পর্যন্ত।

www.waytojannah.com

২. বিভিন্ন ক্লাসের দায়িত্ব বিভিন্ন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৩. লেখাপড়ার উন্নতি সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক রিপোর্ট সেক্রেটারীর মাধ্যমে গভর্নর জেনারেলের খেদমতে পেশ করা হইবে।

৪. ভর্তির পূর্বে ছাত্রদের উপযুক্ততা যাচাই করিবার জন্য একটি পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

৫. ভর্তির পর ষান্মাসিক পরীক্ষাও দিতে হইবে।

৬. বার্ষিক পরীক্ষা প্রতি বৎসরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হইবে। পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রদেরকে নগদ পুরস্কারাদি দিতে হইবে এবং এই পুরস্কারের অংক বার টাকা হইতে ১০০ টাকা পর্যন্ত হইবে।

৭. সচ্চরিত্র এবং মিতাচারের জন্য ছাত্রদের পুরস্কার বা খেলাত দিতে হইবে।

৮. যে সব ছাত্র বিশেষ সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, যোগ্যতানুযায়ী তাহাদেরকে সরকারী চাকুরীতে বহাল করিতে হইবে।

৯. কোন ছাত্রই দুই মাসের বেশি মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থাকিতে পারিবে না।

১০. ভর্তির জন্য ছাত্রদেরকে লিখিতভাবে দরখাস্ত করিতে হইবে।

১১. কোন ছাত্রই ২৮ বছর বয়স প্রাপ্তির পর আর মাদ্রাসায় পড়াশুনা করিতে পারিবে না।[২২]

পরীক্ষার প্রবর্তন ও তাহার বিরোধিতা

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রণীত ধারাসমূহের ৬ নং ধারা অনুযায়ী মাদ্রাসায় নিয়মতান্ত্রিক পরীক্ষা প্রবর্তনের প্রশ্ন উঠে। ছাত্র এবং শিক্ষকরা এ ধরনের পরীক্ষার বিরোধিতা করেন। বিরোধিতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহারা বলেন ঃ

"যেহেতু ইতিপূর্বে মাদ্রাসার পরীক্ষা ঘরোয়াভাবে সম্পন্ন হইত। ছাত্রদের কৃতকার্য হওয়া বা ফেল করা সম্পূর্ণ হেড মৌলবীর উপর নির্ভর করিত। এইজন্য মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ সব সময় হেড মৌলবীকে খুশী রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। কেন না ছাত্ররা ফেল করিলে তাঁহাদের সারা বৎসরের অধ্যাপনা বিফলে যাইবে। কোন শিক্ষকের প্রতি যদি হেড মৌলবী অপ্রসন্ন থাকিতেন তাঁহার ক্লাসের ছাত্ররা নিশ্চিতভাবে ফেল করিত। পক্ষান্তরে, ছাত্ররাও হেড মওলবীকে তোষামোদ করিয়া বেড়াইত। ফলতঃ ছাত্রদের যোগ্যতা এবং উপযুক্ততা যাচাইর এই কুক্ষিগত নীতির ফলে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসার অন্যান্য শিক্ষকের পরিশ্রম এবং যোগ্যতা যেমন পরিমাপ করিতে পারিবেন না, তেমনি যথার্থ মেধাবী ছাত্রদের প্রতিভাও সঠিকভাবে বিকাশ লাভ করিতে

২২. Revenue consultation dt. 27.10.1812

www.waytojannah.com

পারিত না। অতএব এই ধরনের সাধারণ পরীক্ষা প্রবর্তিত হইলে ছাত্ররা পরীক্ষার খাতায় যাহা লিখিবে তাহা যাচাই এবং নম্বর প্রদান করিবার জন্য অন্য লোক নিয়োজিত হইবেন। ফলে, ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের আসল পরিশ্রম তুলাদণ্ডে বিচার করা হইবে এবং তাহাদের আসল রূপ উন্মোচিত হইয়া পড়িবে। এক্ষেত্রে হেড মৌলবীরও আর বাড়তি দাপট এবং দায়িত্ব থাকিবে না। অতএব উপরোক্ত কারণের পরিপ্রেক্ষিতে হেড মৌলবীর নেতৃত্বে সকল শিক্ষক এবং ছাত্ররা এই নতুন ধরনের পরীক্ষার ঘোর বিরোধিতা করে।[২৩]

আসলে এই পরীক্ষার বিরোধিতার কারণ ছিল অন্যতর। প্রকৃতপক্ষে মাদ্রাসার এই শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা রীতি শতাব্দীকাল হইতে একই নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। এখন এই নতুন পরীক্ষার প্রবর্তন করা হইলে শত শত বৎসরের আরবী শিক্ষার মূল রীতিনীতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইবে। এইকথা চিন্তা করিয়াই মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক এই নতুন ধরনের সাধারণ পরীক্ষার বিরোধিতা করিয়াছিল।

সেকালের পরীক্ষার রীতিনীতি

সেকালের পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম-কানুন ছিল ভিন্ন ধরনের। সেকালে বিদ্যার্জন এবং জ্ঞানানুশীলনের প্রাধান্যই ছিল বেশি। একেবারে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এই ধরনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না সেকালে। সেকালে পরীক্ষা পাশের জন্য না ছিল কোন নির্দিষ্ট সময়, না ছিল ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক আর প্রশ্ন পত্রের জটাজাল। সেকালে একবার এবং শেষ বারের মত একটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত এবং তাহার প্রকৃতি অনেকটা এই ধরনের ঃ নির্দিষ্ট কেতাবাদি পড়া সম্পন্ন হইলে শিক্ষক নিজেই ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব কায়দায় পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। শিক্ষক যদি মনে করিতেন যে, লেখাপড়ায় ছাত্রটির কোন দৈন্য নাই। সে যথেষ্ট বিদ্যার্জন করিয়াছে এবং অপরকেও বিদ্যা শিক্ষা দিবার মতো যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে, তখনই পরীক্ষা পাসের সনদ প্রদান করা হইত। পক্ষান্তরে, যে ছাত্রকে পাশের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাহাকে কোনমতেই আর রেয়াত করিতেন না এবং যে বিষয়ে তাহার দৈন্য রহিয়াছে সে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেন। সেকালে যোগ্যতা অর্জন ছাড়াই কোন ছাত্র অহেতুক পাশ করিবার ভাবাবেগ প্রকাশ করিত না এবং যতদিন না শিক্ষক তাহার জ্ঞানার্জন সম্পর্কে আশ্বস্ত হইতেন ততোদিন অবিরাম পরিশ্রম করিতে হইত।[২৪]

---

২৩. Past and Present of Bengal Vol Vii Page-99
২৪. ডঃ জিয়াউদ্দিন কৃত 'নেজামে ইমতেহান' মুসলিম ইউনির্ভাসিটি জার্নাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৪

www.waytojannah.com

পরীক্ষার এই আদিমনীতি আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই এই রীতিতে অভ্যস্ত ছিল। স্বভাবতই এই রীতিতে ছাত্ররা শিক্ষকের অনুগত থাকিত এবং নিজেদের ভুল ও দোষত্রুটি শুধরাইয়া লইবার জন্য শিক্ষকের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিত।

অতএব এই প্রাচীন নিয়মের উপর সরকার যখন আধুনিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম চাপাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন তখন ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল।

মাদ্রাসার প্রথম নিয়মতান্ত্রিক পরীক্ষা

সকল বিরোধিতা সত্ত্বেও সরকার কমিটির প্রস্তাবিত আধুনিক পরীক্ষা নীতি অনুমোদন করিলেন এবং কলিকাতার টাউন হলে মাদ্রাসার প্রথম পরীক্ষার বন্দোবস্ত করেন। মাদ্রাসার প্রথম পরীক্ষা ১৮২১ সালের ১৫ই আগস্টে অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় পরীক্ষা ১৮২২ সালের ৬ই জুনে।

১৮২২ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পরীক্ষার সময় পদস্থ সরকারী অফিসার এবং গণ্যমান্য নাগরিকরা পরীক্ষা দেখিতে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মি. টমসন, শিক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারী ডঃ এইচ. এইচ. উইলসন এবং এইচ ডি. প্রিন্সফ-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া সদর দেওয়ানীর ল' অফিসার বৃন্দও এই ঐতিহাসিক পরীক্ষা দেখিতে আসিয়াছিলেন।

পরীক্ষা সমাপ্তির পর উভয় পরীক্ষার ফল গভর্নর জেনারেলের খেদমতে প্রেরণ করা হয়। বলা বাহুল্য, পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইয়াছিল। অতঃপর ১৮২১ সাল হইতে আলিয়া মাদ্রাসার এই পরীক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়।

১৮১৩ সালের শিক্ষা-নীতি

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন, সে বহুদিন পূর্বের কথা। কিন্তু কোম্পানী এ দেশের জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি তেমন মনোযোগ প্রদর্শন করেন নাই। এদেশ শাসনের মূলে তাহাদের একটি উদ্দেশ্যই বিশেষভাবে কার্যকরী ছিল, যে ভাবেই হউক এই দেশের সম্পদে বিলাতের স্বাচ্ছন্দ্য চারিদিকে ভরিয়া উঠিবে এই ছিল তাহাদের ইচ্ছা। কিন্তু বিলাতের পার্লামেন্টে এমন কিছু সংখ্যক লোকও ছিলেন যাহারা এই দেশের লোকদের শিক্ষার উপর কিছু অর্থ বরাদ্দ করার পক্ষপাতী ছিলেন। পাক-ভারতের লোকদের শিক্ষার প্রতি তাহাদের এই আগ্রহের পিছনে অবশ্য অন্য কারণ ছিল তাহা বারান্তরে আলোচনা করিব।

www.waytojannah.com

১৮১৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া গেল এবং পুনরায় চুক্তি বহালের প্রশ্ন বিলাতের পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়। এই সাথে পার্লামেন্টে এই দেশের শিক্ষা প্রসঙ্গও উত্থাপন করা হয়। পার্লামেন্টের কতিপয় মেম্বার এবং কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ এই ব্যাপারে প্রতিকূলে রায় প্রদান করেন এবং ভারতীয় লোকদের শিক্ষার পিছনে অর্থ ব্যয়কে সম্পূর্ণ অলাভজনক ব্যাপার বলিয়া অবিহিত করেন। এতদসত্ত্বেও পার্লামেন্টে এই দেশের শিক্ষা প্রসঙ্গকে মর্যাদা প্রদান করা হয় এবং এ ব্যাপারে একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা বা এ্যাক্ট করা হয়। এই এ্যাক্ট অনুযায়ী কোম্পানীকে এই দেশের শিক্ষা খাতে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। অতঃপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোম্পানীর ডিরেক্টরবৃন্দ ১৮১৪ সালের ৩রা জুনে গভর্নর জেনারেলকে উক্ত শিক্ষাখাতের এক লক্ষ টাকা খরচ করার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু এই নির্দেশের পাশাপাশি এই কথাও বলা হয় যে, এই অর্থের আনুকূল্যে সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত এবং সংস্কৃত মাধ্যম শিক্ষায়তনেরও যেন বেশি সহায়তা করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় যেসব সাহিত্য বা গ্রন্থাবলী আছে তাহা যেন ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। এই অর্থের আনুকূল্যে বেনারসের সংস্কৃত কলেজের উন্নতি এবং সম্প্রসারণের ব্যাপারেও যেন সহযোগিতা করা হয়।

মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন

এই নির্দেশে স্বভাবতই মুসলমানদের শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দ করার কোন উল্লেখ ছিল না। মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে তাহাদের এই ঔদাসীন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত। এই দেশের হিন্দুরা শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া মুসলমানদেরকে পরাভূত করিবে ইহাই ছিল কোম্পানী কর্তৃপক্ষের একান্ত ইচ্ছা।

আলিয়া মাদ্রাসা মুসলমানদের একমাত্র সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সরকার নিয়মিত এই প্রতিষ্ঠানের খরচ বহন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি ও সম্প্রসারণই ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল না। আলিয়া মাদ্রাসার মতো অন্য দিকে বেনারসের সংস্কৃত কলেজেও সরকার পর্যাপ্ত টাকা খরচ করিতেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানদের এই দুইটি প্রতিষ্ঠান চালু রাখিবার পিছনে তাহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল সরকারী কাজের জন্য কতিপয় যোগ্য অফিসার সৃষ্টি করা। এই প্রতিষ্টান দুইটি না থাকিলে সরকারের স্থানীয় বিচার বিভাগ ও অন্যান্য ধর্মীয় বিধান সংক্রান্ত কার্যক্রম বেকার হইয়া পড়িত এবং এইদেশে তাহাদের শাসনযন্ত্রও অচল হইয়া পড়িত।

দ্বিতীয়ত যোগ্য অফিসার সৃষ্টির জন্য তাহারা এই প্রতিষ্ঠান দুইটিতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতেন তাহার পরিমাণ ছিল খুবই কম। তুলনামূলকভাবে ফোর্ট উইলিয়াম

www.waytojannah.com

কলেজের সাংবাৎসরিক খরচের সাথে আলিয়া মাদ্রাসার খরচের তুলনা করিলে এই সত্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

আলিয়া মাদ্রাসা এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের খরচের তারতম্য

আলিয়া মাদ্রাসার পিছনে ১৭৮১ হইতে ১৮২৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৪৩ বৎসরে সর্বমোট গড়ে প্রতি বছর ৩০ হাজার ৭ শত ৭২ টাকা (মোট খরচ বাদে) খরচ হইয়াছে। যাহার ফলে প্রতি মাসের খরচ দাঁড়ায় ১ হাজার ৯ শত ৮১ টাকার মতো। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতি বৎসরের খরচ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকারও বেশি ছিল। এই কলেজে ইউরোপীয়ান সাহেবদের দেশ শাসনের কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রতি বছর এই প্রতিষ্ঠান হইতে মাত্র ২০/২৫ জন ছাত্র পাস করিয়া বাহির হইত।

১৮২৩ সালের শিক্ষা কমিটি

ভারতীয় শিক্ষাখাতে অনুমোদিত উক্ত এক লক্ষ টাকা খরচের ব্যাপারে সরকার গড়িমসি করিতে লাগিল এবং শেষাবধি ১৮২৩ সালে এই টাকার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহারের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড জন এডাম প্রথমত এই টাকা খরচ করিবার জন্য একটি অনারারী বোর্ডের পত্তন করেন। অতঃপর মি. বাল্ট ম্যাকেঞ্জীর পরামর্শক্রমে অনারারী বোর্ডের পরিবর্তে জন শিক্ষা বিভাগ কেন্দ্রিক একটি জেনারেল কমিটি গঠন করা হয়। ১৮২৩ সালের ১৭ই জানুয়ারিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে এই কমিটির সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়ঃ

১. জে. এইচ. হেরিংটন
২. জে. পি. লারকিন
৩. ডব্লু. বি. মারটিন
৪. ডব্লু. বি. বেইলী
৫. এইচ শেকস্‌পীয়ার
৬. হল্ট ম্যাকেজী
৭. হেনরি মুলে
৮. প্রিন্সফ্ এ স্টারলিং
৯. জে. সি. স্টারলিং
১০. এইচ. এইচ. উইলসন, সেক্রেটারী

জেনারেল কমিটি গঠিত হওয়ার পর মাদ্রাসার সকল ব্যাপার মাদ্রাসা কমিটির মাধ্যমে এই কিমিটিতে পেশ করা হইত। মাদ্রাসার প্রথম সেক্রেটারী মিঃ অ্যারন (AYRON)-এর বিদায় গ্রহণের পর মিঃ লুম্‌স্‌ডনকে সেক্রেটারী নিয়োগ করা হয়।

www.waytojannah.com

সহকারী সেক্রেটারী নিয়োগ

সেক্রেটারী নিয়োগ করার পরও কমিটির কার্যক্রম তেমন স্বচ্ছন্দভাবে চলিতে পারিত না। সেক্রেটারী শুধু অফিস এবং বাহ্যিক কাজকর্ম সম্পাদন করিতে পারিতেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে কমিটি ভালভাবে ওয়াকিবহাল থাকিতে পারিতেন না। কেননা, কমিটির পক্ষ হইতে এমন কোন লোক ছিলেন না যিনি শিক্ষকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতে পারিতেন। শিক্ষকদের সাথে মেলামেশা করিয়া ছাত্র এবং শিক্ষকদের অভাব-অভিযোগ তথা সমস্যাবলী দূর করার ব্যাপারে কোন তথ্যই কেহ কমিটির গোচরীভূত করিতে পারিত না। অতএব এই অচলাবস্থা দূর করার জন্য কমিটি ১৮২৩ সালে মাদ্রাসার জন্য একজন সহকারী সেক্রেটারীর পদ অনুমোদন করেন এবং মৌলবী হাফেজ আহমদ কবীরকে এই পদে বহাল করেন। হাফেজ আহমদ কবির অত্যন্ত ভদ্র, নম্র এবং মিতাচার সম্পন্ন একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি বার বৎসর যাবত মাদ্রাসার খতিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেসব ইংরেজ অফিসার তাঁহাকে জানিতেন সবাই তাঁহার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে যখন সরকার উত্তর সীমান্তবর্তী অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিদর্শন ও রিপোর্ট পেশ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তখন এই কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে সবাই তাঁহার নাম প্রস্তাব করেন।

সহকারী সেক্রেটারী পদে নিয়োগ হইবার পর মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক সবাই তাঁহাকে দেখিয়া সংকোচ বোধ করিত এবং তাহার সহিত সহজ হইতে পারিত না। কেননা, ভিন্ন অর্থে তিনি মাদ্রাসার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করিতেছেন। কিন্তু হাফেজ সাহেব খুবই হুঁশিয়ার এবং কৌশলী লোক ছিলেন, সকলের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিয়া তিনি তাঁহার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে সফলকাম হন। মাদ্রাসার পরিমণ্ডলে হাফেজ সাহেবকে কেউ শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন না। কিন্তু মাদ্রাসার বাইরে তাহার বেশ সুনাম এবং সম্মান ছিল। সহকারী সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহার বেতন ১০০ টাকা ধার্য করা হয়। সেক্রেটারী ডঃ থমস্ডোনের বেতন ছিল মাসিক ৩০০ টাকা। পরে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তাহার বেতন আরো ১০০ টাকা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।[২৫]

মাদ্রাসার দ্বিতীয় ভবন

১৭৮১ সালে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস যেখানে মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন সেখানে স্কটল্যাণ্ডের মহিলা মিশনের একটি ভবন ও একটি গির্জা ছিল। তাছাড়া বৌবাজার অঞ্চলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আলিয়া মাদ্রাসার জন্য অনুকূল ছিল না। বিশেষ করিয়া এই অঞ্চলে গোঁড়া হিন্দুদের বাসস্থান ছিল। হিন্দুপ্রধান এলাকায় মুসলমানদের

২৫. Education Progress report at. 5.10.1842

www.waytojannah.com

একমাত্র মাদ্রাসা কোনক্রমেই নিজের স্বকীয়তা রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না, এই জন্য মাদ্রাসা কমিটি মাদ্রাসা স্থানান্তরের ইচ্ছা করেন এবং এই মর্মে সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন যে, পারিপার্শ্বিকতার নিরিখে মাদ্রাসা ভবনের স্থানান্তর করা অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যত শীঘ্র সম্ভব মাদ্রাসাটি স্থানান্তর করা হউক। গভর্নর জেনারেল কমিটির এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন এবং মুসলমান অধ্যুষিত 'কলঙ্গা' এলাকার (বর্তমানের ওয়েলেসলী স্ট্রীট) সম্পূর্ণ সুসজ্জিত এবং সুরম্য ভবন নির্মাণের জন্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৫ শত ছত্রিশ টাকা দেন। কমিটি অনতিবিলম্বে এইজন্য একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া ফেলেন এবং ১৮২৪ সালের ১৫ই জুন অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে গভর্নর জেনারেল রাইট অনারেবল উইলিয়াম আমহার্স্ট অংশগ্রহণ করেন। তাহা ছাড়া রাজস্ব বোর্ডের সকল কর্মচারী ও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাসা কমিটির সদস্য চার্লস লুসিংটন তাঁহার লিখিত ইতিহাসে মন্তব্য করেন ঃ

আলিয়া মাদ্রাসার সেকালের ভবনটি সম্পূর্ণ পতিত পরিবেশের আবেষ্টনীতে ছিল। নৈতিকতার প্রশ্নে জায়গাটি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল (চারিদিকে বেশ্যালয় ছিল)। এইজন্য মাদ্রাসা স্থানান্তরের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাই সরকার একটি উপযুক্ত জায়গায় মাদ্রাসার জন্য সুরম্য ও প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মাণ অনুমোদন করেন। এই ভবনটির নক্শা হিন্দু কলেজের মত বিরাটাকার এবং সুন্দর করিয়া তৈয়ার করা হয়। সরকার এই ভবন নির্মাণের জন্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৫ শত ৩৬ টাকা মঞ্জুর করেন, এই টাকার একটা বিশেষ অংশ মাদ্রাসার পুরানো বাড়ির বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এখন মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য যে স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে, সেখানকার বেশির ভাগ বাসিন্দা মুসলমান। এই ভবনটি নির্মাণের সময় এমন ভাবেই প্রশস্ত এবং বিরাটাকারে তৈরি করা হইয়াছে যাহাতে মাদ্রাসার ভিতরে একটি স্কুলও চালু করা যাইতে পারে। কারণ, এই ধরনের একটি স্কুল পত্তনের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ রহিয়াছে।[২৬]

মাদ্রাসার শিলালিপি

মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তরে যে লিপি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে তাহা ইংরেজি, আরবী এবং উর্দুতে ছিল। নিম্নে শুধু ইংরেজি শিলালিপি হুবহু প্রদত্ত হইল ঃ

By the blessing of almighty God. In the reign of his most gracious Majeisty George the fourtn under the auspices of the Right Hon'ble william Pltt Amherst. Governor General of the British Possesstion in India.

২৬. চার্লস লুসিংটনকৃত 'স্থাপত্যের ইতিহাস' (১৮২৪ ইং) পৃঃ ১৪০

www.waytojannah.com

Contents

John Paesr Larkin Esqr, Provincial grand Master of Fraternity and free Masson in Bengal laid the foundation Stone of the idifice the Mohammadan College of Calcutta amidst the acclamation of a vast Concourse of native population of this city in the Presence of a numerous assembly of Fraternity and of the Presidents on the 15th day of July in the year of our Loard 1824 and of the era of Masonary 5824. Planned and Constructed by william Burn and J. Mackintosh and william Kemp.

মাদ্রাসার এই সুরম্য নূতন ভবনের নির্মাণকার্য ১৮২৭ সালে সম্পন্ন হয়। ভবনের চারিদিকেই সুপ্রশস্ত রাজপথ ছিল। মাদ্রাসা এবং রাজপথের মাঝখানে প্রায় ২০ হাতের ব্যবধান ছিল। চতুষ্কোণ বিশিষ্ট এই ভবনের মাঝখানে বিরাট আঙ্গিনা এবং বিরাট থামের উপর স্থাপিত বারান্দা ছিল। মাদ্রাসা ভবনের চারি কোণায় চারিটি সিঁড়ি ছিল। আঙ্গিনার মাঝখানে কাঠের তৈরি একটি ছোট এবং সৌন্দর্য মণ্ডিত বিশ্রামাগার তৈরি করা হইয়াছিল। এই বিশ্রামাগারে শিক্ষক এবং মাদ্রাসার পদস্থ ব্যক্তি ছাড়া কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। মাদ্রাসা ভবনে ছোট বড় মিলাইয়া প্রায় ষাটটি কামরা ছিল। মাদ্রাসা কর্মচারীদের আবাসিক বন্দোবস্তও মাদ্রাসার আবেষ্টনীর ভিতরে করা হইয়াছিল। সমগ্র এলাকার চারিদিকে মজবুত লৌহদণ্ড দ্বারা ঘেরাও করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাইরে সারি সারি গাছ লাগানো হইয়াছে। মোটকথা, স্থাপত্যের ইতিহাসে আলিয়া মাদ্রাসা একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮২৭ সালের আগস্ট মাসে এই নূতন ভবনে মাদ্রাসার ক্লাস চালু করা হয়।

লাইব্রেরীর পত্তন

আলিয়া মাদ্রাসার সংশোধনী পরিকল্পনাধীনে ১৮২০ সালে এক লাইব্রেরীর পত্তন করা হয়। ১৮১৯-২০ সালের সামগ্রিক খরচের টাকার উদ্বৃত্ত সাত হাজার টাকার উপর ভিত্তি করিয়া এই লাইব্রেরীর কাজ শুরু করা হয়। লাইব্রেরীর জন্য বার্ষিক ৪ শত ৮০ টাকার পুস্তকাদি খরিদ করার জন্য সরকার মঞ্জুর করেন এবং তাহা ১৯০৪ সাল অবধি অব্যাহত থাকে। অতঃপর ১৯০৫ সাল হইতে এই টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৬ শত টাকায় উন্নীত করা হয় এবং পরে ১৯০৭ সালে এই টাকার পরিমাণ ১ হাজার টাকায় উন্নীত হয়।

সংস্কৃত কলেজ

আলিয়া মাদ্রাসার নূতন ভবন নির্মাণের অব্যবহিত পরেই ফেব্রুয়ারি মাসে সরকার হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত কলেজ পত্তনের জন্য ১ লক্ষ বিশ হাজার টাকা প্রদান করেন

www.waytojannah.com

এবং আলিয়া মাদ্রাসার অনুরূপ এই কলেজের বার্ষিক খরচ নির্বাহের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন।

আলিয়া মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা

১৮২৬ সালে লর্ড উলিয়াম বেন্টিঙ্কের নির্দেশক্রমে মুসলমানদেরকে ইংরেজি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আলিয়া মাদ্রাসাতে একটি ইংরেজি ক্লাস খোলা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, আস্তে আস্তে ইংরেজিকে মাদ্রাসার শিক্ষা বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া হইবে। কেননা, ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারের বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং এই ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিশেষ সচেতন ছিলেন।

আলিয়া মাদ্রাসাতে প্রবর্তিত এই ইংরেজি শিক্ষা ১৮৫১ সাল অবধি চালু ছিল। এই দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরে সর্বমোট ১৭৮৭ জন ছাত্র এই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু বস্তুত পক্ষে এইখাতে বিশেষ অর্থ ব্যয় এবং অনেক চেষ্টার ফলে তেমন সন্তোষজনক ছিল না। মোটকথা, ইংরেজির প্রতি মুসলমানদের তেমন কোন আগ্রহ সৃষ্টি হয় নাই। এই সময় শুধু আবদুল লতিফ নামক একজন ছাত্র ইহাতে জুনিয়র স্কলারশিপ লাভ করে। পরে ইনি মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটির পত্তন করেন এবং নওয়াব আবদুল লতিফ সি আই এ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। অনুরূপভাবে হুগলি মোহসেনিয়া মাদ্রাসার ছাত্র আমীর আলীও (সৈয়দ) এই বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা ব্যর্থতার কারণ

আলিয়া মাদ্রাসায় ইংরেজি ক্লাসের ব্যর্থতার কারণ ছিল মূলত ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের অনাস্থা। তাহারা সব সময় সন্দেহ পোষণ করিত– এই ইংরেজি শিক্ষার নামে পাছে আবার মুসলমানদের নিজস্ব ধর্মীয় কৃষ্টি এবং কালচার না বিনষ্ট হইয়া যায়। ইংরেজি শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা ইংরেজির প্রতি তেমন আসক্ত ছিল না, পরন্তু একদল এই শিক্ষার ঘোর বিরোধিতা করিত। দ্বিতীয়ত মুসলমানরা সব সময়ই ইংরেজদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল। কেননা, ছলে বলে কৌশলে তাহারা মুসলমানদের রাজত্বের পতন ঘটাইয়াছে এবং তাহাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে। ইংরেজরা মুসলমানদের জায়গীর এবং সবরকম আমদানির পথ রোধ করিয়াছে। সম্ভ্রান্ত মুসলমানদেরকে নানাভাবে হয়রানি করিয়াছে। এমতাবস্থায় ইংরেজি ভাষা শিখিলে মুসলমানরা ইংরেজদের নিকট ছোট হইয়া যাইবে, এই ছিল ধারণা।

ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের এই সন্দেহ এবং মনোভাব মূলত সত্য ছিল। ইংরেজদের লিখিত ইতিহাসেই ইহার সত্যতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। পূর্বে যাহারা

www.waytojannah.com

ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করিয়াছিলেন, আজ দেড়শত বৎসর পর আমরা তাদেরকে গোঁড়া এবং রক্ষণশীল বলিয়া আখ্যায়িত করি এবং বলি আমাদের পূর্ব পুরুষরা যদি তখন একটু বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করিতেন তাহা হইলে আজ আমাদেরকে এত দুর্ভোগ পোহাইতে হইত না। আমরাও আজ তাহা হইলে হিন্দুদের মতো শিক্ষায় অগ্রসর থাকিতাম। কিন্তু যে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল ভারতীয়দের মানসিকতায় এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে যাহার ফলে তাহারা নিজেদের সকল ঐতিহ্য এবং কালচারকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিবে, সে শিক্ষা মুসলমানরা কেমন করিয়া গ্রহণ করিতে পারিত?

ইংরেজদের শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য

পাক-ভারতে ইংরেজ শাসনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। এই সম্পর্কে সর্ব প্রথম মিঃ চার্লস গ্রান্টের লিখিত নিবন্ধ পাওয়া যায়; ১৭৯২ হইতে ১৭৯৭ পর্যন্ত এই দীর্ঘসময় ধরিয়া তিনি উক্ত নিবন্ধ রচনা করেন। তিনি এই রচনায় ভারতীয়দের সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া তাহাদেরকে বর্বর, ডাকাত, চোর ইত্যাদি আখ্যাদান করেন। অতঃপর এই দেশের অর্ধবর্বর লোকদের মাঝে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের উপর প্রস্তাব পাস করেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

এই শিক্ষার দ্বারা বিশেষত হিন্দুরা বেশি উপকৃত হইবে। প্রথমত আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা দ্বারা তাহাদের মাঝে যাত্রা শুরু করিতে হইবে। ছোট ছোট বুকলেট এবং পুস্তিকায় এইসব সন্নিবেশিত আছে। সর্বাগ্রে তাহাদেরকে একত্ববাদের শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। মানব সভ্যতার সত্যিকার ইতিহাস এবং মাহাত্ম্য সম্পর্কে তাহাদেরকে অবহিত করিতে হইবে। তাহাদের পূর্বেকার সকল মতবাদ নস্যাৎ করিবার জন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহা যথার্থই মিথ্যা। অতঃপর তাহাদেরকে পবিত্র এবং উত্তম কর্তব্যাদির প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে ধাবিত করিতে হইবে। পাপ, পুণ্য, শাস্তি এবং পরকাল সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিতে হইবে। এই ধরনের শিক্ষা যেইখানে শুরু হইবে, স্বভাবতই সেইখানে মূর্তিপূজা, কাঠ এবং মাটির তৈরি প্রতিমার উপাসনা চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে।[২৭]

এইখানে মুসলমানদের সম্পর্কে কোন প্রকার মন্তব্য তখন ইচ্ছাকৃতভাবে এড়াইয়া গিয়াছেন। কেননা, লেখক তাহার লেখার অন্যস্থানে মুসলমানদের সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন, মুসলমানদের অহমিকা, সংকীর্ণমনা এবং ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রহিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কিত তাহার প্রস্তাবে প্রথমেই তিনি

২৭. History of English education in India by Sayed Mahmud, P-13

www.waytojannah.com

মুসলমানদেরকে জড়িত করা সমীচীন মনে করেন নাই। কেননা ইহাতে সমুদয় পরিকল্পনা নস্যাৎও হইয়া যাইতে পারে। মোটকথা, ইহাই ছিল পাক-ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের প্রথম প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনা।

মি. গ্রান্টের এই পরিকল্পনা ১৭৯৩ সালে পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। এই পরিকল্পনানুযায়ী সরকারী শিক্ষা ইশতেহারে এতদসংক্রান্ত আরো দুইটি ধারা সংযোজন করা হয় ঃ

১. বৃটিশ শাসিত ভারতের লোকদের উন্নতি এবং সমৃদ্ধির জন্য সব রকম সম্ভাব্য প্রয়াস চালাইয়া যাইতে হইবে। এইজন্য এমন সব পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে ক্রমান্বয়ে ভারতীয়রা উপযুক্ত সুযোগ পায় এবং উহা তাহাদের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতির সহায়ক হইবে।

২. ভারতে প্রোটেস্টাইন ধর্মভিত্তিক মতবাদ অনুযায়ী উপাসনা এবং শিক্ষার পথ সুগম করিতে হইবে এবং এজন্য সময়ান্তরে শিক্ষক প্রেরণ করিতে হইবে।[২৮]

কিন্তু বিলাতের পার্লামেন্টের দূরদর্শী সদস্যরা শিক্ষা সম্পর্কিত ধারার এই মর্মে বিরোধিতা করেন যে, ইহাতে আইনগতভাবে কতগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। বিশেষ করিয়া, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরবৃন্দ (পার্লামেন্ট সদস্যও) ইহার তীব্র বিরোধিতা করেন। শিক্ষা নীতি সম্পর্কে মতবিরোধ করিয়া তাহারা যে কারণ দর্শাইয়াছেন নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বিশেষ উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

(১) এই পরিকল্পনা খুবই বিপজ্জনক এবং রাজনীতির পরিপন্থী। ইহাতে দেশের শান্তি বিঘ্নিত হইতে পারে এবং সম্ভবত ইহাতে রাজত্বের ভিত্তিমূল নড়িয়া উঠিবে। ইহাতে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সমূহ ক্ষতি হইবে। এই শিক্ষা-নীতি দেশে বিপ্লবের সূত্রপাত করিবে এবং আমাদের ধর্মের অবমাননা ডাকিয়া আনিবে। এই দেশের লোকদেরকে ধর্মান্তরের প্রতি আকৃষ্ট করার পর হইতেই বৃটিশকে এই দেশ হইতে পাততাড়ি গুটাইতে হইবে।

(২) একটি ধর্ম যখন প্রবর্তিত হয়, লোকদের উদ্দেশ্য তখন সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া যায়। ভিন্ন ধর্মী লোকদের নিজেদের ধর্মে আকৃষ্ট করার এই প্রয়াস অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ শান্তি বিরোধী। কিছু সংখ্যক লোক যদি এই অভিযানে সংক্রমিত হয় এবং কয়েক লক্ষ লোক খৃস্টান হইয়া যায় তাহাতে এমন বেশি কিছু লাভ হইবে না, বরং ইহাতে চরম সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। মার্কিন সাম্রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কলেজ পত্তনের দরুন আমরা সেই দেশ হাতছাড়া করিয়াছি। অনুরূপভাবে এইদেশেও যুবক পাদ্রী সম্প্রদায়রা যখন জনসাধারণের মাঝে ঢুকিয়া

২৮. Education In India under E.I. Company by Basu-P.-204

www.waytojannah.com

পড়িবে কোম্পানীর ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইবে। কোন ভারতীয় ছাত্র যদি সত্যি পাশ্চাত্য শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়, বিলাতে আসিয়াই দিব্যি লেখাপড়া করিতে পারিবে।[২৯]

তীব্র বিরোধিতার মাঝে পার্লামেন্ট এই শিক্ষানীতি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু মিঃ গ্রান্ট এই ব্যাপারে নিরুৎসাহ হইলেন না। মিঃ গ্রান্ট শুধু একজন খৃষ্টানই ছিলেন না। মতবাদ এবং ধর্মীয় প্রেরণায় তিনি একজন পাদ্রীর মতো ধর্মযাজক ছিলেন। পার্লামেন্টের এই বিরোধিতার মাঝে তিনি আরো আশার আলো খুঁজিয়া পাইলেন এবং এই ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি কোম্পানীর একজন অন্যতম ডিরেক্টর নির্বাচিত হইবার জন্য প্রচেষ্টা চালান। অবশেষে মিঃ গ্রান্টের ইচ্ছা পূরণ হইল এবং ১৭৯৪ সালে তিনি কোম্পানীর ডিরেক্টর এবং ১৮০২ সালে বিলাতের পার্লামেন্টের সদস্য পদ লাভেও সমর্থ হন। এইবারে তিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি ইণ্ডিয়া হাউজ এবং পার্লামেন্টের উভয় পরিষদেই নিজের ইচ্ছার প্রচারণা চালাইলেন। বলিতে লাগিলেন, আমাদের ধর্মযাজক এবং পাদ্রীদেরকে ভারতে যাইয়া অর্ধ বর্বর ভারতীয়দেরকে সুসভ্য হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য পার্লামেন্টের অনুমতি দেওয়া উচিত। তিনি এই প্রচারণার জন্য একখানি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তিনি ভারতীয়দের নীচ জীবন সম্পর্কিত মর্মান্তিকচিত্র তুলিয়া ধরিতেন এবং বলিতেন, এই অসভ্য বর্বরের দেশে শীঘ্রই আমাদের শিক্ষাবিদ এবং পাদ্রীদের রওনা হওয়া উচিত। বৃটিশ নাগরিকদের ভাবাবেগ উত্তেজিত করিবার জন্য এই পত্রিকায় বলা হইত আমাদের অধিকৃত রাজ্যসমূহে এমন সব অসভ্য ও অশিক্ষিত লোক আছে যাহাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। ইহাতে আমাদের ধর্মীয় উৎকর্ষ যেমন বৃদ্ধি পাইবে তেমনি আমাদের রাজনীতির অঙ্গনও সম্প্রসারিত হইবে। আমরা যদি আমাদের ভাষা, ধর্ম, শিক্ষা এবং মতবাদ এশীয় রাজ্যসমূহে প্রবর্তিত করিতে পারি তখনই হইবে আমাদের সত্যিকার বিজয়।

মোটকথা, এইভাবে আট-দশ বৎসরের প্রচারণায় তিনি লোকদেরকে তাহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হন।

শিক্ষানীতি সমর্থিত

পরিবেশ সম্পূর্ণ অনুকূলে আসার পর মিঃ গ্রান্ট তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উক্ত বিল পার্লামেন্টে পেশ করে এবং পার্লামেন্টে উক্ত বিলে নিম্নোক্ত বাড়তি ধারাটুকু সংযোজন করিয়া সংশোধনী শিক্ষা বিল পাস করে।

"ভারতীয়দের উৎকৃষ্ট শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সব রকম উপকরণ ও উপাদানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহাদের চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং ধর্মীয় উন্নতির

২৯. Education in India uder E.I. Company by Basu. P-204

www.waytojannah.com

জন্য যাহারা এই ব্যাপারে পথপ্রদর্শন করিবার জন্য ভারতে অবস্থান করিতে চায় তাহাদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।"

বাহ্যত এই বিলে ভারতীয়দের শিক্ষা এবং চারিত্রিক উন্নতির জন্য বৃটিশ সরকারের অপেক্ষাকৃত দরদ পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আসলে এই বিলে নিহিত আসল যে উদ্দেশ্যাবলী রহিয়াছে তাহা মূলত এই দেশী লোকদেরকে খৃস্টান বানাইবার একটি বৃহৎ পরিকল্পনার নামান্তর। এইদেশী লোকদের শিক্ষা দিবার জন্য যাহারা ভারতে আসিয়া অবস্থান করিবে (তাহাদের জন্য বিশেষ সরকারী সুযোগ-সুবিধা থাকিবে) তাহারা খৃস্টানদের পাদ্রীকুল। কেননা, সেকালে খোদ বৃটেনেও শিক্ষার মূলভিত্তি ছিল ধর্মপ্রসূত। জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিকের বর্ণনা হইতে ইহা আরো সুস্পষ্ট হয় ঃ

"সেকালে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা ছিল নামেমাত্র এবং তাও ধর্মীয় লোকেরা শিক্ষা দিতেন যাহা সর্বতোভাবে ধর্ম সংক্রান্ত ছিল। যাহারা তখন শিক্ষালাভ করিত তাহাদের উদ্দেশ্যও ছিল ধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করা।"[৩০]

১৮১৩ সালে এই শিক্ষা-নীতি যখন পাস হইয়া যায় তখন ইংল্যান্ডের শিক্ষা ছিল চার্চকেন্দ্রিক, অতএব উৎকৃষ্ট শিক্ষার অর্থ খৃস্ট ধর্মের 'প্রপাগান্ডা' এবং 'যাহারা ভারতে থাকিতে চায়' তাহাদের অর্থ পাদ্রী সম্প্রদায়। অথচ উক্ত বিলের ভাষা এতই প্রচ্ছন্ন যে, স্বাভাবিক দৃষ্টিতে কাহারো এই গূঢ় রহস্য উদ্ধার করার উপায় ছিল না।

অতঃপর এই শিক্ষানীতির পরিপেক্ষিতে কোম্পানীকে নির্দেশ দেওয়া হইল যে, ভারতীয়দের শিক্ষাখাতে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা খরচ করিতে হইবে। কিন্তু ভারত সরকারের অনবধান বশত ১৮২৩ সাল অবধিও এই টাকা খরচ হইল না। কিন্তু এই নূতন এ্যাক্ট্ পাদ্রীদের জন্য ভারতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল এবং তাহারা ভারতে আসিয়া নানাস্থানে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ছোট ছোট স্কুল খুলিয়া বসিলেন।

এ্যাংলোইণ্ডিয়ান কলেজের গোড়াপত্তন

এই সময় কলিকাতার একজন নামজাদা জমিদার রাজা রাম মোহন রায়ের সহিত ডেভিড হেয়ার নামক একজন ঘড়ি নির্মাতার বন্ধুত্ব জন্মে। রাজা রাম মোহন হিন্দু ছিলেন কিন্তু পৌত্তলিকতা পছন্দ করিতেন না। তিনি ইসলাম এবং খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে দেদার পড়াশুনা করিয়াছেন। ডেভিডের সংস্পর্শে তিনি খৃস্টধর্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং খৃস্টানদের সহিত তাহাদের গির্জাতে গিয়া উপাসনায় অংশগ্রহণ করিতেন। ইহার কিছুকাল পর তিনি 'ব্রাহ্ম সমাজ' নামক একটি সম্প্রদায়ের পত্তন করেন। ডেভিড লেখাপড়া জানিত না। কিন্তু খুবই বুদ্ধিমান ছিল। ডেভিডের পরামর্শক্রমে রাজা রাম

৩০. English National Education by H. Hole P-12

www.waytojannah.com

মোহন রায় কলিকাতায় 'এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ' নামক একটি পাবলিক কলেজের পত্তন করেন। এই কলেজ পত্তনের জন্য রাজা রাম মোহন রায়ের সমকক্ষ অন্যান্য জমিদারের নিকট হইতে ১১ লক্ষ ৩ হাজার ১ শত ৭৯ টাকা চাঁদা আদায় করেন। ইংরেজি শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত কলিকাতায় ইহাই সর্বপ্রথম কলেজ। অতঃপর ১৮১৮ সালে কেরী নামক জনৈক পাদ্রী বেনারসে জয়নারায়ণ কলেজ নামক অপর একটি কলেজের পত্তন করেন। ইহার পর এই ধরনের কলেজ তৈরির রীতিমত হিড়িক পড়িয়া যায়। ১৮২১ সালে পুনার হিন্দুকলেজ ও ১৮২৩ সালে আগ্রা কলেজের পত্তন হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই ১৮২৬ সালে গভর্নর জেনারেলের আদেশক্রমে কলিকাতার আলিয়া মাদ্রাসা এবং হিন্দু কলেজেও ইংরেজি ক্লাসের প্রবর্তন করা হয়।

মিঃ গ্রান্টের স্বপ্ন সফল

এই দেশের ধর্মীয় স্বরূপ বিকৃত করিয়া খৃস্ট ধর্ম প্রবর্তন করার জন্য মিঃ গ্রান্ট যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা কতটুকু বাস্তবে রূপ লাভ করিয়াছে তাহা ১৮৩১ সালে প্রকাশিত শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট হইতেই প্রতীয়মান হয়।

"হিন্দু কলেজের (রাজা রাম মোহন রায়ের কলেজকে হিন্দু কলেজও বলা হইত) সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের প্রতি এই কমিটির বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইহার ফলশ্রুতি যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ আশাতীত। ইংরেজি ভাষা রপ্ত করার পাশাপাশি নৈতিক উন্নতিও যথেষ্ট সাধিত হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছাত্ররা এবং যথার্থ যোগ্য হিন্দু ছাত্ররা নিজেদের তথাকথিত ধর্মের আবেষ্টনী হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা প্রকাশ্যভাবে নিজেদের ধর্মের অসারতা সম্পর্কে মন্তব্য করিতেও দ্বিধা করে না। সম্ভবত পরবর্তী বংশধরদের মাঝে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদেরই আরো উৎকর্ষ ও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইবে।"[৩১]

এখানেও ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানদের কোন উল্লেখ করা হয় নাই। আসলে তাহাদের অভিযান উভয় জাতির বিরুদ্ধেই ছিল। কিন্তু হিন্দুরা নিজেদের মতবাদ এবং ধর্মবিশ্বাসে তেমন অটল ছিল না বলিয়া ইংরেজদের মিশন তাহাদের মাঝে বেশি কার্যকরী হয় এবং প্রকাশ্যে বলিবার মতো হিন্দুদের সম্পর্কেই তাহাদের কিছু বক্তব্য ছিল। পক্ষান্তরে, মুসলমান তাহাদের মতবাদ এবং ধর্মবিশ্বাসের বেলায় সম্পূর্ণ আপোসহীন ছিল। এই জন্য মুসলমানদের ব্যাপারে তাহারা অত্যন্ত হুঁশিয়ার এবং সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল। মি. গ্রান্টের এই মিশন তথা ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের কি অভিসন্ধি ছিল স্যার চার্লস ট্রেভল্যান নামক জনৈক ইংরেজ

৩১. History of English education by Syed Mohammad P-35

www.waytojannah.com

অফিসারের প্রদত্ত বিবরণে তাহা আরো সুস্পষ্ট হয়। ১৮৫৩ সালে পার্লামেন্টের সাব-কমিটিতে প্রদত্ত এই বিবরণের অংশ বিশেষ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

"দেশের বর্তমান প্রচলন এবং রেওয়াজ অনুযায়ী মুসলমানরা আমাদেরকে অভিশপ্ত কাফের এবং বিধর্মীদের দলভুক্ত মনে করে যাহারা বলপূর্বক একটি সমৃদ্ধিশালী ইসলামী সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে এবং প্রচলিত ধর্মীয় বৈষম্য অনুযায়ী হিন্দুরাও আমাদেরকে ম্লেচ্ছ বলিয়া আখ্যায়িত করে। অর্থাৎ ইহাদের সাথে কোনরকম সম্পর্ক রাখা অসমীচীন। এই উভয় জাতিই মনে করে আমরা বলপূর্বক তাহাদের সাম্রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছি। তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমরা হরণ করিয়াছি। এমতাবস্থায় ইহাদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের অর্থ দাঁড়াইবে তাহাদের মানসিকতা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া দেওয়া। যেই সব নবীন যুবক আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, পূর্বেকার ধারা অনুযায়ী তাহারা প্রচলিত নিয়মে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার কথা ভুলিয়া যাইবে। অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে তাহারা তখন দেশের সকল পর্যায়কে পাশ্চাত্য রঙ্গে রঙ্গীন করিবার জন্য প্রচেষ্টা চালাইবে।

এই শিক্ষার প্রসার হইলে ক্রমান্বয়ে তাহারা আমাদেরকে জবরদস্তি শাসনকারী হিসাবে আর মনে করিবে না। বরং তাহারা আমাদেরকে বন্ধু হিসাবে জ্ঞান করিবে এবং আমাদেরকে পৃষ্ঠপোষক হিসাবে জ্ঞান করিবে। মনে করিবে ইহাদের হেফাজতে থাকিয়া আগামীতে নিজেদের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালাইয়া যাইতে পারিব। এই ভূখণ্ডের পুরানো ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি সম্ভবত এমনও হইতে পারে যে, আমরা একদিনেই এই উপমহাদেশ হইতে পাততাড়ি গুটাইতে বাধ্য হইব। যাহারা আকস্মিকভাবে বিপ্লব ঘটাইয়া দেশ স্বাধীন করিবার স্বপ্ন দেখে তাহারা অতি গোপনে কার্যক্রম চালাইয়া যাইতেছে এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। কিন্তু নতুন এবং উন্নত পদ্ধতিতে এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে খুবই মন্থর গতিতে এই অভিযান অগ্রসর হইবে এবং স্বভাবতই তাহাতে যুগ-যুগান্তর লাগিয়া যাইবে।

ইহাদের সমন্বয়ে বর্তমানে একটি ছোট দলের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া চলে। ইহারা দেশের স্বাধীনতার পুনরুত্থানের জন্য আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিবে। এজন্য আগামীতে তাহাদেরকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। ক্রমশ তাহাদের দল যাহাতে ভারী হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন কখন হইবে? কেউ বলিতে পারে না। আর আমরাও একথা বলিতে পারি না যে, সরকারের সমস্ত দায়িত্ব স্থানীয় লোকদের হাতে সোপর্দ করিয়া আরো কতকাল এই দেশের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিতে হইবে। এ ব্যাপারে আমরা যদি সঠিক পথ অনুসরণ করি সম্ভবত এই দেশের সহিতও আমাদের সম্পর্ক তেমন উন্নত থাকিবে, যেমন কানাডা ও

www.waytojannah.com

Contents

অস্ট্রেলিয়ার সহিত রহিয়াছে। সাময়িকভাবে যদি আমরা একথা মানিয়াও লই যে, এই দেশের সহিত সম্পর্কচ্যুতির রূপটা এদেশের পুরনো নিয়মেই হইবে, তাহা হইলেও তাহা হইবে সম্পূর্ণ আকস্মিক ও ভয়ানক দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির মাধ্যমে এবং এই সম্পর্কচ্যুতি অসহযোগিতার মাধ্যমে সম্পন্ন হইবে। আমরা তখন এমন একটি দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইব যে দেশের মানসিকতা খুবই নীচ এবং আমাদের স্বার্থের প্রতিকূলে তাহারা সবচেয়ে চরম শত্রু প্রতিপন্ন হইবে। পক্ষান্তরে আমরা যদি সম্পর্ক উন্নয়নের পন্থা অন্যভাবে গ্রহণ করি তাহা হইলে আমরা একটি সুসভ্য দেশকে ছাড়িয়া যাইব এবং আমাদের প্রতি তাহারা কৃতজ্ঞ থাকিব।[৩২]

অনুরূপভাবে ১৮৩৫ সালের ২৮শে জুন স্যার লার্লস ট্রি ভলেন দ্বিতীয় বারের মতো এই মর্মে বিশেষ কমিটির নিকট আরো একটি বিবরণ পেশ করেন। নিম্নে উক্ত রিপোর্টের চমকপ্রদ অংশবিশেষ প্রদত্ত হইল ঃ

"যদিও ধর্মীয় নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সরকারী কলেজসমূহের পাঠ্য তালিকায় বাইবেলের অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু খৃস্ট ধর্মের প্রচারের প্রশ্নে এক্ষেত্রে একটি অহেতুক বাধার সূত্রপাত করা হইয়াছে বলিয়া আমরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মতে এই অভিযোগ অমূলক এবং সম্পূর্ণ অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। কেননা, বিভিন্ন কলেজের জন্য ইংরেজি বইয়ের লাইব্রেরীর পত্তন করা হয়, প্রত্যেক লাইব্রেরীতে বাইবেলের কপি রাখা হইয়াছে। এখন তো আমি এখবরও শুনিয়াছি যে, লোকেরা বাইবেলের ব্যাখ্যা পুস্তকও অনুসন্ধান করিতেছে। এখন লাইব্রেরীতে ইহার ব্যাখ্যা পুস্তকও রাখিতে হইবে। সেই সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের ভাল গ্রন্থাবলীও রাখা উচিত।

আমি যেমন পূর্বে বলিয়াছি, বাইবেল যদিও পাঠ্য হিসাবে পড়ানো সম্ভব নয়, কিন্তু সরকারী কলেজসমূহে ইংরেজি সাহিত্য তো পড়ানো হয়। যথা মিল্টন, বেকন, এডিসন ও জনসন প্রমুখের কাব্য ইত্যাদি। এদের সকল পুস্তকেই বাইবেলের শিক্ষার সমাহার রহিয়াছে এবং এসব ছাত্রদেরকে বুঝাইতে হইলে বার বার বাইবেলের উদ্ধৃতি এবং বাইবেলের শিক্ষা সম্পর্কে পর্যালোচনা করিতে হইবে। এই ভাবে ছাত্র এবং শিক্ষকদের মাঝে সাহিত্য পর্যায়ে বাইবেলের চর্চা প্রচলিত হইবে। ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা দেখিয়াই বুঝা যাইবে খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে তাহাদের জানাশোনা কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচিত ছাত্রদেরকে দেশের সত্যিকার ইতিহাস, সত্যিকার দর্শন এবং বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া। যাহারা সরকারী শিক্ষার বিরোধিতা করেন তাহারা কি বলিতে পারেন যে, সত্যিকার ইতিহাস, আসল দর্শন এবং বিজ্ঞান শিক্ষা

৩২ History of Muslim education by Syed Mahmud P-65

www.waytojannah.com

ধর্মের জন্য ক্ষতিকর ? যাহারা ক্ষতিকর মনে করেন তাহারা খুবই ভুল করিতেছেন।"[৩৩]

এখন দেখুন, মুসলমানদের জন্য কতখানি বিপজ্জনক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই চক্রান্ত হইতে কোন মুসলমানই অব্যাহতি পাইতে পারে না।

চার্লস ট্রিভ়লেন পুনরায় বলেন ঃ

আমার মতে যেসব স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত রহিয়াছে, সেগুলিতে প্রচুর আর্থিক সাহায্য করা উচিত। আমার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, এমন দিন কোন সময়ই আসিবে না যখন সরকারী কলেজসমূহেও খৃস্ট ধর্ম শিক্ষা চালু করা যাইবে। আমার মতে এমন উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে যেদিকে লোকেরা সহজেই আকৃষ্ট। ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, খৃস্ট ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষা ছাড়া কোন শিক্ষাই পরিপক্ব এবং সু-সম্পন্ন নয়। ভারতের একটি অংশ যখন সুশিক্ষিত হইবে তখন আমাদের উচিত হইবে খৃস্ট ধর্মের শিক্ষা চালু করা। কিন্তু আমাদেরকে এ ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। যাহাতে সৈন্যবাহিনীর মাঝে কোনরকম অসন্তোষ না জাগে। কলিকাতা হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্বে আমি খৃস্টধর্ম গ্রহণকারী এদেশীয় উচ্চ শিক্ষিত এবং বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি তালিকা তৈরি করিয়াছিলাম। এই সব ব্যক্তি হিন্দু কলেজে পড়াশুনা করিত। খৃস্টধর্ম প্রচারের মূলে ইহাদের প্রচুর সাধনা এবং সহযোগিতা রহিয়াছে। ইহাদিগকে কিভাবে খৃস্টান করিতে হইবে, লোকরা তাহার কোন ফন্দিই জানে না। আমার তো বিশ্বাস, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যেমন সকলেই গোত্রবন্দী হইয়া খৃস্টান হইয়াছেন, এখানকার লোকেরাও দলে দলে খৃস্টান হইতে বাধ্য। এই দেশে পরোক্ষভাবে পাদ্রীদের দ্বারা এবং প্রত্যক্ষভাবে বই-পুস্তক পত্র-পত্রিকা এবং ইংরেজদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মেলামেশার দ্বারা খৃস্টধর্ম প্রবর্তিত হইতে পারে।[৩৪]

এই বিশিষ্ট ইংরেজ নাগরিক দেশের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য এবং গভর্নরও ছিলেন। তাহার উপরোক্ত মতামতে ধর্মীয় নিরপেক্ষতার জিগির সুস্পষ্ট। কিন্তু অন্যদিকে এই ব্যক্তি খৃস্টধর্ম প্রচারের ব্যাপারে কতখানি আশাবাদী, তাহার বর্ণনা হইতেই অনুমান করা যায় যে, স্কুল-কলেজের ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কি? তাহাদের ধর্ম নিরপেক্ষতার আসল উদ্দেশ্য হইল স্কুল-কলেজে হিন্দু ধর্ম বা ইসলাম ধর্মের কোন শিক্ষা দেওয়া চলিবে না বরং সেস্থলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খৃস্টধর্মের অনুশীলন চলিবে। এই প্রয়াস ধর্ম নিরপেক্ষ নয় এই কথাও বলা যায় না। এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন শিক্ষা নীতিতে ধর্ম শিক্ষার ব্যাপার উহ্য রহিয়াছে।

৩৩. History of English education by Syed Mahmud P-67
৩৪. History of English education in India Syed Mahmud P-69

www.waytojannah.com

ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিবে। দ্বিতীয়ত পুরনো রীতির শিক্ষায়তনগুলির দ্বার বন্ধ করিয়া দিবে এবং এই শিক্ষা নীতির দোষক্রটি বাহির করিতে শুরু করিবে, ফলে জনসাধারণ এই শিক্ষার বিরোধিতা করিতে শুরু করিবে। কেননা জনসাধারণ যখন দেখিবে এই শিক্ষায় কোন বাস্তব লাভ নাই তখন স্বাভাবিকভাবেই ইহার প্রতি তাহারা অনীহা প্রদর্শন করিবে। ইহার পরও যেসব ধর্মে উৎসর্গপ্রাণ ব্যক্তিরা ইহার স্বপক্ষে সংগ্রাম করিবে তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য এই শিক্ষার দোষক্রটি প্রমাণ করিবার জন্য তাহাদের নিজস্ব (স্থানীয়) ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে। ইহার পর যুবক শিক্ষানবীশরা নিজেদের ধর্মের প্রতি আরো বীতশ্রদ্ধ হইবে এবং জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে খৃস্ট ধর্মের জালে আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে।

তাহাদের এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের সাফল্য সম্পূর্ণ সন্তোষজনক, এবং তাহা চতুর্দিকে ডালপালা বিস্তার করিতেছে, তাহাদের পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে, পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সংস্কার। এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি সর্বাগ্রে আলিয়া মাদ্রাসার উপর পড়িল।

মাদ্রাসা সংস্কারের আসল উদ্দেশ্য

আলিয়া মাদ্রাসার সংস্কারের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই প্রাচীনতম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন করিয়া ইহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করা। আলিয়া মাদ্রাসার অস্তিত্ব সরকারের কোন উপকারে আসে না। এই জন্য এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করা সরকারের দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব এই প্রতিষ্ঠানে পঠিত মুসলমানদের প্রয়োজনীয় বিশেষ বিষয়গুলির প্রাধান্য কমাইয়া দেওয়া হইলে এই প্রতিষ্ঠান বৈশিষ্ট্যহীন হইয়া পড়িবে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ড. ডব্লু ডব্লু হান্টার এই সম্পর্কে সরকারকে যে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

"... ... ... কিন্তু ইহাও বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না যদি মাদ্রাসার শিক্ষা বিষয় হইতে ফেকা শাস্ত্র সম্পূর্ণ তুলিয়া দেওয়া হয়। কেননা ইহাতে বর্তমান বংশধরদের নিকট এই কলেজের (মাদ্রাসা) কোন গুরুত্ব থাকিবে না। অতঃপর একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই ইসলামী বিষয়টি শিক্ষা দিবার আসল উদ্দেশ্য হইল 'কাজী' উৎপাদন করা। অতএব ইহা উঠিয়া গেলে এই শিক্ষারই আর কোন প্রয়োজন থাকিবে না আর ছাত্ররাও ইহাতে লাভবান হইবে না। ইহার উপযুক্ত শিক্ষা আলাদা আলাদা বক্তৃতার মাধ্যমে দেওয়া যাইতে পারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন হিন্দু আইন শিক্ষা দেওয়া হয় কার্যত প্রতিনিয়ত ফেকার পাঠ্য না রাখিয়া সেস্থলে আরবী, ফার্সী ও বিভিন্ন সাহিত্য পড়ানো যাইতে পারে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্পর্কিত পড়াশুনাও উর্দু ভাষার মাধ্যমে চালু করা যাইতে পারে।

www.waytojannah.com

এইভাবে মুসলমান এমন একটি উন্নতিশীল নবীন জাতিতে পরিণত হইবে যে, তখন সীমিত পরিমণ্ডলে তাহাদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকিবে না। তখন তাহারা শুধু তাহাদের শিক্ষার নীতিমালাই পাঠ করিবে না বরং ইহার মধ্যে নিহিত গভীরতর সত্যকে পাশ্চাত্য আলোকে পরখ করিবে। এই সঙ্গে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষাও লাভ করিবে যা দ্বারা নিজেদের মধ্যে সসম্মানে দাঁড়াইতে পারে। তাহাদের ইংরেজি শিক্ষার প্রবণতা তাহাদিগকে লাভজনক পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিবে।[৩৫]

ইংরেজি শিক্ষা এবং আলেমদের বিরোধিতা

যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধিতা করিতেছিলেন তাহাদের মধ্যে আলেম সম্প্রদায় ছিলেন সর্বাগ্রে এবং এজন্যই আজ ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী হিসাবে একমাত্র তাহাদিগকেই চিহ্নিত করা হয়। অথচ ইহার সত্যিকার তাৎপর্য কেহ বিচার করিয়া দেখিবে না। পূর্বে বর্ণিত রিপোর্ট এবং মতামত ইত্যাদি হইতে এ কথাতো সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রাচ্য মানসিকতায় পাশ্চাত্য শিক্ষা চাপাইয়া দেওয়ার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার জটাজালে আবদ্ধ হইয়া মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলধন বিনষ্ট হইবার যে আশংকা রহিয়াছে তাহা রোধ করিবার জন্য আলেম সম্প্রদায় আগাইয়া আসিবেই। কালে কালে তাহারা ধর্মের ঐতিহ্য রক্ষা করিবার জন্য এধারা চেষ্টা করিয়াছে এবং চিরকাল করিয়া যাইবে, জাতি সে কথায় কর্ণপাত করুক বা না করুক।

হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষাকে স্বাগত জানায়

হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষাকে অমৃত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা প্রথমেই সরকারী অফিস-আদালতে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। কেননা, ইংরেজরা হিন্দুদের আনুগত্যের উপর পুরাপুরি আস্থাশীল ছিল। মুসলমানদেরকে তাহারা আহত সিংহ মনে করিত এবং কোনক্রমেই তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিত না। এজন্য প্রথম হইতে যেখানে হিন্দুদের দ্বারা কাজ চলিয়া যাইত, পারতপক্ষে সেখানে মুসলমান নিয়োগ করিত না। কিন্তু বিরাট দায়িত্বপূর্ণ বা সাহসিকতার কাজে হিন্দুদেরকে পাওয়া যাইত না, সেখানে মুসলমানদের ডাক পড়িত। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অনীহা এবং বিরোধিতা হিন্দুদের অগ্রসরের পথ আরো সুগম করিয়া দিল। ফলে, সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় হিন্দুরা মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশি অগ্রসর হইয়া গেল। আর সরকারেরও এই ইচ্ছা ছিল যে, যেভাবে হউক হিন্দুরা যেন মুসলমানদেরকে এই ব্যাপারে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে।

---

৩৫. Our Indian Musalman, Hunter P-204

www.waytojannah.com

ইংরেজি শিক্ষার আরো সম্প্রসারণ

ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন এবং সম্প্রসারণের জন্য ১৮২৯ সালে শিক্ষা কাউন্সিল গভর্নর জেনারেলকে জানান যে, যতদিন ইংরেজিকে দফতরের ভাষা না করা হইবে, লোকেরা এই ব্যাপারে যথার্থ আকৃষ্ট হইবে না। ইহার উত্তরে বঙ্গ দেশের সরকারের ফারসী বিভাগের সেক্রেটারী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইশতেহার (২৬ শে জুন ১৮২৯ সাল) প্রকাশ করেন। নিম্নে তাহার অংশ বিশেষ প্রদত্ত হইল ঃ

"বর্তমানে একটি প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ইংরেজি শিক্ষার্থীদেরকে আরো প্রেরণা এবং উদ্দীপনা যোগাইবার জন্য কি করা উচিত ? এজন্য পাঠ্য পুস্তক, শিক্ষক এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত কিভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে ? আপনাদের কমিটি এই কথা জানাইয়াছে যে, যতদিন ইংরেজিকে সরকারী অফিস-আদালতের ভাষার মর্যাদায় উন্নীত না করা হইবে জনগণের মধ্যে ইহার যথার্থ জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হইবে না। আপনাদের এই রিপোর্টের সহিত প্রদত্ত (চলতি মাসের ৩ তারিখে) মিঃ ম্যাকেঞ্জির নোটেও বলা হইয়াছে যে, এখন আর বিলম্ব না করিয়া ঘোষণা করা উচিত যে, এখন হইতে সরকারী অফিসের কাজকর্ম ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হইবে। যদি ইহা না করা হয় তাহলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, আমরা আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মর্যাদা করি নাই। এব্যাপারে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, আগামী তিন বৎসর পর সরকারী দফতরগুলিতে ইংরেজিতে কাজকর্ম শুরু হইবে, ইহাও যেন ঘোষণায় বলা হয়। দিল্লীর শিক্ষা কাউন্সিলও একথার উপর জোর দিয়াছেন, আমরা অচিরেই ইহা ঘোষণা করিব। ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে আপনাদের এহেন প্রস্তাব এবং পরামর্শে গভর্নর জেনারেল খুবই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, আমাদের শিক্ষা এবং সভ্যতার যথার্থ বিকাশের জন্য আপনাদের এই প্রস্তাবনা এবং ব্যাখ্যা তিনি যথেষ্ট সংবেদনশীল মন নিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এ ব্যাপারে আপনাদের কমিটির উপর সমুদয় দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হইতেছে। আপনারা অচিরেই স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জানাইয়া দেন যে, বৃটিশ সরকারের বর্তমান অভিপ্রায় এবং নীতি হইল দেশের সকল সরকারী অফিস-আদালতে তাহাদের ভাষা চালু করিবেন এবং ক্রমশ এই ভাষা যাহাতে সার্বজনীন ভাষায় রূপান্তরিত হয় সেই ব্যাপারে সদা সচেষ্ট রহিয়াছেন। তবে কতদিনে এই ভাষা যথার্থভাবে অফিস-আদালতে চালু করা হইবে তাহার কোন সুনির্দিষ্ট সময়ের সিদ্ধান্ত নিতে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল প্রস্তুত নহেন।"[৩৬]

৩৬. History of English Education by Syed Mahmud P-78

www.waytojannah.com

পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম নিয়া মতবিরোধ

এই সময় পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে এই শিক্ষার হিতাকাঙ্ক্ষীদের মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ইহাতো সবার কাছেই স্বীকৃত যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য কর্তব্য, কিন্তু এই শিক্ষার মাধ্যম কি হইবে (Medium of Instruction) ইহা নিয়া জল্পনা-কল্পনার শেষ ছিল না। একদল মত প্রকাশ করিলেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম শুধু ইংরেজিই থাকিবে। অন্যদল ইহার বিরোধিতা করিয়া বলিলেন যে, এই দেশীয় লোকদের মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করিলেই তাহারা সম্যকভাবে তাহা আয়ত্ত করিতে পারিবে। উভয় দলই নিজেদের মতামতের স্বপক্ষে নানাবিধ যুক্তি প্রমাণ পেশ করেন, উভয় দলই নিজেদের যুক্তির মাধ্যমে সরকারকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন। এসময় বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্-এর পক্ষ হইতে গভর্নর জেনারেলের নামে ১৮৩০ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বরে একখানি চিঠি প্রেরিত হয়। উহাতে বলা হয় যে, ইংরেজি শিক্ষার প্রসারই বৃটিশ সরকারের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু এব্যাপারে যেন তেমন তাড়াহুড়া না করা হয়, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করা হয়। অবশ্যই ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য সদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে, যাহাতে আগামীতে যখনই অফিস আদালতে ফারসীর স্থলে ইংরেজি প্রবর্তন করা হইবে, তখন ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের কোন অভাব যেন না হয়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, প্রাচ্যদেশীয় শিক্ষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যাইতে হইবে। প্রাচ্য (ভারতীয়) শিক্ষাকেও সমুচিত উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। এই সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য হইল যে, বিচার বিভাগীয় সকল কার্যক্রম এখন দেশী ভাষার মাধ্যমেই চালু থাকিবে।

এই নির্দেশের ফলশ্রুতি হিসাবে ইংরেজি গ্রন্থাবলী উর্দু, বাংলা এবং ফারসীতে অনূদিত হইতে লাগিল। অনুবাদক এবং এই দেশীয় শিক্ষাবিদ লোকদের মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু যাহারা স্থানীয় ভাষার এহেন মর্যাদা সহ্য করিল না এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রশ্নে ইংরেজির বাস্তবায়নকেই একমাত্র মোক্ষ লাভের পথ বলিয়া মনে করিত, তাহাদের উদ্দেশ্য আর সফলকাম হইল না। এমনিতেই শিক্ষা কাউন্সিলেও এই উভয় মতাবলম্বী লোক ছিল এবং উভয় পক্ষের সংখ্যাও ছিল প্রায় সমান সমান। এজন্য উভয়ের বাদানুবাদ প্রায় অমীমাংসিত রহিয়া গেল। এই সম্পর্কে চার্লস ট্রিভলেন বলেন ঃ

এই সময় শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। শিক্ষা কাউন্সিলের কাছে এসম্পর্কে প্রচুর চিঠিপত্র আসিতে লাগিল। ইংরেজি পুস্তকাদির চাহিদা অনেক বাড়িয়া গেল, পক্ষান্তরে আরবী এবং সংস্কৃত

www.waytojannah.com

Contents

পুস্তকের ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস পাইতে লাগিল। শেষাবধি আরবী এবং সংস্কৃত পুস্তকের মুদ্রণ খরচও উসুল করা দায় হইয়া পড়িল। এই লোকসান রোধ করিবার জন্য সরকার আরবী ও সংস্কৃত পুস্তক ছাপানো বন্ধ করিয়া দিলেন। শিক্ষার মাধ্যম নিয়া বিতর্ক সৃষ্টিকারীদের সংখ্যা উভয় পক্ষেই সমান ছিল। ফলে, কিছুকাল শিক্ষা কাউন্সিলকে নিষ্কর্মা বসিয়া থাকিতে হইল এবং কোম্পানীর কাজও প্রায় তিন বৎসর যাবত স্থগিত ছিল। এখন এই উভয় দলের মতামত সরকারকে অবহিত না করিয়া কোন গত্যন্তর রহিল না। ইহার পর সরকার নিজেই এই ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। অন্যথায় শিক্ষা কমিটির এই বন্ধ্যাত্ব একটি সুদূর প্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় এমন একজনের হাতে শাসনদণ্ড রহিয়াছে, যিনি একান্তই নিরপেক্ষ প্রকৃতির এবং দ্বিতীয় সৌভাগ্য হইল, ভারতে এমন একজন তাহার সাহায্যার্থে আগাইয়া আসেন যিনি ইউরোপে ইংরেজি সাহিত্যকে উন্নতির উচ্চ শিখরে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি এমন সন্ধিক্ষণে এশিয়া ভূখণ্ডে পদার্পণ করেন যখন ইংরেজি সাহিত্যের তুলাদণ্ড টলটলায়মান।[৩৭]

লর্ড ম্যাকালের সিদ্ধান্ত

উপরোক্ত ব্যক্তিদ্বয় যথাক্রমে লর্ড বেন্টিঙ্ক ও লর্ড ম্যাকালে। লর্ড ম্যাকালে ১৮৩৪ সালে ভারতে সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে আগমন করেন। অতঃপর বড় লাট তাহাকে শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি পদেও নিয়োজিত করেন। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে উভয়দলের যুক্তি ও প্রমাণাদি শিক্ষা কাউন্সিলে পেশ করা হইলে কাউন্সিল উহার রায় প্রদানের জন্য সর্বময় ক্ষমতা লর্ড ম্যাকালের উপর অর্পণ করেন। উভয় পক্ষের যুক্তি এবং ভোট সমান সমান ছিল। এমতাবস্থায় লর্ড ম্যাকালে ইংরেজির স্বপক্ষে ভোট প্রদান করেন এবং ১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি এই মহাদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজিকে মর্যাদা প্রদান করা হয়।[৩৮]

লর্ড ম্যাকালের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মেজর বাসু.

মেজর বাসু বলেন, লর্ড ম্যাকালে ১৮৩৪ সালে এদেশে আসেন। তিনি পাক-ভারতের রীতিনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, এই দেশের জনজীবন ও জীবিকার ধারা সম্পর্কেও তাহার কোন সম্যক ধারণা ছিল না। অথচ লর্ড বেন্টিঙ্ক তাহার হাতেই শিক্ষার মাধ্যমের প্রশ্নটি ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

৩৭. History of English Education - Syed Mahmud P. 9-13
৩৮. History of English Education by - Syed Mahmud P-50

www.waytojannah.com

লর্ড ম্যাকালে পাক-ভারত সম্পর্কে তাহার স্মৃতিকথায় যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা খুবই নিন্দাজনক এবং উল্লেখের অযোগ্য। এই স্মৃতিকথা ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি এই দেশের শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"আমরা এমন সব পুস্তকাদি ছাপাইয়া থাকি (অর্থাৎ বোর্ড কর্তৃপক্ষ) উহার মূল্য যেমন কম তেমনি কাজও অত্যন্ত বাজে আর আমরা কৃত্রিম ও মিথ্যা অনুপ্রেরণা, মিথ্যা ইতিহাস, অবান্তর বিজ্ঞান, অকেজো দর্শন এবং ভ্রষ্ট মতবাদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছি।[৩৯]

লর্ড ম্যাকালের এই মন্তব্য এবং শিক্ষা সম্পর্কে তাহার সিদ্ধান্তে লর্ড বেন্টিঙ্ক খুবই প্রীত হন এবং ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে ফোর্ট উইলিয়াম হইতে নিম্নোক্ত ইশতেহারে প্রকাশিত হয় ঃ

ফোর্ট উইলিয়াম, জেনারেল কনসালটেন্ট

৭ই মার্চ, ১৮৩৫ ইং

গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল শিক্ষা কমিটির উভয় চিঠি (২১ ও ২২শে জানুয়ারি) বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়েন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রও পর্যালোচনা করেন। অতঃপর এই মর্মে নিম্নোক্ত ধারাবলী গৃহীত হয় ঃ

১. গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলের মতে বৃটিশ সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে স্থানীয় লোকদেরকে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। এইজন্য শিক্ষাখাতের সকল অর্থ ইংরেজি শিক্ষার জন্য খরচ করা শ্রেয়।

২. কিন্তু গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল ইহাও চান না যে, স্থানীয় লোকদের আদিম শিক্ষার স্কুল–কলেজ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কমিটির অধীনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা এবং শিক্ষকরা যে হারে বেতন ও ভাতাদি পাইত তাহা যথানিয়মে চালু থাকিবে। তবে সরকার ছাত্রদের নিয়মিত ভাতার ব্যাপারে কঠোর বিরোধিতা পোষণ করেন। আগামীতে যে সব ছাত্র নূতন ভর্তি ইহবে তাহাদের জন্য কোনরকম বেতন বা ভাতা দেওয়া হইবে না। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন অধ্যাপকের পদ যদি খালি হয় কমিটি যেন অনতি বিলম্বে তাহা সরকারকে অবহিত করেন। এই সংগে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্লাসের বিস্তারিত বিবরণ এবং ছাত্র সংখ্যা সম্পর্কেও সরকারকে রিপোর্ট দিতে হইবে যাহাতে উপযুক্ত লোক স্থলাভিষিক্ত করা যায়।

৩. গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল জানিতে পারিয়াছেন যে, এই দেশীয় শিক্ষাদির পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে কমিটি অজস্র টাকার অপচয় করিতেছেন।

৩৯. Education in India under E. I. Company-Basu-P-80

www.waytojannah.com

সাবধান করা হইতেছে যে, আগামীতে এই খাতে কোন টাকা আর ব্যয় করা যাইবে না।

৪. কমিটিকে আরো উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, শিক্ষা সম্পর্কিত এই আইন প্রবর্তিত হইবার পর উদ্বৃত্ত সকল টাকা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পঠিতব্য পাশ্চাত্য শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হইবে। কমিটিকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাহারা যেন এই নির্দেশ যথাশীঘ্র কার্যকরী করার জন্য অচিরেই একটি পরিকল্পনা সরকারের কাছে পেশ করেন।

স্বাক্ষর/এইচ জে প্রিন্সিফ
সেক্রেটারী

এই ঘোষণায় হিন্দুরা যার পর নাই খুশি হইল। কিন্তু মুসলমানরা ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং কঠোর প্রতিবাদ জানায়। এই ঘোষণায় মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারী মিঃ এইচ. এইচ উইলসন ১৮৫৩ সালের ৫ই জুলাই একটি রোয়েদাদ পেশ করেন ঃ

"সরকার যখন ছাত্রদের বৃত্তি বা ভাতা বরাদ্দ করিয়া, শিক্ষা খাতের সকল টাকা ইংরেজি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করিলেন, কলিকাতার মুসলমান ৮ শত দস্তখত সম্বলিত সরকারের কাছে একটি আবেদন পেশ করিয়া এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, একই শিক্ষার জন্য সমুদয় টাকা বরাদ্দ করার অর্থ এই দেশের লোকদেরকে খৃস্টান করিবার একটি অশুভ প্রয়াস বই আর কিছু নয়। সর্বস্তরে ইংরেজি চালু করিবার অর্থ মূলত খৃস্ট ধর্মেরই ব্যাপক প্রচার মাত্র। এই প্রতিবাদকারীদের মধ্যে মুসলমানদের গণ্যমাণ্য ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট আলেম সম্প্রদায় ছিলেন।

মিঃ উইলসন প্রসঙ্গান্তরে বলেন ঃ

"আমি মিঃ ম্যাকালের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশংসা করি। কিন্তু তিনি এই দেশের মাটিতে সম্পূর্ণ নবাগত। এই দেশের মানুষ এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাহার কোন ধারণা নাই। তিনি নিজের রায়কে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নিকটতম পারিপার্শ্বিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। যাহারা ইংরেজি শিক্ষার প্রসার কামনা করেন তাহাদের জন্য এই পদক্ষেপ মস্তবড় ভুল। জনসাধারণ কি চায়, এই সম্পর্কে তাহাদের কোন ধারণা নাই। শহরের লোকদের মানসিকতা এবং জীবনযাত্রার উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। কারণ শহরের উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি চালু আছে। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ নিন, মনে করুন হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র পাস করার পর সদর আমিন নিযুক্ত হইয়া মফস্বলে চলিয়া গেলেন। সেখানে তাহার সহিত কোন লোকই ইংরেজিতে কথা বলিবে

www.waytojannah.com

না। তাছাড়া তিনি যেসব কাজকর্ম সম্পাদন করিবেন সেখানেও ইংরেজির কোন ব্যবহার হইবে না। সেখানে শুধু নিজের ভাষাটাই ভাল করিয়া জানিবার প্রয়োজন হইবে এবং সেই সাথে আইন-কানুন কাজকর্ম এবং লোকদের রীতি রেওয়াজটুকুও ভালোভাবে রপ্ত থাকিতে হইবে। হিন্দু কলেজে তিনি যে চরিত্রের শিক্ষা পাইয়াছেন তাহার সহিত কর্মক্ষেত্রের চরিত্রের কোন মিল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অতএব দেশের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে ইংরেজির ব্যবহার এবং কার্যকারিতা নেহাতই নগণ্য। ইংরেজির ব্যবহার শুধু বড় বড় শহরে, আমাদের হেড কোয়ার্টারে এবং ইউরোপীয়ান সোসাইটিতে সীমিত।

ইংরেজি শিক্ষার সম্প্রসারণ সম্পর্কে আমার কোন আপত্তি নাই। আপত্তি শুধু একটি ব্যাপারে তাহা হইল, আমরা কেন শুধু একটি উদ্দেশ্যের মাঝে নিজেদেরকে সীমিত রাখব না। এই দেশের ভাষার সহিত যাহাদের স্বার্থ জড়িত তাহারাও চায় আমরা যেন শুধু একটি ভাষাকেই আমাদের উদ্দেশ্য নিরূপনে নিয়োজিত না করি। লোকরা উপকৃত হইবে এই ধরনের সব রকম শিক্ষাই চালু রাখিতে হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যথার্থ উপকারী শিক্ষা ইউরোপ হইতেই সরবরাহ হইবে এবং ইউরোপের সাহিত্য ও দর্শনই হইবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু যাহারা ইংরেজি জানে, এই জন্যই নির্ধারিত থাকে, তাহা হইলে আমাদের এই উদ্দেশ্য নেহাতই সীমিত পরিমণ্ডলে কার্যকরী হইবে। সত্যি বলিতে কি, আমরা আলাদা আলাদা এমন সব ইংরেজ জাতি সৃষ্টি করিয়াছি, আসল বৃটিশদের প্রতি তাহাদের অনুরাগ খুবই গৌণ। পক্ষান্তরে আমরা যদি ইহাকে এভাবে সীমিত না করি তাহা হইলে আমরা আরো বেশি লাভবান হইতে পারি।"[৪০]

১৮৩৭ সালের শিক্ষা এ্যাক্ট ও ফারসীর চির বিদায়

মুসলমানদের উপর্যুপরি প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার শেষাবধি ১৮৩৭ সালের শিক্ষানীতি সম্পর্কিত ২৯ নং ধারা শীর্ষক একটি আইন জারি করেন। এই আইন আনুযায়ী দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালত হইতে চিরতরে ফারসী ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং স্থানীয় ভাষাকে ফারসীর স্থলাভিষিক্ত করা হয়।[৪১]

---

৪০. History of Education, Basu-P-19

৪১. ২৯ নং ধারা ঃ (৯) এতদসংক্রান্ত আইন জারি করা হইতেছে যে, ১৮৩৭ সালের ১ লা ডিসেম্বর হইতে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে শিক্ষা কাউন্সিল এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই মর্মে আদেশ জারি করিতে পারিবে যে, দেশের পূর্ণ অঞ্চল অথবা বিশেষ এলাকায়' যেখানে ফারসী ভাষায় কাজকর্ম নির্বাহ করা হয় এমন সব আদালতে অথবা অর্থ সংক্রান্ত বিভাগে অথবা উহা ছাড়া কোন সরকারী যে কোন দফতরে কোন ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবার যোগ্য মনে করিবেন স্বচ্ছন্দে তাহা কার্যকরী করিতে পারিবেন। উপরন্তু উক্ত তারিখ হইতে গভর্নর জেনারেল এই অধিকারও সংরক্ষণ করিবেন যে, কোন নির্দেশের বলে উক্ত বিধি সংক্রান্ত অধিকার পুরাপুরি বা আংশিক তাহার অধীনস্থ কোন অফিসারকে বিনাশর্তে বা শর্তসাপেক্ষে সোপর্দ করা যাইবে।

www.waytojannah.com

ফারসীর বদলে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার সম্পর্কেও তুমুল প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়। এমনকি পূর্ব বাংলা হইতেও ফারসীকে অফিস আদালত হইতে বিদায় না করিবার জন্য বহু প্রতিবাদ লিপি সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকা হইতে ৪ শত একাশিটি দস্তখত সম্বলিত একখানি আবেদন প্রেরিত হয়। দস্তখতকারীদের মধ্যে ১ শত ৯৯ জন ছিলেন হিন্দু। এই আবেদনপত্র তদানীন্তন জজ মিঃ জে. এফ. কোক বাংলা সরকারের সেক্রেটারীর কাছে প্রেরণ করেন। পূর্ব বাংলা হইতে প্রেরিত এই আবেদনের তরজমা নিম্নরূপ ঃ

এফ. জে. হালিডে. সেক্রেটারী, বঙ্গ সরকার জে. এফ. কোক
ফোর্ট উইলিয়াম, সমীপে। অফিসিয়েটিং জজ, ঢাকা
নং ১১০, ঢাকা জেলা, তাং-৮ই মার্চ ১৮৩৯ ইং

আমি ঢাকা জেলার ৪ শত একাশিজন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের দরখাস্ত আপনার খেদমতে পেশ করিতেছি। আপনি ইহা বাংলার ডেপুটি গভর্নরের সমীপে পেশ করিবেন। ফারসী ভাষাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দরখাস্তটি করা হইয়াছে। এই দস্তখতকারীদের মধ্যে ১ শত ৯৯ জন হিন্দুও রহিয়াছেন। এই দরখাস্তের বিস্তারিত বিবরণ হইল এই যে, আমাদের এখানে বহুকাল যাবত ফারসী ভাষা প্রচলিত। নূতন হুকুম অনুযায়ী ফারসীর বদলে এখন বাংলা ব্যবহার করিতে হইবে, কিন্তু এই নির্দেশে কতকগুলি সমূহ অসুবিধা এবং সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। পর্যায়ক্রমে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১. এক জেলার প্রবাদের সহিত অন্য জেলার প্রবাদের কোন মিল নাই। এইজন্য এক ধরনের ভাষা সকল জেলার লোকদের কাছে সমান বোধগম্য হইবে না। অনুরূপভাবে বাংলা ভাষার বিভিন্ন বর্ণও জেলাভেদে বিভিন্ন রকমের। শুধু ইহাই অসুবিধা নহে বরং কেহ কিছু লিখিয়া পুনরায় তাহা স্বচ্ছন্দভাবে পাঠোদ্ধার করিতেও পারে না। ফলে, কাজকর্মে দীর্ঘসূত্রিতা এবং শৈথিল্য পরিলক্ষিত হইবে।

২. আদালতের মন্তব্য বা মতামত ইত্যাদি প্রত্যেক অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট ভাষায় লেখা হয় তাহা হইলে তাহা যেমন দীর্ঘ হইবে এবং উহা কেহ ঠিকমত বুঝিতেও পারিবে না। বর্তমান নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী কর্মচারীরা এখন এমনভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছে যে, উহাতে সংস্কৃতের সংমিশ্রণ খুব বেশি এবং বক্তা ও শ্রোতা পরস্পরে নিজেদের কথা বুঝিতে পারে না যতক্ষণ না তাহা তর্জমা করিয়া বুঝান হয়। অথচ সরকারের উদ্দেশ্য, উভয় পক্ষের বক্তব্য যেন উভয়ের বোধগম্য হয় সহজে।

৩. ফারসী ভাষার এক বাক্যে যে বক্তব্য পুরাপুরি ভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহা বাংলাতে দশ লাইনেও সম্পন্ন করা যাইবে না। যদি কেহ সংক্ষিপ্তভাবে তাহা বলিতে

www.waytojannah.com

চেষ্টা করে তাহাতে অনেক কথাই অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে। অতএব ভাষা বদল করিয়া লাভটা কোথায় ?

৪. আপনি যদি চান যে, বাংলা পড়িয়া সরাসরি অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিতে হইবে তাহা হইলে বাংলার প্রতি বর্ণ সহ পড়িতে হইবে। যিনি লিখিবেন তিনিও বলিতে পারিবেন না যে, যাহা লেখা হইল তাহার বক্তব্য কি দাঁড়াইল। যদি কাহাকেও প্রশ্ন করা হয় যে, অমুক কথাটি কোথায় লেখা হইয়াছে তাহা হইলে তাহাকে উহার আগাগোড়া পাঠ করিতে হইবে। এই কারণেই এখনও বাংলায় লিখিত রোয়েদাদের টীকা ফারসীতে বিস্তারিত লেখা হয়।

৫. ইতিপূর্বে সরকার বাংলা ভাষায় কোন সরকারী কার্যক্রম করেন নাই। এখন কোন বিশেষ শব্দের বিশেষ অর্থ বুঝাইবার জন্য যদি অনেক কষ্টে তাহা ব্যক্ত করা হয়, তারপরও মতদ্বৈধতার অবকাশ থাকিবে। পক্ষান্তরে, ফারসীর সকল প্রবাদ এবং শব্দ সম্পর্কে লোকেরা সুপরিজ্ঞাত। বহুল ব্যবহারে ফারসী লোকদের কাছে সহজবোধ্য হইয়া আসিয়াছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কোন বিশেষ শব্দ নিয়া যদি বাদানুবাদ বা মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হয় তখন এ সম্পর্কে এমন একজন জজই সমাধান দিতে পারিবেন যিনি বাঙ্গালীদের আঞ্চলিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন। তাহা ছাড়া বাংলায় এমন সব শব্দ এবং উহার জটিল উচ্চারণ রহিয়াছে যাহা ভালো পণ্ডিতদেরও রপ্ত নাই। অতএব এইসব প্রকাশ্য কারণগুলির দরুন সরকারের ঈপ্সিত লাভের বদলে লোকসানের আশংকা বেশি রহিয়াছে।

৬. বাংলার লিখন রীতি এমন আজব ধরনের যে, উহা সহজে পড়া যায় না। অথচ ফারসী খুব প্রাঞ্জলভাবেই লেখাও যায় পড়াও যায়।

৭. একটি রোয়েদাদ ফারসীতে এক ঘন্টার মধ্যে শেষ করা সম্ভব, কিন্তু উহা বাংলাতে একদিনেও সম্ভব নয়। তাছাড়া বাংলা ভাষার ফারসী তর্জমা অতি দ্রুত এবং স্বচ্ছন্দে করা চলে কিন্তু ফারসীর বাংলা তর্জমা তাহার বিপরীত।

ফারসী ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে কতিপয় ব্যাখ্যা

১. এই ভাষা দেশের অধিকাংশ এলাকায় ব্যবহৃত হইতেছে এবং ফারসীর বর্ণও বেশ পরিষ্কার। ফারসীতে যাহাই কিছু লেখা যায় সহজে তাহা বোধগম্য হয়।

২. মনের ভাব ফারসীতে যত সহজে এবং প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করা যায় বাংলাতে তা সম্ভব নয়। ফারসীর লিখন পদ্ধতিও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

৩. সরকারের সকল রেকর্ডপত্র ফারসীতে রহিয়াছে। বাংলার চাইতে উহা অনেক সংক্ষিপ্ত এবং ইহাতে কাগজও অনেক কম খরচ হইয়াছে। কিন্তু বাংলাতে নানাবিধ অসুবিধা ছাড়াও অজস্র কাগজের অপচয় হইবে।

www.waytojannah.com

Contents

৪. ডিগ্রী এবং অন্যান্য রেকর্ড অবলীলাক্রমে ফারসীতেই লিপিবদ্ধ করা সম্ভব।

৫. সম্ভ্রান্ত লোকেরা অধিকন্তু ফারসী জানেন এবং জনসাধারণের মাঝেও ফারসীর জনপ্রিয়তা অত্যধিক।

৬. সকল হিন্দু এবং মুসলমানের একমাত্র ইচ্ছা যে, ফারসীকেই সরকারী ভাষার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা হোক। সরকার এই ভাষাকে বর্জন করিতে চান এই সংবাদ জনসাধারণের মাঝে অসন্তোষের সূত্রপাত করিয়াছে।

স্বাক্ষর ঃ জে. এফ. জি. সি

(মওলা বখ্‌শ কমিটির রিপোর্ট হইতে সংকলিত, পৃঃ ১৪৯)

লর্ড অকল্যাণ্ডের ঘোষণা

১৮৩৯ সালের ২৪শে নভেম্বর লর্ড অকল্যাণ্ড শিক্ষা সম্পর্কিত একটি নতুন অর্ডিন্যান্স জারি করিলেন। তিনি এই দেশের মৌলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি বিশেষ মমত্ব প্রদর্শন করেন এবং অধ্যাপকদের পদচ্যুতিরোধ ও ছাত্রদের বৃত্তি পুনর্বহাল করেন। অর্থাৎ লর্ড বেন্টিঙ্ক প্রদত্ত ছাত্রদের বৃত্তি বন্ধ এবং অধ্যাপক ছাঁটাইর পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে না। লর্ড অকল্যাণ্ডের এই সিদ্ধান্ত বোর্ড অব ডিরেক্টরস ১৮৪১ সালের জানুয়ারিতে একটি ইশতেহারে প্রকাশ করেন। উহাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, দেশীয় কলেজ ও প্রাচ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহে যে ধারা ব্যয় বরাদ্দ চালু ছিল উহা যথা নিয়মে বলবৎ থাকিবে।[৪২] আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য চাকুরীর দ্বার ইতিমধ্যে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল কিন্তু লর্ড অকল্যাণ্ডের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আলিয়া মাদ্রাসায় কোন মতে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার পাইল। আলিয়া মাদ্রাসার বৃত্তি এবং বরাদ্দ যাহা ছিল সেই সম্পর্কেও কোনরূপ হস্তক্ষেপ আর করা হইল না।

অতঃপর স্বভাবতই আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মন ইংরেজি শিক্ষা হইতে উঠিয়া গেল এবং শেষাবধি মাদ্রাসায় ইংরেজি ক্লাস বন্ধ করিয়া দিতে হইল।

মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল নিয়োগ

১৮৪০ হইতে ১৮৫০ সাল অবধি মাদ্রাসা সম্পর্কে ১৮৪৩ সালে সরকারের ১২ই জুলাই,'৪২ তারিখের রেজুলেশন অনুযায়ী শিক্ষা বিভাগের জেনারেল কমিটি ভাঙ্গিয়া দিয়া সর্বময় ক্ষমতা শিক্ষা কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা হয়। মাদ্রাসার সাব কমিটিও ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এখন মাদ্রাসার সেক্রেটারী সরাসরি কাউন্সিলের অধীনে হইয়া গেলেন। মিঃ লম্‌স্‌ডনের পরিবর্তে Col. Railey কে সেক্রেটারী নিয়োগ করা হয়। রেলে কিছুকাল পর এই পদ ত্যাগ করেন। এই সময় সহকারী সেক্রেটারী হাফেজ

৪২. Educational proceedings, April 1861

www.waytojannah.com

আহম্মদ কবীর সাহেব মৃত্যুবরণ করেন। ফলে, এই দুইটি পদ বেশ কিছুকাল খালি ছিল। ১৮৫০ সালে শিক্ষা কাউন্সিল অন্যান্য কলেজের মতো আলিয়া মাদ্রাসাতেও একজন ইংরেজ প্রিন্সিপাল নিয়োগের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন। তবে উক্ত প্রিন্সিপাল ক্লাসের শিক্ষাদানের সহিত জড়িত থাকিবেন না। একই প্রিন্সিপালের অধীনে হুগলী মাদ্রাসাও পরিচালিত হইবে। কাউন্সিল এই প্রস্তাবের সহিত মাদ্রাসার খতিব এবং মুয়াজ্জিনের পদ বিলুপ্তিরও সুপারিশ করেন। তাহারা বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে এই দু'টি পদ অবান্তর এবং অন্যান্য কলেজে এই পদ নাই। কাউন্সিলের এই সমুদয় প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করেন।

এশীয় ভাষা এবং শিক্ষা বিষয়ক পণ্ডিত ডঃ এ স্প্রিঙ্গার এম. এ কে আলিয়া মাদ্রাসার প্রথম প্রিন্সিপাল হিসাবে নিয়োজিত করা হয়। ইতিপূর্বে মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপককেই প্রিন্সিপাল বলা হইত। কিন্তু এই নব নিযুক্ত ইংরেজ প্রিন্সিপালের ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রধান অধ্যাপকের পদবী দেওয়া হইল 'হেড মওলবী'।

প্রিন্সিপালের সংস্কার প্রয়াস ও মাদ্রাসায় গোলযোগ

ডঃ স্প্রিঙ্গার প্রিন্সিপাল পদ গ্রহণের পর মাদ্রাসার কতগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রদবদল এবং সংস্কারের চেষ্টা করেন। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি এই সংস্কারের একটি স্কীমও তৈয়ার করেন এবং সর্বাগ্রে মাদ্রাসার শিক্ষা বিষয়ের পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ছাত্ররা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। প্রিন্সিপালকে ইট-পাটকেল ও পচা ডিম নিক্ষেপ করে। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলিয়া গেলে নিরাপত্তার জন্য তিনি নিজের বাসভবনে অন্তরীণাবদ্ধ থাকেন এবং শেষাবধি পুলিশের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হইয়া আসিলে প্রিন্সিপাল গোলযোগ সৃষ্টিকারী কতিপয় ছাত্রের নাম খারিজ করিয়া দেন। ফলে, বহিষ্কৃত ছাত্ররা পুনরায় প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে এবং অবস্থা আয়ত্তে আনিবার জন্য পুলিশ মোতায়েন করিতে হয়। অতঃপর মাদ্রাসার এই গোলযোগ সম্পর্কে সরকারের উপরস্থ মহল উদ্বিগ্ন হন। শিক্ষা কাউন্সিল মাদ্রাসার এই গোলযোগ ও আন্দোলন পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটি ইহার তদন্ত করিয়া মাদ্রাসার মঙ্গলের জন্য পরামর্শ প্রদান করিবেন। এই কমিটিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন ঃ

১. অনারেবল জে. ই. ডি. বিথুন (বিথুন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও বড় লাটের কাউন্সিল-সদস্য) সভাপতি, শিক্ষা কাউন্সিল।

২. মিঃ এফ জে, হলিডে (বাংলার প্রথম লেঃ গভর্নর)

৩. মিঃ সিসিল বেডেন (বাংলার লেঃ গভর্নর)

৪. ড. জে ফোসেথ

www.waytojannah.com

গোলযোগের কারণ

তদন্ত কমিটির রিপোর্টে জানা গিয়াছে যে, নিম্নলিখিত সংস্কার স্কীমের বিরুদ্ধে ছাত্ররা অসন্তোষ জানায় এবং ইহাতে গোলযোগের সূত্রপাত হয়।

১. মায়বুজী ও সোদরকে শিক্ষাবহির্ভূত করার প্রয়াস।
২. পুরনো হেকমতকে বিষয় বহির্ভূত করিয়া নতুন হেকমতের প্রবর্তন।
৩. আরবীর বদলে উর্দু ভাষায় হেকমত (বিজ্ঞান) শিক্ষার প্রবর্তন।
৪. আধুনিক বিজ্ঞান পড়াইবার জন্য জনৈক এ্যাংলো ইন্ডিয়ানকে (মি. লওয়ার) নিয়োগ করার প্রস্তাব।

এই আন্দোলনের সময় শিক্ষকরা ছাত্রদের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু প্রিন্সিপালকে তাঁহারা কোনরূপ সহযোগিতা করেন নাই।

তদন্ত কমিটি ৪ঠা আগস্ট ১৮৫৩ সালে মাদ্রাসা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টের ফলশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা কাউন্সিলের মতামতের অংশ বিশেষ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ (১৮৪০–৫৯ সালের এডুকেশন রেকর্ড হইতে গৃহীত)

"শিক্ষা কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ কিছুকাল হইতে মোহামেডান কলেজ বা মাদ্রাসার শিক্ষা বিষয় নিয়া চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। এই সঙ্গে কাউন্সিল 'হিন্দু কলেজ' সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন। হিন্দু কলেজে হিন্দু ছাত্ররাই পড়াশুনা করে। অন্য ধর্মাবলম্বী ছাত্ররা এই কলেজে পড়াশুনা করিতে পারে না। কাউন্সিলের সদস্যরা মনে করেন, এই দেশের এই দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করার এখন সময় আসিয়াছে।

আলিয়া মাদ্রাসার দুইটি বিভাগ

এই সময় আলিয়া মাদ্রাসার দুইটি বিভাগ ছিল। একটি আরবী বিভাগ। এই বিভাগে আরবী বর্ণমালা হইতে শুরু করিয়া সকল উচ্চ আরবী বিষয়ের শিক্ষা দান করা হইত। মাদ্রাসার গোড়াপত্তন হইতেই এই বিভাগ চালু হইয়াছে। অপর বিভাগটির নাম ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট। ১৮২৯ সালে এই বিভাগের পত্তন হয়। এই বিভাগের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল অন্য রকম। এই বিভাগের ছাত্ররা মামুলী ফি দিতো। নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান পরিবারের ছেলেরাই বেশির ভাগ এই বিভাগে পড়াশুনা করিত। এই ইংরেজি বিভাগকে মূলত ইংরেজির শিক্ষার প্রাইমারী পর্যায় বলা যাইতে পারে। এই বিভাগে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাও পড়ানো হইত। ঐচ্ছিকভাবে ইংরেজির সহিত বাংলা পড়িতে পারিত। ১৮৪৯ সালে মাদ্রাসায় একটি 'এ্যাংলো এরাবিক' ক্লাসের পত্তন করা হয়। এই ক্লাসের মাসিক ব্যয় ছিল সর্ব মোট ১ শত টাকা। কিন্তু তারপরও মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষার উন্নতির কোন সুলক্ষণ দেখা

Contents

গেল না। ইতিমধ্যে ইংরেজি বিভাগের একজন শিক্ষক বদলী হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল, কিন্তু সেই শূন্য পদে কাহাকেও বহাল করা হইল না। এইমত কারণের পরিপ্রেক্ষিতে কাউন্সিল চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মাদ্রাসায় এখন আর মামুলী সংস্কার চলিবে না। এইবার মাদ্রাসার আমূল সংস্কার করিতে হইবে।

শিক্ষা কাউন্সিল রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাপারেও নিশ্চিত হইলেন যে, বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চবংশীয় লোকেরা এখন ক্রমান্বয়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। এবং নিজেদেরকে অধঃপতনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইংরেজি শিক্ষার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অবশ্য ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি পশ্চাৎপদ ছিল।

মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যর্থতার কারণ

এক শ্রেণীর লোকদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি টান থাকা সত্ত্বেও আলিয়া মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষার তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহার কারণ ছিল দ্বিবিধ। আসলে মাদ্রাসার ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আন্তরিক টান যেমন ছিল না, তেমনি এই বিভাগের বন্দোবস্তও ছিল অপ্রতুল এবং নিম্নমানের। দ্বিতীয়ত যে সব মুসলমান বিশেষভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তাহারা নিজেদের ছেলে-মেয়েদেরকে সেন্টপল স্কুল ও প্যারেন্টাল একাডেমীতে ভর্তি করিয়া দিতেন। এই দুইটি স্কুলই মিশনারীদের প্রভাবমুক্ত ছিল। এইজন্য কমিটি মনস্থ করিলেন যে, আলিয়া মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগের মান এবং বন্দোবস্তের উৎকর্ষ সাধন করিলেই এই সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হইবে। তখন ছাত্ররা সেন্টপল বা প্যারেন্টাল একাডেমীর বদলে মাদ্রাসাতেই ভর্তি হইবে।

এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের প্রস্তাব

কাউন্সিল অতঃপর মাদ্রাসার এই উভয় বিভাগের বিলোপ সাধন করিয়া এ্যাংলো পার্সিয়ান নামক একটি নূতন বিভাগ পত্তনের বিষয় চিন্তা করেন। এই বিভাগের শিক্ষক এবং ছাত্রদের শিক্ষার মান এতখানি উন্নত হইতে হইবে যাহাতে এখান হইতে জুনিয়র স্কলারশিপের ছাত্র তৈরি করা যায়। এই বিভাগে মুখ্যত ইংরেজির সহিত ফারসীও পড়ানো হইবে। এই দুই বিষয় ছাড়াও এই বিভাগে ছাত্রদের জন্য বাংলা এবং উর্দু শিক্ষারও বন্দোবস্ত থাকিবে। কেননা, উর্দু এই উপ মহাদেশের সাধারণ ভাষা আর বাংলা এই প্রদেশের নিজস্ব ভাষা। মোটকথা, এই বিভাগ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্ররা জুনিয়র স্কলারশিপের মর্যাদা পাইবে এবং যাহাকে 'স্কুল অনার্স' বলা যাইতে পারে। এই কোর্সে ছাত্ররা দশ-এগার বৎসর বয়সে ভর্তি হইবে এবং পাঁচ-ছয় বৎসরে এই কোর্স সম্পন্ন করিবে। এই কোর্স পাস করার পর ছাত্ররা ফারসীতে প্রভূত ব্যুৎপত্তি লাভ করিবে। এই কোর্স শেষ হইবার পর ছাত্ররা ঐচ্ছিকভাবে ইংরেজি অথবা আরবী

www.waytojannah.com

নিয়া উচ্চতর পড়াশুনা করিতে পারিবে। যাহারা আরবী পড়িবে, আলিয়া মাদ্রাসাতেই ভর্তি হইতে পারিবে। আর যাহারা ইহার পর ইংরেজি পড়িতে চায় মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি হইতে পারিবে। এই কলেজে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র ভর্তি হইতে পারিবে। এইখানে ভর্তি হইতে না পারিলে হিন্দু কলেজের দ্বার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। হিন্দু কলেজে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের ভর্তির ব্যবস্থা করা হইবে।

মেট্রোপলিটন কলেজের ইতিবৃত্ত

কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কয়ারের বিখ্যাত ধনী ও সম্ভ্রান্ত দত্ত পরিবার এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করে। এই দেশের বাসিন্দাদেরই প্রতিষ্ঠিত এই কলেজের শিক্ষাগত মান বেশ উন্নত ছিল। এই কলেজের অধ্যাপক মণ্ডলী অত্যন্ত বিজ্ঞ এবং দক্ষ ছিলেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে একটি চমকপ্রদ কাহিনী আছে। হিন্দু কলেজ সরকারের অধীনে দেওয়ার পর একটি শর্ত আরোপ করা হইয়াছিল যে, এই কলেজে অকুলীন বংশের কোন হিন্দু ছাত্র যেন ভর্তি না হয়। কিন্তু এই শর্ত বেশিদিন টিকাইয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। হীরা নাম্নী জনৈকা বিত্তশালী বেশ্যাজীবী মহিলার পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা হয়। ফলে উচ্চ বংশীয় হিন্দু সমাজে ইহার তীব্র বিরোধিতার ঝড় উঠে এবং ছাত্রটিকে কলেজ হইতে বহিষ্কার করিতে বাধ্য করা হয়। পতিতার পুত্রের এই কলেজে ভর্তি হওয়ায় হিন্দু সমাজ বিশেষভাবে অপমানিত বোধ করে। ফলে, তাহারা ১৮৫৩ সালে মেট্রোপলিটন কলেজ নামে অপর একটি কলেজের পত্তন করেন। তদানীন্তন বিশিষ্ট ইংরেজি শিক্ষাবিদ ক্যাপ্টেন ডি. এল, রিচার্ডসনকে এই কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে নিয়োগ করা হয়। অধ্যাপক মণ্ডলীতে ক্যাপ্টেন হারিস, উইলিয়াম ক্রুক, পেট্রিক ও উইলিয়াম মাস্টারের মতো বিখ্যাত শিক্ষাবিদরা ছিলেন। দত্ত পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা ও উচ্চবংশীয় হিন্দু সমাজের অজস্র সাহায্যপুষ্ট এই কলেজের ঐশ্বর্য ছিল তুলনাহীন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই কলেজের পত্তন হয়।

ব্রাঞ্চ স্কুল

কাউন্সিলের স্কীম মতে এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া স্থানান্তরে অসচ্ছল লোকদের বস্তি এলাকায় একটি ব্রাঞ্চ স্কুল খোলার প্রস্তাব পেশ করা হয়। গরীব এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং গরীব মুসলমান ছেলেরা এই ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়িয়া 'জুনিয়র স্কলারশীপ'-এর মান অর্জন করিবে ইহাই ছিল এই স্কুল পত্তনের আসল উদ্দেশ্য। হিন্দু কলেজের ব্রাঞ্চ স্কুলের মতো এই স্কুলেও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিবে।

আরবী বিভাগের সংস্কার

শিক্ষা কাউন্সিল আলিয়া মাদ্রাসার মৌলিক শিক্ষা ঠিক রাখিয়া ছাত্রদেরকে পর্যাপ্ত ইংরেজি শিক্ষা দানের চেষ্টা করিতেন যাহাতে তাহারা মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি

www.waytojannah.com

হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে। কাউন্সিলের সংস্কারাধীন পরিকল্পনা অনুযায়ী আলিয়া মাদ্রাসার আরবী শিক্ষার যুগোপযোগী সংস্কারের প্রস্তাব আনয়ন করা হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন সংস্কৃত কলেজের যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করিয়াছেন তেমনি এই মাদ্রাসার মৌলিক আরবী শিক্ষারও সংস্কার সাধন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া কাউন্সিল মন্তব্য করেন।

কাউন্সিলের এই ইচ্ছা অনুযায়ী প্রাচীন পন্থী হেকমত ও ফালসাফা (দর্শন), আরবী বা যে কোন ভাষাতেই হউক উহা চিরতরে বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেননা এতকাল পরও দুই হাজার বৎসরের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ বাঁচাইয়া রাখার কোনই যৌক্তিকতা নাই। দুই হাজার বৎসরে দুনিয়া এইক্ষেত্রে বহু আগাইয়া আসিয়াছে। সরকারের একটি বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের প্রাপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকিবে ইহা খুবই লজ্জাজনক। এই হেকমত বা ফালসাফার বদলে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন বরং দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া অথবা পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করিয়া শিক্ষা বিষয় হিসাবে তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের প্রাথমিক বাজেট

এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের জন্য যে স্টাফের প্রয়োজন তাহার ব্যয় বরাদ্দ নিম্নরূপ ধার্য করা হয় ঃ

১. হেডমাস্টার	মাসিক	৪০০ শত টাকা
২. দ্বিতীয় শিক্ষক	”	৩০০ শত টাকা
৩. তৃতীয় শিক্ষক	”	১৫০ টাকা
৪. চতুর্থ ”	”	১০০ টাকা
৫. পঞ্চম ”	”	৮০ টাকা
৬. ষষ্ঠ ”	”	৫০ টাকা
৭. সপ্তম ”	”	৪০ টাকা
৮. অষ্টম ”	”	৩০ টাকা
৯. প্রধান শিক্ষক ফারসী	”	১০০ টাকা
১০. দ্বিতীয় ” ”	”	৫০ টাকা
১১. তৃতীয় ” ”	”	৩০ টাকা
১২. প্রথম পণ্ডিত ”	”	৪০ টাকা
১৩. দ্বিতীয় ” ”	”	২০ টাকা
১৪. লাইব্রেরীয়ান ”	”	২০ টাকা
	সর্বমোট মাসিক	১৪১০ টাকা
	বার্ষিক	১৬৯২০ টাকা

www.waytojannah.com

মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগ বন্ধ করিয়া দিলে যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে উহাতে এই খরচ আংশিক পূরণ করা যাইবে। ইংরেজি বিভাগের সর্বমোট মাসিক খরচ ছিল ২৭০ টাকা। তাছাড়া এ্যাংলো অ্যারাবিক বিভাগের ১০০ টাকাও এই খাতে খরচ করা যাইবে। এই বিভাগের ব্যর্থতার দরুন অনেক দিন হইতে এই টাকা অকেজো পড়িয়াছিল। অতঃপর এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ চালু করিতে সরকারকে আরো এক হাজার টাকা খরচ করিতে হইবে। কাউন্সিল মনে করেন, একটা বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই এক হাজার টাকা বরাদ্দ করা মোটেই অশোভন হইবে না। এই বৃহৎ শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করিবার জন্য সরকারকে ব্রাঞ্চ স্কুলও পত্তন করিতে হইবে।

কাউন্সিল রিপোর্টের শেষ পর্যায়ে বলিয়াছেন যে, সরকার হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত কলেজ পত্তন করিয়া হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মকথা ও রীতি-নীতি পাঠ করিবার সুযোগ দিয়াছেন তেমনি আলিয়া মাদ্রাসা পত্তন করিয়াও মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবী ও সাহিত্য শিক্ষার একটি সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। কাউন্সিলের এই প্রস্তাবনার ভিত্তিতে বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছে (২০শে জানুয়ারি ১৮৪১)।

এ্যাংলো পার্সিয়ান, ব্রাঞ্চ স্কুল ও মাদ্রাসার সংস্কার সম্পর্কিত কাউন্সিলের সমুদয় প্রস্তাব লর্ড ডালহৌসী ১৮৫২ সালে অনুমোদন করেন এবং স্থায়িভাবে এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের পত্তন করা হয়; ১৮৫৪ সালে এই বিভাগের উদ্বোধন করা হয়। প্রস্তাবিত জুনিয়র স্কলারশীপের মান পর্যন্ত এই বিভাগ চালু করিয়া কলঙ্গাতে একটি ব্রাঞ্চ স্কুলেরও পত্তন করা হয়। এই ব্রাঞ্চ স্কুলে অধিকন্তু গরীব এবং অভাবগ্রস্ত পরিবারের ছেলেরা পড়িত। কেননা, তখন আলিয়া মাদ্রাসার মূল শিক্ষায়তনে শুধু সম্ভ্রান্ত এবং অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলেদের প্রবেশাধিকার ছিল।[৪৩] কলঙ্গা শাখা স্কুলেও আলিয়া মাদ্রাসার অনুরূপ আরবী এবং এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ চালু করা হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন

১৮৫৪ সালের ১৯শে জুলাই কোর্ট অব ডিরেক্টরস ভারত সরকারের নামে একটি বিশেষ নির্দেশ জারি করেন যাহার ফলে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার বুনিয়াদ আরো সুদৃঢ় হয়। এই নির্দেশে বলা হয় যে, ভারতীয়দের শিক্ষার সমুদয় দায়িত্ব এবং অধিকার ক্ষমতাসীন সরকারের রহিয়াছে। এখন হইতে সরকারের সমুদয় প্রয়াস ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের কাজে ব্যয়িত হইবে। ভারতের প্রতিটি পল্লী গ্রামে পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার লাভ করিবে ইহাই থাকিবে সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ব্যাপকতর শিক্ষা পরিকল্পনায় জাতি ধর্ম ও ছোট বড় নির্বিশেষে সকলের কাছেই শিক্ষার আলো পৌছাইতে হইবে। কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর এই ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত

৪৩. Problem of Muslim Education in Bangal—Azizul Haq.

www.waytojannah.com

সরকার ১৮৫৭ সালে ১১নং শিক্ষা এ্যাক্ট পাস করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পত্তনের পর এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভিত্তিমূল আরো প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সকল শ্রেণীর লোকের জন্য এই শিক্ষা সহজলভ্য হইল।

মাদ্রাসার প্রতি লেঃ গভর্নরের কোপদৃষ্টি

১৮৫৭ সালে মিঃ উইলিয়াম নাসানলিজকে আলিয়া মাদ্রাসার দ্বিতীয় প্রিন্সিপাল হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ইহার পরবর্তী বৎসরই বাংলার লেঃ গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক হালিডে মাদ্রাসার শিক্ষা ও তৎপরতার উপর বিশেষ বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। ইহার অন্যতম কারণ ছিল সিপাহী বিদ্রোহ। কারণ, এই বিপ্লবে মাদ্রাসার ছাত্ররাও অংশগ্রহণ করিয়াছিল। মাদ্রাসার ছাত্ররা ধর্ম যুদ্ধ, জিম্মি, দারুল হরব ও ইসলামের নানা মৌলিক বিষয়াদি পড়িয়া বিদেশী শাসকদের প্রতি বিষোদগার করিত এবং জনসাধারণের মাঝেও তাহাদের মনোভাব প্রচার করিত। মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা যেহেতু কোন সরকারী চাকুরীতে ছিল না এজন্য সরকার তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত না। তাহারা দিব্যি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিষবাষ্প ছড়াইয়া বেড়াইত। মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক মওলানা আজিজ জুম্মার নামাযে অংশগ্রহণ করিতেন না। কেননা তিনি এই দেশকে দারুল হরব (বিজাতি শাসিত) মনে করিতেন। ইত্যাদি কারণের পরিপ্রেক্ষিতে লেঃ গভর্নর মাদ্রাসার এইধারা শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই শিক্ষা ক্ষমতাসীন সরকারের কোন উপকারতো দূরের কথা বরং ইহা ক্ষতির কারণ বলিয়া তিনি মনে করেন।

অতএব এই মর্মে লেঃ গভর্নর ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে (১৮৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত) নিম্নোক্ত নির্দেশ জারি করেন ঃ

"সরকারী খরচে ভবিষ্যতে মাদ্রাসা পরিচালিত হইবে কিনা এখন এই বিষয় চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। বর্তমান পরিবর্তনশীল সময়ে মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে কিনা তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। এই ব্যাপারে ডিরেক্টর স্বয়ং যেন চিন্তা-ভাবনা করেন এবং মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মিঃ লিজ-এর সহিত পরামর্শ করিয়া একটি রিপোর্ট পেশ করেন।"

লেঃ গভর্নরের নির্দেশক্রমে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মিঃ লিজ নিম্নোক্ত রিপোর্ট পেশ করেন ঃ

"ভারতীয় মুসলমানদের সহিত বৃটিশ সরকার দ্বিবিধ প্রকারে সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারেন। মুসলমানদেরকে তাহাদের নিজস্ব নিয়মে বিচরণ করিতে দিতে হইবে এবং এভাবে দিন দিন অধঃপতন হইতে তাহাদেরকে টানিয়া তুলিতে হইবে। এই ব্যাপারে আমি বিস্তারিতভাবে জানাইতে চাই যে, বৃটিশ সরকার যখন এদেশের ক্ষমতা

www.waytojannah.com

গ্রহণ করেন তখন মুসলমানরা সরকারের সহিত শুধু একটি কারণে নিশ্চিন্ত ছিল যে, দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার ব্যাপারে তাহাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকার যখন ক্রমান্বয়ে দেশের সর্বময় ক্ষমতার উপর জাঁকাইয়া বসিলেন এবং মুসলমানদের সকল অধিকার হরণ করিলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সরকার ফৌজদারী আদালতগুলিতে পর্যন্ত মুসলমানদের পরিবর্তে ইংরেজ জজ নিয়োগ করেন। অতঃপর সরকার দেশময় ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাকে এই দেশের শিক্ষার মানদণ্ড হিসাবে মর্যাদা প্রদান করেন। এমতাবস্থায় মুসলমানদের সকল মর্যাদা এবং সম্ভাবনা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। অথচ পূর্বে মুসলমানরাই সকল সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এই সময় হিন্দুরা সব রকম সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং ইংরেজি শিক্ষাকে তাহাদের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, মুসলমানরা বিদ্বেষপ্রসূত এই শিক্ষাকে বর্জন করে। যার ফলে তাহারা সরকারী চাকুরীর সুযোগ হারায় এবং দিন দিন তাহারা অধঃপতনের অন্ধকার স্পর্শে নিমজ্জিত হইতে থাকে। এখন সরকার যদি তাহাদের এই অবস্থায় ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হইবে এবং তাহাদের সম্ভ্রান্ত লোকরাও পেটের দায়ে অন্যের দ্বারস্থ হইবে। তখন একটি জাতির এই অধঃপতনের জন্য সরকার লজ্জিত হইবেন। এমতাবস্থায় একটি প্রগতিশীল ও জনকল্যাণকামী সরকারের উচিত তাহাদের হৃত অবস্থায় ফিরাইয়া আনা এবং সমাজে তাহাদিগকে বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করা। এবং আলিয়া মাদ্রাসার মত প্রতিষ্ঠানই এই উদ্দেশ্য যথার্থভাবে কার্যকরী করিতে পারিবে।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বর্তমানে মাদ্রাসার উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যাহত হইতেছে। ১৮২৪ সালে শিক্ষা কাউন্সিল মাদ্রাসায় যে সংস্কার কার্যকরী করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা করা সম্ভব হয় নাই। কারণ, মুসলমানরা ইহার বিরোধিতা করিয়াছিল। এতদসত্ত্বেও বর্তমানে মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া দেওয়া মোটেই সমীচীন হইবে না। কেননা মুসলমানদের বিশ্বাস, এই প্রতিষ্ঠানটি তাহাদের কল্যাণের জন্যই রহিয়াছে। তাছাড়া মাদ্রাসাকে বিশেষভাবে আরবী শিক্ষার জন্যও বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। তবে ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া 'আরবী কলেজ' রাখিতে হইবে। এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগও যেমন ছিল তেমনই থাকিবে। কেননা, এই বিভাগের সাফল্য বেশ উল্লেখযোগ্য। মুসলমানরা এই বিভাগটির প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট। ১৮৫৩ সালের পূর্বে মাদ্রাসার বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ ছিল বত্রিশ হাজার টাকা। কিন্তু পরবর্তী বৎসরে উহা বাড়াইয়া ৩৩ হাজার দুই শত টাকায় উন্নীত করা হয়। মাদ্রাসার উভয় বিভাগের সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৭৩ জন। অতএব প্রতিটি ছাত্রের পেছনে সরকারের ব্যয়

www.waytojannah.com

১৮৫ টাকার মত। এই ব্যয় যদিও বেশি মনে হয়, কিন্তু বৃহৎ স্বার্থের খাতিরে উহা খরচ করা হয়। যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহলে বুঝব এই ব্যয় সঠিকভাবে করা হইয়াছে।[৪৪]

শিক্ষা কাউন্সিলের সংস্কার অভিযান মাদ্রাসায় কেন কার্যকরী হয় নাই, মি. লিজ সে ব্যাপারে নিম্নোক্ত কারণ দর্শাইয়াছেন।

১. সংস্কার ও সংশোধনী কার্যকরী করার ব্যাপারে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা ছিল সীমিত।

২. হেড মওলবীর অসহযোগিতা।

৩. শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতির গোঁড়ামি। প্রথমত তাহারা আধুনিক নিয়মে শিক্ষাদানের ব্যাপারে অযোগ্য, দ্বিতীয়ত তাহারা যে পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন সেই পদ্ধতি তাহারা ছাড়িতে চান না।

মাদ্রাসা বন্ধ করিবার প্রস্তাব

মি. লিজের রিপোর্টের সহিত পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের ডিরেক্টর মিঃ ডব্লু গোর্ডন একমত ছিলেন না। বরং মি. লিজের রিপোর্টের জবাবে মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া দেওয়ার মন্তব্য করেন এবং তাহা লেঃ গভর্নরের কাছে প্রেরণ করেন। লেঃ গভর্নর উক্ত নোট পাইয়া গভর্নর জেনারেলকে লেখেন যে, অচিরেই মাদ্রাসার আরবী বিভাগ বন্ধ করা হউক এবং এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ যথা নিয়মে চালু থাকিবে। আরবী শিক্ষার জন্য এরাবিক প্রফেসরশীপ অথবা উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া হউক অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজে উহার একটি বিভাগ খোলা হউক। আরবী শিক্ষার জন্য এতটুকু বন্দোবস্তই যথেষ্ট।

গভর্নর জেনারেল কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

গভর্নর জেনারেল লেঃ গভর্নরের সমুদয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং লেঃ গভর্নরকে এব্যাপারে হুঁশিয়ার করিয়া দিবার জন্য নোট দেন। সরকারের সেক্রেটারী মি. ডব্লু গ্রে এই মর্মে জনশিক্ষার ডিরেক্টরকে এক চিঠিতে (নং ১২১৯ তাং ২রা জুলাই ১৮৬০) জানান ঃ

"গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল মনে করেন, লেঃ গভর্নর মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য যে সব যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ কল্যাণ বিরোধী। আলিয়া মাদ্রাসার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি যে সব মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তিনি ইহাও মানিতে প্রস্তুত নহেন যে, মাদ্রাসার ছাত্ররা বাংলাদেশের লোকদের মাঝে ভ্রান্ত ধারণার বীজ বপন করিতেছে এবং ইহাতে বিরাট

৪৪. Past and Present of Bengal, Vol VIII, June and March 1914.

www.waytojannah.com

এরকম রাজনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টির সম্ভাবনা রহিয়াছে। লেঃ গভর্নরের এই কথার মাঝেও সত্যের অপলাপ রহিয়াছে যে, মাদ্রাসাটি সন্ত্রাস এবং গোলযোগের কেন্দ্রস্থল। গভর্নর জেনারেল এব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন যে, যাহারা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়াশুনা করিয়াছে তাহারা সিপাহী বিপ্লবের সময় অংশগ্রহণ করেন নাই পরন্তু এই দাঙ্গা নিবৃত্ত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন (অর্থাৎ নওয়াব আবদুল লতিফ সি, আই, এ)।

মোটকথা, এভাবে মাদ্রাসা বন্ধের প্রস্তাব সম্পূর্ণ নস্যাৎ হইয়া যায়; পরন্তু ১৮৩৫ সালে শিক্ষা কাউন্সিল যে সংস্কার স্কীম তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহাকে কার্যকরী করার চেষ্টা চলে এবং এব্যাপারে মাদ্রাসার প্রিন্সিপালকে আরো বেশি ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

মিঃ লিজের দ্বিতীয় রিপোর্ট

১৮৬০ সালে জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরকে প্রদত্ত মাদ্রাসার সংস্কার সম্পর্কিত মিঃ লিজের আরো একটি রিপোর্টের সন্ধান পাওয়া যায়। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে ঃ

মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ বেশ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। প্রতি বৎসর এই বিভাগ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র প্রেরণ করা হইতেছে। ১৮৫৮ সালের সংস্কারের পর আরবী বিভাগেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অতএব আপাতত আর কোন নূতন সংস্কারের প্রয়োজন নাই। মাদ্রাসার কার্যক্রম নির্বিবাদে চলিতেছে। এইসময় নূতন করিয়া কোন সংস্কারের প্রশ্ন তুলিলে ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে গোলযোগ দেখা দিবে। আরবী বিভাগের অধ্যাপকরা ভাবিতে শুরু করিয়াছেন যে, সরকার সংস্কারের নামে যে তৎপরতা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের স্বজাতির কল্যাণের জন্যই তাহা করিতেছেন। অতএব কোন অধ্যাপক সম্পর্কেও কোন অভিযোগের অবকাশ নাই। তবে নিসন্দেহে আরবী বিভাগ যেমন থাকার দরকার তেমনটা নাই। তবে ইহার চেয়েও ভালো করিতে হইলে উৎকৃষ্ট শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাইবে?

প্রিন্সিপালের আরো একটি প্রস্তাব

মাদ্রাসার শিক্ষা সম্পর্কে প্রিন্সিপাল আরো একটি নূতন প্রস্তাব পেশ করেন যে, এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ হইতে ছাত্ররা জুনিয়র স্কলারশীপে উত্তীর্ণ হইলে ঐচ্ছিকভাবে তাহারা আরবী বিভাগে ভর্তি হইতে পারিবে। তবে তাহাদেরকে এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের শেষ দুই বর্ষে ইল্‌মে নহু ও ছরফ পড়িতে হইবে। জুনিয়র স্কলারশীপ প্রাপ্তির পর ছাত্ররা আরবী বিভাগ বা উচ্চতর কলেজ যেখানেই ভর্তি হইবে তাহাদের বৃত্তির কোন রকম ব্যাঘাত হইবে না।

www.waytojannah.com

লেঃ গভর্নর প্রিন্সিপালের এই প্রস্তাব মানিয়া নেন। কিন্তু শেষ দুই বর্ষে ইল্‌মে নহু ও ছরফ পড়ার প্রস্তাবটি বিবেচনাধীন রাখিলেন। কেননা, এই বিভাগের ছাত্রদেরকে ইংরেজির সহিত ফারসী পড়িতে হয়। তদুপরি আরবীর নহু ছরফ পড়িতে দিলে তাহাদের পাঠ্যের বোঝা ভারী হইয়া যাইবে। বরং আরবী বিভাগের প্রারম্ভেই উক্ত নহু ছরফ ইত্যাদির জন্য বাড়তি প্রাথমিক ক্লাসের পত্তন করা যাইতে পারে।

প্রিন্সিপাল লিজ মাদ্রাসা সংক্রান্ত আরো একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন। এই রিপোর্টে তিনি মাদ্রাসার আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত সন্তোষজনক বলিয়া জানান এবং মাদ্রাসার মৌলিক আরবী বিভাগের পুনরায় কোন সংস্কার বা সংশোধনের কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া জানান।

আলিয়া মাদ্রাসা উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষায়তন। বাংলাদেশের সকল শিক্ষাবিদ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব এই ঐতিহ্যময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির মৌলিক রূপ বিকৃত করা উচিত হইবে না।

এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই বিভাগ হইতে ছাত্ররা পাস করিয়া প্রতি বছর ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিয়া এন্ট্রাস পাস করে এবং অতঃপর উচ্চশিক্ষার্থে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়। আমি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশে তুলনামূলক আরবী তথা মুসলিম শিক্ষার মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিয়াছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের কোন ছাত্র আরবী বিভাগে ভর্তি হয় নাই। তাহারা বরং এই বিভাগ হইতে সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইতে শুরু করিয়াছে। মাদ্রাসার প্রতি তাহাদের মনোযোগ খুবই কম। কেননা, মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকায় ইহার গুরুত্ব খুবই কম মনে হয়। অতএব মাদ্রাসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করিলে এই ছাত্ররা এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ শেষ করিয়া মাদ্রাসার আরবী বিভাগে ভর্তি হইবে।

বলাবাহুল্য, ইতিমধ্যে সংস্কৃত কলেজসহ সকল উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু আলিয়া মাদ্রাসাকে এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করা হয় নাই। এইজন্য লেঃ গভর্নর সংস্কৃত কলেজের মিঃ কোয়েলকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মাদ্রাসার অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি তদন্ত করিয়া রিপোর্ট পেশ করার জন্য নির্দেশ দেন। এবং প্রদেশের সাধারণ শিক্ষার পাশে আরবী শিক্ষার অবস্থান সম্পর্কেও বিশেষভাবে মতামত ব্যক্ত করার জন্য বলেন। কিন্তু মিঃ কোয়েল লেঃ গভর্নরের এই আদেশ পালন করিতে অসম্মতি জানান এবং বলেন যে, তিনি বরং সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে যদি কোন রিপোর্ট দিতে বলেন মিঃ কোয়েল তাহা স্বচ্ছন্দে দিতে পারেন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ও আলিয়া মাদ্রাসা

মাদ্রাসাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াসের পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সিপাহী বিপ্লব। প্রশাসন কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল, মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা তাদেরকে হীন এবং ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে গড়িয়া তোলে। এই সিপাহী বিদ্রোহের পিছনে আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বিশেষ হাত রহিয়াছে। অতএব আগামীতে যেন কোনরূপ ষড়যন্ত্র বা বিপ্লব দানা বাঁধিয়া উঠিতে না পারে সেজন্য মাদ্রাসাকে অচিরেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করিলে মাদ্রাসা সাধারণ শিক্ষায় রূপান্তরিত হইবে এবং চিরতরে মাদ্রাসার অস্তিত্ব বিলোপ হইয়া যাইবে। কিন্তু ভারত সরকারের অসহযোগিতার ফলে এই সব ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

কিন্তু তারপরও প্রিন্সিপাল লিজ আরও একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। তিনি এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগকে আরো উন্নত করিয়া আরবী বিভাগ হইতে ফেকা, মনতেক ও ফালসাফা খারিজ করিবার প্রস্তাব করেন। যাহার ফলে আরবী বিভাগ ক্রমন্বয়ে এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে হজম হইয়া যাইবে এবং এইভাবে মাদ্রাসা পাশ্চাত্য শিক্ষায় রূপান্তরিত হইয়া যাইবে।

প্রিন্সিপাল ও লেঃ গভর্নরের টাগ অব ওয়ার

লেঃ গভর্নরের ইচ্ছা ছিল মাদ্রাসা সমূলে বিলুপ্ত করিয়া দিবেন। কিন্তু ভারত সরকারের বিরোধিতার দরুন তাহার ইচ্ছা ফলবতী হইতে পারিল না। তদুপরি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাদ্রাসা সংক্রান্ত যেসব রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহা মাদ্রাসার অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ন রাখিবারই প্রয়াস।

লেঃ গভর্নর স্যার সিসিল বেডেন ও তাঁহার সেক্রেটারী মিঃ গ্রে অতঃপর জিদ ধরিলেন যে, মাদ্রাসা বিলুপ্ত করিতেই হইবে এবং ইহার স্বপক্ষে দলিল পেশ করিলেন যে, ১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক বলিয়াছেন, 'মাদ্রাসা শিক্ষা সরকারের কোন উপকারে আসিতেছে না। অতএব মাদ্রাসার পিছনে অর্থ ব্যয় করা অনুচিত এবং অচিরেই মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।'

এই ভাবে প্রাদেশিক সরকার ও মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের মাঝে দীর্ঘকাল যাবত এই টানাহেচড়া চলিল। অতঃপর প্রিন্সিপাল সরাসরি বাংলা সরকারকে জানাইয়া দিলেন যে, আমি যতদিন এই প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল পদে আছি মাদ্রাসা বন্ধ করিতে দিব না। অতঃপর এইভাবে এই দোটানা আস্তে আস্তে স্তিমিত হইয়া আসে এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রিন্সিপালের পক্ষে মত পোষণ করেন।

www.waytojannah.com

মুসলমান কাযী নিয়োগ ব্যবস্থা বাতিল

১৮৬৪ সালে ভারত সরকার ১০ নং একটি বিধি অনুযায়ী মুসলমান কাযী এবং পরিসংখ্যানবিদ (এসেসর) নিয়োগ বাতিল করিয়া দেন। এতকাল বিচারালয় গুলিতে জজের সহিত কাযীও কাজ করিতেন এবং এই পদে আলিয়া মাদ্রাসা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদেরকেই নিয়োগ করা হইত। এই বিধি জারি হইবার পর মুসলমানদের জীবিকার সংস্থান সংকুচিত হইয়া আসিল। এই বিধি জারির দরুন ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক জীবনের বিপর্যয় সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক হান্টার বলেন ঃ

'আমাদের প্রতি মুসলমানদের ইহাও একটি অভিযোগ যে, আমরা তাহাদের শুধু যে আইন পেশা হইতে বহিষ্কার করিয়াছি তাহা নহে বরং আইনগতভাবে তাহাদের ধর্মীয় এবং ব্যক্তি সংক্রান্ত স্বাধিকার পূরণের আশা হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। ইসলামী সাম্রাজ্যে কাযীর দায়িত্বে ফৌজদারী, দেওয়ানী এবং ধর্মীয় আদালতের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা যখন এই দেশ অধিকার করি, প্রথম দিকে আমরা বিচার বিভাগ চালু রাখিবার জন্য ইহাদের উপর ভরসা করিয়াছিলাম। আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ের শাসনতন্ত্রের আওতায় মুসলমানদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আমরা কাযীর পদ বলবৎ রাখিয়াছি। কাযীদের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে ভারতীয় শাসন বিধিতে ২৫টি বিশদ উপধারা রহিয়াছে। (বেঙ্গলকোড, আর, ৪–১৭৯৩ ও আর ১২ ইত্যাদি)।

প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে কাযীর গুরুত্ব এতই অপরিসীম যে, এই বিষয়ে মুসলমানরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, যতদিন দেশে কাযী প্রথা বলবৎ থাকিবে ভারতকে 'দারুল ইসলাম' আখ্যায়িত করা যাইবে। এবং যখন এই পদ বিলুপ্ত হইবে তখন ইহাকে 'দারুল হরব' বলা হইবে। মুসলমানদের অসন্তোষের দরুন বাধ্য হইয়া আমাদেরকে তাহাদের প্রকৃত ইচ্ছা ও দাবি তদন্ত করিতে হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশত এই তদন্ত হালেই শুরু করা হইয়াছে এবং বহু বাদানুবাদের পর পুরনো আইন বাতিল করিয়া কাযী নিয়োগের প্রথা বাতিল করা হয়। ইহার ফলে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান এবং বড় একটি গোষ্ঠী এমন কতগুলি পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন যাহা মুসলমানদের বিবাহ-শাদী ও অন্যান্য পারিবারিক কার্য সম্পন্নের বেলায় নেহাত জরুরী। প্রথম দিকে এই সমস্যা তেমন প্রকট আকার ধারণ করে নাই। কেননা তখনো অনেক পুরনো কাযী বাঁচিয়া ছিলেন। তাহাদের পরলোকগমন বা পেনশন প্রাপ্তির পর উক্ত পদে পুনরায় আর কাযী বহাল করার অবকাশ ছিল না।

www.waytojannah.com

মাদ্রাসায় কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

১৮৬৬ সালে মুসলমানরা সরকারের কাছে এই মর্মে দাবি জানায় যে, এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগকে আরো সম্প্রসারণ করিয়া তাহাকে কলেজে উন্নীত করা হউক। সরকার তাহাদের এই আবেদন মানিয়া নেন এবং যথা নিয়মে কলেজ চালু করেন। কিন্তু এই কলেজ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই এবং অচিরেই কলেজ বন্ধ করিয়া দিতে হইল। প্রথম বৎসরে মাত্র ছয়জন ছাত্র ভর্তি হইয়াছিল। পরবর্তী বৎসরে তাহারা মাত্র তিনজন ছিল এবং শেষাবধি তাহারাও কাটিয়া পড়িল।

ইহার পর মাদ্রাসাতে একজন ফুলটাইম ইংরেজ প্রফেসরের অবস্থানের উপর প্রস্তাব আনয়ন করা হয়। কিন্তু ছাত্ররা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করে। মাদ্রাসায় ইংরেজি প্রফেসরের প্রবেশাধিকার কোনক্রমেই তাহারা বরদাশ্‌ত করিবে না। কিন্তু ছাত্রদের চোখে ধূলা দিয়া রাতারাতি একজন ইংরেজ প্রফেসরকে এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের হেডমাস্টার হিসাবে নিয়োগ করিয়া তাহার নিরাপত্তারও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

পুনরায় মাদ্রাসা তদন্ত কমিটি গঠিত

১৮৬৮-৬৯ সালে মাদ্রাসার বিখ্যাত প্রিন্সিপাল মিঃ লিজ কিছুকালের জন্য বিলাতে চলিয়া যান, এই সময় কলিকাতার 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া (বর্তমানের স্টেটস্‌ম্যান) পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, মাদ্রাসার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও পড়াশুনা সন্তোষজনক নয়। এইজন্য সরকারের একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত যাহাতে এই শিক্ষা মুসলমানদের জন্য ফলপ্রসূ হইতে পারে। এসময় স্বয়ং সরকারও মুসলমানদের শিক্ষা প্রসঙ্গে চিন্তাভাবনা করিতেছিলেন। কেননা ওহাবী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক আলেম ও মাদ্রাসার শিক্ষক ইংরেজদের সন্দেহভাজন হইয়াছেন এবং এই পুরনো রীতির শিক্ষা চালু থাকিলে অচিরেই মুসলমানরা অপর কোন বিপ্লব বাধাইয়া বসিবে, এই ছিল ইংরেজদের আশংকা। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসাটির পুংখানুপুংখ তদন্তের জন্য সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন ঃ

১. মিঃ সি এইচ ক্যাম্পবেল, প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার

২. মিঃ জে স্টেকলিফ, প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল।

৩. খান বাহাদুর মৌলবী আবদুল লতিফ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র।

www.waytojannah.com

কমিটির রিপোর্ট

তদন্ত কমিটি সরকারের কাছে মাদ্রাসা সংক্রান্ত যে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন উহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১. একথা সর্ববাদি সম্মত যে, মাদ্রাসার শিক্ষার মান অনেক নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছে। একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাদ্রাসার যে সুনাম এবং গাম্ভীর্য জনমনে ছিল তাহাও অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। মাদ্রাসার এই অবনতির পিছনে নিম্নোক্ত কারণগুলি বিশেষভাবে কার্যকরী ঃ

(ক) আট বৎসরের কোর্সকে পাঁচ বৎসরে সীমিত করা হইয়াছে।
(খ) অসামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক।
(গ) ছাত্রদের বৃত্তির যে অংক ধার্য করা হইয়াছে তাহা খুবই সামান্য।
(ঘ) শিক্ষকদের দক্ষতা এবং পাণ্ডিত্য অপ্রতুল।
(ঙ) বিচার বিভাগ হইতে তাহাদের বঞ্চিত করার দরুন এই শিক্ষার প্রতি তাহাদের আকর্ষণ কমিয়া গিয়াছে।
(চ) উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষায় কর্তৃপক্ষের অমনোযোগিতা।

বিচার বিভাগ ও অন্যান্য জীবিকার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হওয়ার পরও মুসলমানদের মনে আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিল অপরিসীম। কেননা, মাদ্রাসা শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হইল ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা। একমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার খাতিরেই মাদ্রাসার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রহিল। কিন্তু ধর্মীয় চেতনার পাশাপাশি এই শিক্ষার আর কোন পার্থিব উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না। এজন্য সমাজ সচেতন মুসলমানরা তাহাদের ছেলেদেরকে মাদ্রাসার মৌলিক (আরবী) বিভাগের বদলে এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে ভর্তি করিতে শুরু করিলেন। অতএব এমতাবস্থায় হয় মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক, অন্যথায় কমিটি মাদ্রাসার জন্য যে আমূল সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছে উহা অচিরেই কার্যকরী করা হউক।

এসময় যাহারা মাদ্রাসার বিরোধিতা করিতেন তাহাদের যুক্তি ছিল এই ধরনের যে, মাদ্রাসার এই অধঃপতনের জন্য বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারই দায়ী। কেননা, সরকার দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার করিয়া মাদ্রাসার গুরুত্ব দিন দিন ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছে। মাদ্রাসার উত্তরাধিকার আইন, হেবা, ওয়াক্‌ফ, বিবাহ, তালাক, যৌতুক, অসিয়ত ইত্যাদি বর্তমান বৃটিশ শাসিত ভারতে কার্যকরী করা মোটেই সম্ভব নয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, বর্তমানে মাদ্রাসায় যেসব বিষয় পড়ানো হয় শুধু পূর্ব-বাংলার ছাত্ররা ছাড়া আর কেহ ইহাতে উপকৃত হইতে পারে না। অথচ এজন্য হুগলীতেও একটি মাদ্রাসার পত্তন করা হইয়াছে। এই মাদ্রাসার খরচ জনৈক দানবীর হাজী মোহাম্মদ মোহসীন নিজে বহন করেন। আরবী শিক্ষাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য

www.waytojannah.com

হুগলী মাদ্রাসাই যথেষ্ট। কলিকাতার মাদ্রাসা তুলিয়া দিয়া বরং এখানকার ছাত্ররা যেসব বৃত্তি পাইত তাহা হুগলী মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ করা হউক। আলিয়া মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া দিবার প্রশ্নে যে বিতর্ক উঠিয়াছিল, কমিটি উহাতে একমত হইতে পারিলেন না। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও মুসলমানদের একান্ত প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন বিষয়াদি জানিবার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা অপরিহার্য। এইজন্য আরবী শিক্ষা না করিয়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও লোকেরা তাহা আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিবে। এইজন্য বেসরকারী মাদ্রাসাগুলিই যথেষ্ট। কিন্তু কমিটির সদস্যরা এখানে আসিয়াই একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, প্রাচ্য দেশীয় শিক্ষা চালু রাখিবার একটি দায়িত্বও সরকারের উপর রহিয়াছে এবং উহাতে আরবীও রহিয়াছে। অতএব মাদ্রাসা বন্ধ না করিয়া বরং মাদ্রাসার ফেকা সংক্রান্ত যেসব মসলা মাসায়েল আপত্তিকর এবং যুগোপযোগী বলিয়া মনে হইবে না উহা বাদ দেওয়া উচিত।

হুগলী মাদ্রাসা

হুগলী মাদ্রাসা সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মাদ্রাসার সবচেয়ে বড় দৈন্য ছিল এখানে কোন ছাত্রাবাসের বন্দোবস্ত ছিল না। কেননা, হিন্দুপ্রধান এলাকায় মাদ্রাসাটি অবস্থিত। এখানে মুসলমান ছাত্রদের জন্য কোন ছাত্রাবাস স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। অন্যথায় পড়াশুনার দিক হইতে এই মাদ্রাসার তুলনা হয় না। কেহ কেহ বলিত, হুগলী মাদ্রাসাই আরবী শিক্ষার জন্য যথেষ্ট, কলিকাতার মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

প্রিন্সিপাল পদ বিলোপের ষড়যন্ত্র

পূর্ব প্রস্তাবিত সংশোধনী ধারা কার্যকরী করিতে হইলে মাদ্রাসায় কতিপয় ইংরেজি শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে। আরবীর জন্য আর কোন শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে না। অতএব অতিরিক্ত খরচের প্রশ্নও রহিয়াছে। তাই প্রিন্সিপালের পদ বিলুপ্ত করিয়া এই খরচ বাঁচাইবার জন্য কমিটি ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কেননা, প্রিন্সিপাল স্বয়ং কোন ক্লাস নেন না, তাছাড়া তিনি নিয়মিত মাদ্রাসায় থাকেনও না। অন্যান্য ব্যক্তিগত কাজেই তিনি বেশি ব্যস্ত থাকেন। অতএব প্রিন্সিপালকে পদচ্যুত করিয়া সেস্থলে একজন যথাযোগ্য ব্যক্তিকে ' হেড মওলবী নিয়োগ করিলে কাজের অনেকটা সুরাহা হয়।

মাদ্রাসার দৈনন্দিন কার্যক্রম ও উন্নতি তদারক করিবার জন্য ইংরেজ এবং মুসলমান সদস্য বিশিষ্ট একটি পর্যবেক্ষক কমিটি নিয়োগের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করা হয়। এই কমিটি নিয়োগে দ্বিবিধ উপকার হইবে। এই কমিটিতে কলিকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে। তাহারা মাদ্রাসার কাজে স্বেচ্ছায় মনোযোগ দিবেন এবং দেশের শিক্ষা প্রসঙ্গে তাহাদের কণ্ঠও শোনা যাইবে। এবং এই পদ্ধতিতে সাধারণ মুসলমানদের সমর্থনও থাকিবে।

www.waytojannah.com

হুগলী মাদ্রাসার সংস্কার

হুগলী মাদ্রাসা সম্পর্কে কমিটির মতামত নিম্নরূপ ঃ

"যদিও এই মাদ্রাসা আমাদের তদন্তের আওতাধীন নয়, তবু এই মাদ্রাসা সম্পর্কেও আমরা কিছু বলিতে চাই। এই মাদ্রাসার সিলেবাস ও শিক্ষা পদ্ধতি আলিয়া মাদ্রাসারই অনুরূপ। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এই মাদ্রাসার সমুদয় খরচ সরকার বহন করে আর হুগলী মাদ্রাসা ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয়ে পরিচালিত হয়। অতএব আলিয়া মাদ্রাসার যেটুকু সংস্কার বা সংশোধন করা হইবে হুগলী মাদ্রাসাতেও ততটুকু করিতে হইবে। মুসলমানদের একান্ত ইচ্ছা, মহসীন ফান্ডের টাকায় যে সব কার্যক্রম পরিচালিত হইবে তাহা যেন সম্পূর্ণ জনকল্যাণ ভিত্তিক এবং যথার্থভাবে সম্পন্ন হয়।

মুসলমানদের শিক্ষার অবনতির পিছনে আরো একটি বিশেষ কারণ রহিয়াছে। মুসলমানদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মনে করেন, উর্দু ফারসী ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরকে জেলা কেন্দ্রের স্কুলগুলিতে নিয়োগ না করাও মুসলমানদের পশ্চাদপসারণের একটি বড় কারণ।

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশের সময় মাদ্রাসার বার্ষিক খরচের বাজেট ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রিন্সিপালের বেতন ঃ	৩৬০০ টাকা
আরবী বিভাগের ব্যয় ঃ	৫০৩৬ টাকা
ইংরেজি বিভাগের ব্যয় ঃ	২২,২৩০ টাকা
ব্রাঞ্চস্কুলের খরচ ঃ	৯৯৭৪ টাকা
	সর্বমোট ৪০,৮৪০ টাকা

এই ব্যয়ের ৪ হাজার ৮ টাকা ছাত্র বেতন হইতে উসুল হইত। এই রিপোর্টে ছাত্র সংখ্যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

আরবী বিভাগের চাত্রসংখ্যা ছিল ১১৫ জন। তন্মধ্যে ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ পূর্ববঙ্গের ছিল ৯১ জন। এই বিভাগের ২৮ জন ছাত্রকে মেধা অনুসারে বৃত্তি প্রদান করা হইত। এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩০০। তন্মধ্যে কলিকাতা শহরের ১৩৬ জন বাদ বাকি ছাত্ররা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে আসিয়াছে। যেমন ঃ ২৪ পরগণার ৬৮ জন, যশোহরের ১৫ জন, হুগলীর ৪৮ জন, বর্ধমানের ১৬ জন, ফরিদপুরের ১১ জন ও বারাসাতের ৭ জন। এ্যাংলো পার্সিয়ান সংলগ্ন কলেজের ছাত্রসংখ্যা এই সময় মাত্র ২ জন ছিল। এই বিভাগে আরবী, ফারসী ও ইংরেজি বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হইত।

www.waytojannah.com

তদন্ত কমিটির বিশেষ সুপারিশ

মাদ্রাসা সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহার বিশেষ কতগুলি ধারা নিম্নরূপ ঃ

১. প্রভাবশালী মুসলমান এবং ইংরেজদের নিয়া গঠিত একটি পর্যবেক্ষক কমিটি নিয়োগ করিত হইবে।

২. আরবী বিভাগকে কলেজে রূপান্তরিত করা হইবে। তবে এই বিভাগে একমাত্র আরবীসহ এন্ট্রান্স পাসকারী ছাত্রদের প্রবেশাধিকার থাকিবে।

৩. শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অধীনে মাদ্রাসা পরিচালিত হইবে। তবে পর্যবেক্ষক কমিটি শুধু ভালমন্দ দেখাশুনা করিবেন।

৪. প্রিন্সিপাল পদ বিলুপ্ত করিয়া হেড মৌলবীর দ্বারা সে কাজ পূরণ করিতে হইবে।

৫. আরবী শিক্ষকেরা উভয় বিভাগেই সমানভাবে বিচরণ করিবেন এবং ক্লাস নিবেন।

৬. এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের জন্য শুধু জুনিয়র টিচার মুসলমান নিয়োগ করিতে হইবে। কোনমতেই হিন্দু নিয়োগ করা হইবে না।

৭. ছাত্রদের কিছু বৃত্তি এ্যাংলো এরাবিক বিভাগ হইতে এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

৮. কলেজ চিরতরে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। মাদ্রাসার যেসব ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয় বা প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করিতে আগ্রহী তাহাদের বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

৯. উভয় বিভাগের যেসব ছাত্র ছাত্রাবাসে যাইতে ইচ্ছুক তাহাদের থাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে এবং তাহাদের দেখাশুনার ভার থাকিবে এ্যাংলো এরাবিক বিভাগের হেড মৌলবীর উপর। ব্রাঞ্চ স্কুল সম্পর্কে সুপারিশ করা হইয়াছে যে, অন্যান্য সাধারণ স্কুলের মত এইগুলিকে স্কুল ইন্সপেক্টরদের অধীনে দেওয়া হইবে।

উক্ত কমিটির এই তদন্ত চারিমাসে সম্পন্ন করা হয়। এই রিপোর্ট ও সুপারিশ ১৮৬৯ সালে লেঃ গভর্নরের খেদমতে পেশ করা হয়।

রিপোর্ট সম্পর্কে লেঃ গভর্নর

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরকে লিখিত উক্ত রিপোর্ট সম্পর্কে লেঃ গভর্নরের মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ

"আমি রিপোর্টের আদ্যপান্ত পাঠ করিয়া বুঝিলাম, তদন্ত কমিটি যৎপরনাস্তি পরিশ্রম ও মনোযোগ দিয়া এই কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন। এই রিপোর্ট পাঠ করার পর

www.waytojannah.com

মাদ্রাসার বর্তমান চিত্র আমার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাদ্রাসার শিক্ষা সত্যই ক্রমান্বয়ে নিম্নমানের দিকে ধাবিত হইতেছে। অতএব অনতিবিলম্বে এই প্রতিষ্ঠানের সংশোধন অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কমিটি মাদ্রাসার সবদিক সম্পর্কেই পর্যালোচনা করিয়াছে। কিন্তু আরবী বিভাগ সম্পর্কে তাহাদের ধারণা খুবই নেতিবাচক, তাহাদের ভাষায় নৈরাশ্য প্রকট। এই রিপোর্ট যিনি পাঠ করিবেন তিনিই মাদ্রাসার এই শিক্ষা পদ্ধতির অচিরেই সংস্কার কামনা করিবেন। বর্তমানে মাদ্রাসায় যেসব পাঠ্যপুস্তক রহিয়াছে তাহা যেমন যুগোপযোগী নহে তেমনি মাদ্রাসার শুভানুধ্যায়ীদেরও মনঃপুত নহে। ছাত্রবৃত্তি, শিক্ষাপদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষক এবং কর্মচারীদের কার্যক্রম—মোটকথা, কোন দিনই সুষ্ঠু এবং সন্তোষজনক নয়।

লেঃ গভর্নর অতঃপর এই তদন্ত কমিটির রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশকৃত সংস্কার কার্যকরী করার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত তাহার মতামত জানিতে চাহেন।

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এটকেনসন প্রতি উত্তরে জানাইলেন যে, তিনি কমিটির সকল সুপারিশকে স্বাগত জানান এবং অধিকাংশ সংস্কার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। সর্ব প্রথমে তিনি প্রিন্সিপাল পদ বিলুপ্তিকে অভিনন্দিত করেন এবং সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে পরিচালিত হইতে পারে এজন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপালের অধীনে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। একটি উপদেষ্টা কমিটির অধীনে প্রেসিডেন্সী কলেজের মত এই মাদ্রাসাও পরিচালিত হইবে।

প্রিন্সিপাল পদ বিলুপ্তির পূর্বেই মি. লিজ ছুটি গ্রহণ করিয়া বিলাত চলিয়া যান। অতঃপর সে স্থলে মেজর সেন্ট জর্জকে নিয়োগ করা হয়। তিনিও ঘটনাক্রমে তখন বিলাতে ছুটি যাপন করিতেছিলেন। অতএব প্রিন্সিপাল পদে কেহই কার্যত ছিলেন না। ডিরেক্টরের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ সাটক্লিফকে এক নির্দেশে জানানো হয় যে, তিনি যেন অচিরেই মাদ্রাসার দায়িত্ব সামলাইয়া নেন। একটি উপদেষ্টা কমিটির অধীনে তিনি নিয়মিত মাদ্রাসা পরিচালনা করিবেন। মি. লিজ যদিও ছুটি যাপন করিতেছিলেন, কিন্তু মাদ্রাসার এই রদবদলের কথা শুনিয়া তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু সরকারী নির্দেশের উপর তাহার কিছু করার ছিল না, অতএব এইভাবে মি. সাটক্লিফ এক সঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত হন।

মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি

লেঃ গভর্নর স্যার উইলিয়াম গ্রে তদন্ত কমিটির সমুদয় রিপোর্ট, এই সম্পর্কিত কতিপয় চিঠি, মি. লিজের বিরোধিতার বিবরণ ও লিজের মতামত ব্যক্ত করিয়া

www.waytojannah.com

মাদ্রাসার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য ভারত সরকারের কাছে ফাইল প্রেরণ করেন। ভারত সরকার লেঃ গভর্নরের মতামত অনুমোদন করেন এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি (২৪ শে মার্চ, ১৮৭১ সাল) ম্যানেজিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই কমিটির অধীনে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ও হুগলী মাদ্রাসা থাকিবে।

কমিটির সদস্যদের নাম নিম্নরূপ ঃ

১. অনারেবল মি. জাস্টিস নরম্যান
২. মি. সি এইচ ক্যাম্পবেল
৩. মি. জে সাটক্লিফ
৪. মি. এইচ এল হেরিসন
৫. ক্যাপ্টেন এইচ. এস. জিরাট
৬. প্রিন্স এম. ডি. রহিমুদ্দিন
৭. কাজী আবদুল বারী
৮. মুন্সী আবদুল লতিফ খান বাহাদুর
৯. মৌলবী আব্বাস আলী খান।

কেন্দ্রীয় সরকার জনশিক্ষা ডিরেক্টরকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, ১৮৬৯ সালে যে সংস্কার অভিযান অনুমোদিত হয়, উপরোক্ত কমিটি বর্তমানে সেই কাজ সম্পাদন করিবেন।

এই নব নির্বাচিত কমিটি ১৮৭১ সালের ১৫ই এপ্রিলে আলিয়া মাদ্রাসা ভবনে প্রথম বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে জাস্টিস নরম্যানকে কমিটির সভাপতি ও মৌলবী আব্দুল লতিফ খান বাহাদুরকে যথাক্রমে অনারারী সেক্রেটারী মনোনীত করা হয়। এই কমিটি সপ্তাহে দুইবার মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কমিটির অন্যতম সদস্য মি. ক্যাম্পবেল ছুটি যাপন উপলক্ষে বিলাত চলিয়া গেলে কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী হাজী মোহাম্মদ জাকারিয়াকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

কমিটির উদ্দেশ্যে লেঃ গভর্নরের চিঠি

(১) অনুগ্রহ পূর্বক যাহারা এই কমিটির সদস্যভুক্ত হইয়া কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার তত্ত্বাবধান করিতে রাজী হইয়াছেন তাহাদের কাছে আমি শোকরিয়া জানাই। কমিটির উদ্দেশ্যে কতগুলি প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন বোধ করিতেছি। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের উদ্দেশ্যে পূর্বতন কমিটি যে বিষয় আলোচনা ও নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে সকল বিষয়ই সুস্পষ্ট রহিয়াছে। পুনরায়

www.waytojannah.com

তাহা ব্যাখ্যা করিবার অবকাশ নাই। অবশ্য যে সব নীতি প্রয়োগ করিলে সামগ্রিকভাবে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কাঠামো বিকৃত হইবে সে সব বিষয়ে কিছু চিন্তা করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। আমি আশা করি বর্তমান কমিটি শুধু যে মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানের কাজেই সকল শ্রম নিয়োগ করিবেন তাহা নহে বরং এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল দোষক্রটি অবলোকন করিবেন এবং এব্যাপারে সময়ান্তরে আমাকে অবহিত করিবেন। এই ব্যবস্থার আংশিক পরিবর্তন বা আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন রহিয়াছে কিনা সে বিষয়ও চিন্তা করিবেন। এই কমিটিতে সাবেক কমিটির কতিপয় সদস্যও রহিয়াছেন। অতএব আমি মনে করি এই কমিটির সিদ্ধান্ত এবং মতামত কল্যাণমুখী হইবে। এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়াকে যথারীতি অবহিত করা উচিত হইবে। এ ব্যাপারে কমিটির নিম্নোক্ত সমস্যাবলী নিয়া সর্বাগ্রে পর্যালোচনা করিবেন বলিয়া আমি মনে করি।

(ক) আলিয়া মাদ্রাসা ও হুগলী মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক কি একই থাকিবে, না আলাদা করিতে হইবে?

(খ) উভয় মাদ্রাসার মান কি একই পর্যায়ের হইবে?

(গ) আলিয়া মাদ্রাসায় শুধু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পর্যন্ত ক্লাস থাকিবে এবং হুগলী মাদ্রাসা কলেজের মান পর্যন্ত ক্লাস থাকিবে, না তাহার বিপরীত কোন বন্দোবস্ত থাকিবে?

(ঘ) হুগলী কলেজ কি অন্যান্য সাধারণ কলেজের মত হইবে, না কোন কলেজের সহিত একটি মাদ্রাসাও সংশ্লিষ্ট থাকিবে অথবা শুধু মোহামেডান কলেজের শিক্ষা হিসাবে চালু করিতে হইবে?

(ঙ) কমিটি যদি মনে করেন যে, মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা হুগলী কলেজের বদলে আলিয়া মাদ্রাসায় প্রবর্তন করা হউক, অথবা মাদ্রাসাকে উন্নত করিয়া একটি উচ্চ শিক্ষার কলেজে রূপান্তরিত করা হউক এবং এজন্যই একজন প্রিন্সিপাল নিয়োগ করা হউক তাহলে এই সংক্রান্ত খরচপত্র নির্বাহের প্রশ্নে কমিটি কি পন্থা অবলম্বন করিতে বলেন?

(চ) হুগলী মাদ্রাসার ফান্ডের কিছু আমদানী যদি আলিয়া মাদ্রাসার খরচ নির্বাহের জন্য বরাদ্দ করা হয় তাহলে কমিটি কি দ্বিমত পোষণ করেন অথবা ইহাতে মুসলমানদের মাঝে কোন অসন্তোষ দেখা দিবে কিনা?

(ছ) যদি শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয় তাহলে হুগলী মাদ্রাসার পরিস্থিতি কি দাঁড়াইবে?

www.waytojannah.com

(২) আলিয়া মাদ্রাসার সাম্প্রতিক সমস্যা প্রিন্সিপাল পদ নিয়া। কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া এই পদ বিলুপ্ত করা সম্ভব। তাছাড়া মাদ্রাসার শিক্ষক, পাঠ্য বিষয় ও ছাত্রবেতনের পরিমাণ সম্পর্কেও কমিটির একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করা উচিত।

(৩) ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যাহারা আরবী শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল এই ধরনের ধর্মপ্রাণ মানুষদের উপকারের জন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু আরবী পাঠ্য বিষয় হইতে এমন সব অধ্যায় বা পুস্তক বর্জন করিতে হইবে যাহা যথার্থই ভাবাবেগের সূত্রপাত করে এবং সরকারের বিরুদ্ধে লোকদের মনে বিদ্রোহের দাবানল প্রজ্বলিত হয়। এই ব্যাপারে কমিটি মুসলমানদের জনমতের অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় দিক নিয়েই বিবেচনা করিয়া একটি সঠিক রাস্তা বাহির করিবেন।

(৪) পাঠ্য বিষয়ে অধিকতর বিষয় সন্নিবেশিত না করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে । কারণ ইহাতে ছাত্রদের পাঠের বোঝা ভারী হইয়া যায়। ছোট ছেলেদের জন্য মাতৃভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে। অতঃপর তাহারা ক্রমান্বয়ে নিজেদের ধর্মীয় ভাষা আরবী এবং মুসলমানদের প্রিয় ভাষা ফারসী পড়াশুনা করিবে। এই দুইটি ভাষার একটি ভাষা ঐচ্ছিক হিসাবে গ্রহণ করার পূর্ণ অধিকার তাহাদের থাকিবে। অতঃপর দেশের চাহিদা অনুযায়ী এবং মুসলমানদের চাকুরী প্রাপ্তি প্রশ্নে তাহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত ইংরেজি পাঠে মনোনিবেশ করিবে। ইংরেজি শিখিতে যাইয়া তাহারা ড্রইং, সার্ভে প্রি ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদিও শিখিবে।

(৫) আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইল যে, বহিরাগত ছাত্রদের জন্য থাকিবার কি বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে? তাছাড়া বাংলাদেশের অজপাড়াগাঁয়ে যেসব ছোটখাট মাদ্রাসা আছে সেসব মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কিভাবে সহযোগিতা করা যাইতে পারে? হুগলী মাদ্রাসা সম্পর্কে সকল প্রশ্নই এখন অবান্তর। সেখানকার শিক্ষার সঠিক রূপ কি হইবে উহা আগে নির্ধারণ করিতে হইবে।

স্বাক্ষর ঃ জে ক্যাম্পবেল

১৩ই এপ্রিল, ১৮৭১ ইং

এই চিঠিপ্রাপ্তির পর কমিটি উপর্যুপরি দশটি বৈঠকে মিলিত হন এবং গভর্নরের চিঠির আলোকে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান পূর্বক একটি রিপোর্ট জনশিক্ষা ডিরেক্টরের মাধ্যমে লেঃ গভর্নরের নিকট প্রেরণ করেন।

www.waytojannah.com

ম্যানেজিং কমিটির রিপোর্ট

মওলবী আবদুল লতিফ খান বাহাদুর
সেক্রেটারী, ম্যানেজিং কমিটি,
আলিয়া মাদ্রাসা কলিকাতা ও
হুগলী মাদ্রাসার পক্ষ হইতে

খেদমতে জনাব
ডিরেক্টর, জনশিক্ষা বিভাগ, লোর প্রদেশ
নং ৮৭৮ তাং ২৪ শে মার্চ ১৮৭১ সাল

মাদ্রাসার সংস্কার সম্পর্কিত যে সুপারিশ করা হইয়াছে উক্ত কমিটি সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বৈঠকে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া এই রিপোর্ট তৈয়ার করিয়াছে।

১) কমিটি ১৮৬৯ সালের সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া কার্যক্রমের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ইতিমধ্যে লেঃ গভর্নর বাহাদুরের বিশদ নির্দেশ সম্বলিত একটি চিঠি হস্তগত হওয়ায় কমিটি অতঃপর কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রতি মনোযোগী হয়। কমিটি এই সম্পর্কিত সকল সমস্যা পুংখানুপুংখরূপে পর্যালোচনা করেন এবং সবিস্তার মতামত প্রদান করেন।

২) মাদ্রাসার আরবী বিভাগের নাম আগামীতে 'এ্যাংলো এরাবিক ডিপার্টমেন্ট' নামে অভিহিত করা হইবে।

৩) মাদ্রাসার উভয় বিভাগে সকল সময়ে ছাত্রদের ভর্তি চলিবে।

আরবী বিভাগের ভর্তির পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব হেড মওলবীর উপর এবং ইংরেজি বিভাগের দায়িত্ব থাকিবে হেড মাস্টারের উপর।

আরবীর অষ্টম মান ক্লাসে (জামাতে হাস্তম) ভর্তির জন্য প্রার্থীদের আরবী হরফ, নহুর প্রাথমিক জ্ঞানসহ সামান্য ফারসী পড়ার দক্ষতা এবং পর্যাপ্ত উর্দু জানা অপরিহার্য থাকিবে। ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের কমিটির সদস্যদের কোন একজনের দ্বারা সচ্চরিত্রের সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে। নূতন ছাত্রদের নামের তালিকা প্রতিমাসে কমিটির কাছে পেশ করিতে হইবে। মাদ্রাসার সময়কাল থাকিবে সকাল দশটা হইতে ১টা পর্যন্ত এবং বিকাল দেড়টা হইতে ৪টা পর্যন্ত। ১টার পর বিরতিকালে ছাত্ররা নাস্তা, নামায এবং হাঁটাচলা করিবে। নিম্নমানের চারটি ক্লাসে দৈনিক তিন ঘন্টা আরবী, দুই ঘন্টা ইংরেজি এবং দেড়ঘন্টা ফারসী, বাংলা ইত্যাদি পড়ানো হইবে। ইংরেজির পাঠ্য পুস্তক জনশিক্ষা ডিরেক্টর মহোদয় অনুমোদন করিবেন এবং যথাসম্ভব তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সুসমঞ্জস হইতে হইবে।

www.waytojannah.com

৪) বিভিন্ন ক্লাসে ছাত্রদের বয়ঃসীমা নিম্নরূপ থাকিবে ঃ

ক্লাস	ভর্তির বয়স	সর্বোচ্চ বয়স
অষ্টম (হাস্তম)	১৩ বছর	১৫ বছর
সপ্তম (হাপ্তম)	১৪ বছর	১৬ বছর
ষষ্ট (শশম)	১৫ বছর	১৭ বছর
পঞ্চম (পাঞ্জম)	১৫ বছর	১৮ বছর
চতুর্থ (চাহারম)	১৫ বছর	১৯ বছর
তৃতীয় (ছুয়াম)	১৫ বছর	২০ বছর
দ্বিতীয় (দুয়াম)	১৫ বছর	২১ বছর
প্রথম (উলা)	১৫ বছর	২২ বছর

৫) পাঠ্য পুস্তক ঃ

জংগে ছরফ, ফসূলে আকবরী, জংগে নহু, হেদায়াতুন নহু, কাফিয়া, শরহে জামি, মিজান মন্তেক, শরহে তাহজিব, কিবতী (হাশিয়া মীর সহ), ছল্লমুল উলুম, বালাগাত, মোখতাসারুল মায়ানী, মোল্লা, শরহে বেকায়া (তাহারাত, সালাত, যাকাত, সওম, হজ্জ, নেকাহ্, রেজা, তালাক, ঈমান, মফকুদ, শারকা ও ওয়াক্ফ অধ্যায়), হেদায়া (বুয়ূ, আকরার, হেবা, ইজারাত, জবায়েহ, আজিহা, আশরেবা ও ওহায়া অধ্যায়), নূরুল আনওয়ার, তাওজীহ মোছল্লমুস সবূত, নাফহাতুল ইয়ামন, আল আজবুল আজায়েব ছাবআ মুয়াল্লাকা, মাকামাতে হারিরি, দিওয়ানে মূতনব্বী, তারিখুল খোলাফা, শেফা (কাজী আয়াজ), শরিফা (ফরায়েজ) এখলাকে মোহসেনী, জোলায়খা, সেকান্দর নামা ও আবুল ফজল।

৬) কমিটির শিয়া ছাত্রদের জন্য আলাদা কোন পাঠ্যপুস্তকের বন্দোবস্ত করে নাই। কেননা, এ্যাংলো এরাবিক বিভাগে কোন শিয়া ছাত্র নাই। যদি কালেভদ্রে এই বিভাগে শিয়া ছাত্র ভর্তি হয় তাহলে একজন শিয়া শিক্ষকের অধীনে তাহাদের নিম্ন লিখিত পুস্তকাদি পড়ানো হইবে ঃ

১) শরায়েউল ইসলাম ২) শরহে লাম্মা।

৭) কমিটির ইচ্ছা, উপরের চারটি ক্লাসে সপ্তাহে দুই ঘন্টা করিয়া বাংলা পড়ানো হইবে। পরন্তু কমিটির ইহাও একান্ত ইচ্ছা যে, ছাত্ররা বাংলা ও উর্দুতে এতখানি পারদর্শী হইবে যে, স্বচ্ছন্দে যেন উহারা ইংরেজি তর্জমা অথবা ইংরেজি হইতে উক্ত দুই ভাষায় তর্জমা করিয়া ফেলিতে পারে। কেননা, এই ভাষা দুইটি আমাদের আদালতে ও কায়কারবারে ব্যবহৃত হয়।

www.waytojannah.com

৮) ১৮৬৯ সালে কমিশনের রিপোর্টে সুপারিশ করা হইয়াছে যে, উপরের দুইটি ক্লাসে ন্যূনপক্ষে সপ্তাহে দুই ঘন্টা দেওয়ানী ও ফৌজদারী সম্পর্কিত নির্বাচিত ধারাবলী সম্পর্কে উর্দু অথবা বাংলায় লেকচার দেওয়ার বন্দোবস্ত করা উচিত। এই প্রস্তাবটি আমাদের কিমিটিও যথাযোগ্য মনে করে এবং উহা প্রবর্তন করিতে কোন বাধা নাই।

৯) প্রাথমিক চারিটি ক্লাসে বাংলার পাঠ্যপুস্তক নিম্নরূপ হইবে ঃ

	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী
১.	বর্ণ পরিচয় (১ম ও ২য়)	বোধোদয়	আখ্যান মঞ্জুরি (২য়)	সীতার বনবাস
২.	কথামালা	আখ্যান মঞ্জুরি (১ম)	চারুপাঠ (১ম) ও ব্যাকরণ	চারুপাঠ (২য়) ও ব্যাকরণ

১০) ছুটি ঃ

১৮৬৯ সালের প্রস্তাব অনুযায়ী মাদ্রাসার ছুটির তালিকা অপরিবর্তিত থাকিতে পারে। তবে ইহার মধ্যে একটু রদবদলের প্রয়োজন রহিয়াছে। রবিবার দিন পুরাপুরিভাবে মাদ্রাসা বন্ধ থাকিবে। কিন্তু শুক্রবারে সকাল ছয়টায় ক্লাস চালু হইয়া সাড়ে দশটা অবধি চলিবে, এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে যেমন হইয়া থাকে। মহরম উপলক্ষে দশদিন ছুটি থাকিবে। অন্যান্য সাধারণ ছুটির বেলায় যদি মুসলমানদের ধর্মীয় পর্বাদির ব্যাঘাত ঘটে তাহা হইলে মাদ্রাসার ছুটির তালিকা নিম্নরূপ হইবে ঃ

১) রমযান ৩০ দিন, ২) ঈদুল ফিতর ৩ দিন, ৩) ঈদুল আযহা ৫ দিন, ৪) মহরম ১০ দিন, ৫) আখেরী চাহার শম্বা ১ দিন, ৬) ফাতেহা দোয়াজ দাহুম ১ দিন, ৭) শবেবরাত ২ দিন, ৮) ক্রিসমাস ৭ দিন, ৯) নববর্ষ ১ দিন, ১০) গুড ফ্রাইডে ২ দিন, ১১) রাণীর জন্মদিন ১ দিন, ১২) গ্রীষ্মের ছুটি ১৫ দিন।

১১) পরীক্ষার রীতি ঃ

হেড মৌলবী ও হেড মাস্টারের নেতৃত্বে গঠিত দুইটি কমিটির অধীনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক শিক্ষক নিজ নিজ বিষয়ের দায়িত্ব পালন করিবেন। এই কমিটি জনশিক্ষার ডিরেক্টর অনুমোদন করিবেন। পরীক্ষা সম্পন্ন হইবার পরই কমিটির সদস্য শিক্ষকরা নিজ নিজ রিপোর্ট, প্রশ্নপত্র (ইংরেজি অনুবাদ করিয়া) ও পরীক্ষার খাতা ডিরেক্টরের সমীপে পেশ করিবেন।

www.waytojannah.com

১২) ছাত্রবৃত্তি ঃ

কোন বৃত্তিই এক বছরের বেশি সময়ের জন্য দেওয়া যাইবে না। প্রতি ক্লাসের বৃত্তির পরিমাণ ও আসন নিম্নরূপ হইবে ঃ

বৃত্তির পরিমাণ	সংখ্যা	ক্লাস
৪ টাকা	১	সপ্তম শ্রেণী (হাপ্তম)
৪ টাকা	৪	ষষ্ঠ শ্রেণী (শশম)
৫ টাকা	৪	পঞ্চম শ্রেণী (পাঞ্জম)
৫ টাকা	৫	চতুর্থ শ্রেণী (চাহারম)
৬ টাকা	৬	তৃতীয় শ্রেণী (ছুয়াম)
৮ টাকা	৬	দ্বিতীয় শ্রেণী (দুয়াম)
১০ টাকা	৬	প্রথম শ্রেণী (উলা)

প্রতি ক্লাসেই পরীক্ষার পূর্ণ মান থাকিবে ৬০০ নম্বর এবং তাহা নিম্নরূপে বিভক্ত হইবে ঃ

আরবী ৩০০ নম্বর

ইংরেজি ২০০ নম্বর

অন্যান্য বিষয় ১০০ নম্বর

নিম্নমানের চারিটি ক্লাসের বিভিন্ন বিষয়ের নম্বর থাকিবে নিম্নরূপে ঃ আরবী - ২০০, ইংরেজি - ২০০, অন্যান্য - ২০০

১৩) আরবী বিভাগের ছাত্ররা উলা পাস করার পর এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে দুই-এক বছর পড়িবার জন্য বিশেষ অনুমতি লাভ করিবে।

১৪) আগামীতে মাদ্রাসায় কোন পদ খালি হইলে কমিটির পরামর্শ সাপেক্ষে তাহা পূরণ করিতে হইবে।

১৫) ইংরেজি বিভাগের কতিপয় গরীব ছাত্রদের পুস্তক ক্রয় বাবদ সরকার যেন কিছু অর্থ বরাদ্দ করেন এবং কমিটি এই মর্মে সুপারিশ করিতেছে।

১৬) মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষার ক্রমবিকাশের জন্য আপাতত তিনজন মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে। তাহাদের সর্বোচ্চ বেতন দেড়শত ও সর্বনিম্ন ৪০ টাকা হইবে।

১৭) এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এন্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা থাকিবে।

www.waytojannah.com

১৮) এই বিভাগে বাংলা অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসাবে থাকিবে। তবে কোন গার্জিয়ান যদি এতে অমত করেন তাহা হইলে বিশেষ ক্ষেত্রে ছাত্র বাংলা না পড়িলেও পারিবে।

১৯) এই বিভাগের ছাত্রদের জন্য বিশেষ বৃত্তির বন্দোবস্তের জন্য কমিটি সুপারিশ করেন। মাসিক চারি টাকা হিসাবে তিনটি বৃত্তি তৃতীয় মানে বিশেষভাবে কৃতকার্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ থাকিবে। অনুরূপভাবে ৫ টাকা হিসাবে তিনটি বৃত্তি দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে উত্তীর্ণ ১ম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য।

২০) তাছাড়াও ৮ টাকা হিসাবে তিনটি জুনিয়র স্কলারশিপ দুই বছর মেয়াদে এন্ট্রান্স উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে প্রদান করিতে হইবে। এই সব ছাত্র পরবর্তী পর্যায়ে যে কোন কলেজে ভর্তি হইয়া সরকারের জুনিয়র স্কলারশিপের নিয়ম অনুযায়ী এই বৃত্তি ভোগ করিতে পারিবে।

২১) এ্যাংলো পার্সিয়ান ছাত্রদের জন্যও মাদ্রাসার আবাসিক অধিকার সংরক্ষিত থাকিবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে আরবী বিভাগের ছাত্রদেরকে প্রাধান্য দিতে হইবে।

২২) এই বিভাগের মাসিক ফি'র কোন তারতম্য থাকিবে না।

২৩) মাদ্রাসা বর্তমানে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্বে পরিচালিত হইতেছে। কমিটির মতে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল পদ বিলুপ্ত করিয়া এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের অভিজ্ঞ হেড মাস্টারকে গোটা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অর্পণ করা হউক। তবে হেড মাস্টার আরবী বিভাগের শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্য পুস্তক সম্পর্কে কোন হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

২৪) বর্তমানে হেড মাস্টার মি. ব্লাকম্যানকে পদচ্যুত করা উচিত কিনা এই সম্পর্কে কমিটি নানাভাবে চিন্তা করিতেছে। মি. ব্লাকম্যান এন্ট্রান্স পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে শিক্ষাদান করিতে পারেন এবং প্রাচ্য ভাষার একজন বিচারক হিসাবে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের একজন যথার্থ সুসমঞ্জস ব্যক্তি। অনেকে তাহার ইংরেজি উচ্চারণের সমালোচনা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাহার যোগ্যতার প্রশ্নকে উপেক্ষা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাহার রচনায় মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির উপর অন্যায়ভাবে হামলা করিয়াছেন, এইজন্য এক শ্রেণীর মুসলমান তাহার উপর অসন্তুষ্ট। এই জন্য কমিটি আশংকা করেন যে, তিনি যদি মাদ্রাসায় থাকেন তাহা হইলে আগামীতে নানা অসুবিধা এবং সংকট দেখা দিতে পারে।

২৫) মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল পদ বিলুপ্তি সম্পর্কে সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত মুন্সী পদটির' (প্রাইভেট সেক্রেটারী) বিলুপ্তির প্রশ্ন আপাতত স্থগিত থাকুক। তাছাড়া বর্তমান হেড মাস্টারের বদলে যদি নূতন হেড মাস্টার নিয়োগ করা হয় তিনি 'মুন্সী' পদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কিনা সে' প্রশ্নের উপর 'মুন্সী' পদের বিলুপ্তি বা বহাল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেওয়া যাইবে।

২৬) মাদ্রাসার আবাসিক কামরাগুলিতে মাদ্রাসার ছাত্র ছাড়াও প্রেসিডেন্সী বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রদেরকেও যেন থাকতে দেওয়া হয় এই মর্মে কমিটি সুপারিশ করেন।

২৭) ১৮৬৯ সালে কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী মি. ব্লাকম্যানকে একটি নোটিশ দেওয়া যাইতে পারে যে, তিনি মাদ্রাসার যে কামরাগুলিতে বসবাস করিতেছেন আগামী জুন নাগাদ যেন তাহা খালি করিয়া দেন।

২৮) কমিটি মাদ্রাসার সাব এসিস্টেন্ট সার্জেন্ট পদের সার্থকতা খুঁজিয়া পান না। অতএব এইপদ বিলুপ্ত করার জন্য সুপারিশ করা যাইতেছে। এই পদের পরিবর্তে বরং একজন মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ করা যাইতে পারে।

২৯) আগামীতে ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান এবং পুরস্কার দানের ব্যাপারটি একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে। উপস্থিত গণ্যমান্য লোকদের সামনে ছাত্রদেরকে পুরস্কৃত এবং সনদ প্রদান করিলে ছাত্ররা যারপরনাই অনুপ্রেরণা লাভ করিবে।

৩০) মাদ্রাসাতে একটি ভিজিটর বুক রাখিতে হইবে। যাহারা মাদ্রাসা পরিদর্শন করিবেন নিজেদের মতামত এই বইতে লিপিবদ্ধ করিবেন। এই ভিজিটর বুকের রেকর্ড মাসে কমপক্ষে একবার জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে।

রিপোর্ট সম্পর্কে ডিরেক্টরের মতামত

কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর রীতিমত অপ্রস্তুত হন। তিনি এই মর্মে প্রাদেশিক সরকারের সেক্রেটারীকে নিম্নোক্ত পত্রটি লেখেন ঃ

ডব্লু, এস. এটকিনসক, এম. এ

ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন-এর পক্ষ হইতে

সেক্রেটারী, বাংলা সরকার, জেনারেল ডিপার্টমেন্ট-এর সমীপে-

১) মাদ্রাসা সংক্রান্ত আপনার ৮৭৮ নং চিঠি (২৪ শে মার্চ ১৮৭১) এবং অন্যান্য পত্রাবলীর (যাহাতে লেঃ গভর্নরের পর্যালোচনা ও মতামত বিধৃত) পরিপ্রেক্ষিতে

www.waytojannah.com

রিপোর্ট পেশ করিতেছি যে, মাদ্রাসার সংস্কার এবং উন্নতি বিধানের জন্য যে কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহারা ১৮৬৯ সালের সংস্কার প্রস্তাবের আলোকেই অগ্রসর হইয়াছেন।

২) আমি ১৩৬২ নং চিঠিতে (১৬ই মার্চ ১৮৭০) সংস্কার সম্পর্কিত ১৮৬৯ সালের প্রস্তাবিত সকল ধারা মোটামুটিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং এই ধারাবলীর আলোকে বর্তমান কমিটির বিস্তারিত সংস্কার রিপোর্ট যথাযথভাবে প্রবর্তন করিবার ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু আমি মনে করি না, ইহাতে মাদ্রাসার সম্পূর্ণ সংস্কার সাধিত হইবে। কাল পরম্পরা ধরিয়া যে সংস্কার সম্পর্কে সুধীজন চিন্তাভাবনা করিতেছেন তাহা এত সকালেই পরিপূর্ণতা লাভ করিবে আমি এই কথা মানি না।

৩) এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ সম্পর্কে কমিটি যে প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন তাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। কমিটি এই বিভাগের জন্য যেসব প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছেন সেসব বর্তমানে সেই খাতেই প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু এ্যাংলো এরাবিক বিভাগ সম্পর্কে কমিটি যেসব প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন তাহা যে কতটুকু কার্যকরী এই সম্পর্কে আমি সন্দিহান এবং অনিশ্চিত বলিয়া মনে করি। মাদ্রাসার রেকর্ড হইতেই এই কথা প্রমাণিত হয় যে, মাদ্রাসা সম্পর্কে এই সংস্কার আন্দোলন ১৮৫৩ সাল হইতেই উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকবারেই তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে এবং সংস্কার কার্যক্রম স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। বর্তমানে সংস্কার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে সত্যটি উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে তাহা বেশ প্রণিধানযোগ্য। মুসলমানরা এত দিনে বেশ জাগ্রত হইয়াছে এবং সব কিছু বুঝিতে শিখিয়াছে। ১৮৫৩ সাল এবং ১৮৭১ সালের মাঝে আকাশ পাতাল ব্যবধান। অতএব আঠার বৎসর পর এই সংস্কার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার কোন কারণ নাই।

আমি একথাও সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি যে, অতীত এবং বর্তমানের চাহিদার মাঝে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান এবং বর্তমানে সংস্কার প্রয়াসীদের যুক্তি পরামর্শ সম্পূর্ণ ন্যায্য। অতএব এই প্রস্তাবটি অবশ্যই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। কিন্তু আমি যেটাকে নিজের কর্তব্য বলিয়া মনে করি তাহলো আমি লেঃ গভর্নরকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিতে চাই যে, মুসলমানদের বিশেষ ধরনের এই ধর্মীয় শিক্ষার বিশেষ কতগুলি বিষয়, যেমন আকায়েদ, মনতেক ও ফালসাফাকে স্কুলের শিক্ষার সহিত মিশাইয়া দেওয়া অনভিজ্ঞ এবং আপাতঃ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের কাছে তেমন কোন কঠিন কাজ না, কিন্তু ইহাতে এমন কতগুলি সমস্যার উদ্ভব হইবে যাহা কোনক্রমেই রোধ করা সম্ভব নয়।

আমি বিশেষ দৃঢ় মনোভাব এবং দায়িত্বশীলতার সহিত এই কথা বলিব যে, শিক্ষার এই দুইটি ব্যবস্থাকে একীভূত করার কোন প্রয়োজন নাই। শিক্ষার এই দুইটি

www.waytojannah.com

ধারাই অপরিবর্তিতভাবে অব্যাহত থাকুক। তবে ১৮৫৩ সালের শিক্ষা কাউন্সিলের মতামত অনুযায়ী এই দুইটি শিক্ষা পদ্ধতিকে আলাদা রাখিতে হইবে।

তবে এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, প্রথমেই এমন ধরনের শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে যাহা পার্থিব প্রয়োজনের পরিপূরক। অতঃপর শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় ও এতদসংক্রান্ত তর্কশাস্ত্র, দর্শন, বালাগাত ইত্যাদির মত কঠিনতম বিষয়গুলিতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করিতে পারে। এমতাবস্থায় আমি এতটুকু করিতে পারি যে, এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগোত্তীর্ণ বিশেষ মানের ছাত্রদেরকে আরবী বিভাগে ভর্তির অধিকার দেওয়া হইবে। অথবা যেসব ছাত্র এই বিভাগে পড়াশুনা করে নাই অথচ এই বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এমতাবস্থায় ভর্তি পরীক্ষায় সে পাস করিলে তাহাকেও এই বিভাগে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হইবে। পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সে ইংরেজি বা মাতৃভাষায় দিতে পারিবে। এই ভাবে ষোল বা আঠারো বৎসরের একটি ছাত্র ইতিহাস, অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়া যথেষ্ট যোগ্যতার সহিত এই বিভাগে ভর্তি হইবে এবং তখন ফেকা মানতেক ইত্যাদি বিষয় তাহার কাছে অনেকটা সুবোধ্য হইবে। এই সব ছাত্র তখন প্রচলিত আট বৎসরের স্থলে ৪ বৎসরেই কোর্স সম্পন্ন করিতে পারিবে।

উপরে বর্ণিত আমার মতামত সম্পর্কে আমি সরকারকে বাধ্য করিতে পারিব না, আমাকে কমিটি প্রদত্ত স্কীম মোটামুটি মানিয়া লইতে হইবে এবং সেই মতে কাজ করিতে হইবে। তবে এ ব্যাপারে আমি এতটুকু অধিকার কামনা করি যে, অভিজ্ঞতার আলোকে আমি যেন এই স্কীমের সামান্য রদবদল করিতে পারি।

৪) এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের একমাত্র পরিচালক প্রিন্সিপাল পদ বিলুপ্তির কথা আমি পূর্বেও বলিয়াছি। বর্তমান হেড মাস্টার মি. ব্লাকম্যানকে আমি খুবই যোগ্য এবং দক্ষ ব্যক্তি বলিয়া মনে করি। আলিয়া মাদ্রাসার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে তাহার সবরকম যোগ্যতাই আছে। বিগত ছয় বৎসর যাবৎ তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সহিত তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। তাহা ছাড়া উভয় বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকের কাছে তিনি অতিপ্রিয় ব্যক্তি। মহামেডান লিটারারী সোসাইটি তাহার সম্পর্কে যে মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন তা খুবই পরিতাপের বিষয়। আমি নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি যে, মাদ্রাসার পাঠ্য সম্পর্কে তিনি যে সমালোচনা লিখিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য আসলে শুভই ছিল। আমি এই কথাও বিশ্বাস করি যে, কমিটির যেসব সদস্য এই নিমিত্ত তাহার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন তাহারা মিঃ ব্লাকম্যানের অন্যান্য যোগ্যতা এবং কর্মদক্ষতা দেখিয়া উহা ভুলিয়া যাইবেন। কেননা শিক্ষক হিসাবে তাহার জুড়ি মেলা ভার। যাহারা মিঃ ব্লাকম্যানের নিন্দা করেন

www.waytojannah.com

কিছুকাল পর তাহারাই তাহার যোগ্যতার প্রশংসা না করিয়া পারিবেন না। এই জন্য আমি তাহাকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদে বহাল রাখিবার জোর সুপারিশ করিতেছি। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে আমার আরজ, সামগ্রিকভাবে তিনি যেভাবে প্রতিষ্ঠানটির দেখাশুনা করিতেছিলেন এখনও তাহা অব্যাহত রাখিবেন। তাহার তত্ত্বাবধান খুবই লাভজনক এবং প্রশংসনীয়।

৫) হেড মাস্টার মাদ্রাসা ভবনে থাকিবেন কিনা, এই একটি প্রশ্ন রহিয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারে আমি কমিটির বিরোধিতা না করিয়া পারি না। মাদ্রাসার প্রয়োজনেই হেড মাস্টার সারাক্ষণ মাদ্রাসার আওতার ভিতরে থাকিবেন। এই সম্পর্কে ইতিপূর্বেও মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল স্যার এফ. হালিডে এবং প্রাদেশিক সরকারের সেক্রেটারী মাদ্রাসার ভিতরেই হেড মাস্টারের থাকিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অবশ্যই সে প্রয়োজন এখনও আছে। পূর্বে যখন এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল না মাদ্রাসার ভিতরে একটা না একটা গোলযোগ লাগিয়াই থাকিত এবং ইহাতে ছাত্রদের সহিত শিক্ষকরাও যুক্ত ছিলেন। হেড মাস্টার সেখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ার পর এই ধরনের গোলযোগ আর দৃষ্ট হয় নাই। অতএব হেড মাস্টার মাদ্রাসার বাহিরে থাকিলে আবারও মাদ্রাসায় গোলযোগ সৃষ্টি হইবে। অবশ্য তাহার ব্যবহৃত কামরাগুলি হইতে দুইটি কামরা মাদ্রাসার জন্য নেওয়া যাইতে পারে। বর্তমানে মাদ্রাসার অনেক বাড়তি কামরা আছে। নূতন ছাত্রদের থাকার এবং নূতন ক্লাস খোলার জন্য ইহা যথেষ্ট।

লেঃ গভর্নরের পক্ষ হইতে সেক্রেটারীর জবাব

১) আমাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, এই চিঠি (নং ২৫২৮, ১৮ই জুলাই) প্রাপ্তি সংবাদের সহিত যেন কমিটির উক্ত রিপোর্টটি আমাদের মন্তব্যসহ আপনাকে প্রত্যর্পণ করি।

২) আপনার চিঠি এবং রিপোর্ট সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, মাদ্রাসার সংস্কার এবং সংশোধন সম্পর্কে কমিটি এই রিপোর্টে যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন, লেঃ গভর্নর উহা পুরাপুরি অনুমোদন করিয়াছেন। লেঃ গভর্নরের ইচ্ছা, এই পরিকল্পনা অবিলম্বেই কার্যকরী করা হউক এবং সংস্কার সম্পর্কে সকল সম্ভাব্যতা যাচাই করা হউক। কেননা এই রিপোর্ট একটি শক্তিশালী কমিটির পক্ষ হইতে পেশ করা হইয়াছে।

৩) মিঃ ব্লাকম্যান দ্বিতীয় নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত মাদ্রাসাতেই থাকিবেন এবং তিনি এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগেরই হেড মাস্টার হিসাবে থাকিবেন, এ্যাংলো এরাবিক বিভাগের তাহার কোন অধিকার থাকিবে না। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ সাটক্লিফই আপাতত এই দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন। মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল পদ

www.waytojannah.com

বিলুপ্ত করা হইবে। মিঃ ব্লাকম্যান মাদ্রাসাতে একজন আবিবাহিত ব্যক্তি হিসাবে মাত্র দুইটি কামরা ব্যবহার করিতে পারিবেন। এইকথা সর্বসম্মত যে, সম্পূর্ণ পরিবার-পরিজনসহ এখানে থাকিবার জায়গাও উপযুক্ত নাই আর থাকাও সমীচীন নহে।

৪) রেসিডেন্ট মুন্সীর প্রশ্নটি মিঃ সাটক্লিফের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। প্রয়োজন হইলে তিনি মুন্সীকে কাজে লাগাইবেন আর প্রয়োজন না হইলে তিনি মিঃ ব্লাকম্যানের সহিত পরামর্শ করিয়া এই বৎসরের শেষ নাগাদ তাহাদের মতামত সরকারকে জানাইবেন।

৫) হুগলী মাদ্রাসায় এই সংস্কার পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে কিনা সে সম্পর্কে ডিরেক্টরের মতামত ব্যক্ত করিবেন। আপনার এই কথাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, হুগলী মাদ্রাসাকে শুধু ধর্মীয় শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া কলিকাতা মাদ্রাসাকে মুসলমানদের সাধারণ শিক্ষাগারে রূপান্তরিত করা হউক। এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করিতে গেলে কমিটির সকল প্রস্তাব স্থগিত হইয়া যাইবে। এই সম্পর্কে বারান্তরে চিন্তা করা যাইবে।

৬) ছাত্ররা প্রাথমিক পর্যায়েই এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে পড়াশুনা করিয়া পরে আরবী বিভাগে ভর্তি হইবে—আপনার এই প্রস্তাব সম্পর্কে লেঃ গভর্নরের ধারণা এই যে, এই বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষিতদের পরামর্শ ছাড়া এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন নহে। এই শিক্ষা সম্পর্কে যাহারা বিশেষজ্ঞ তাহাদের মতামত গ্রহণ করিয়া পরে সেই সম্পর্কে বিবেচনা করা যাইবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে গভর্নরের ইচ্ছা এই যে, আরবী বিভাগের শিক্ষানীতি ও পাঠ্য বিষয় সম্পূর্ণ তাহাদের মতামতের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে।

লেঃ গভর্নর সুস্পষ্টভাবে একথা জানাইয়া দিতে চান যে, যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন তাহাদের আরবী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখার প্রয়াস সম্পূর্ণ অর্থহীন। অবশ্য এই দেশীয় শিক্ষার সহিত তাহারা যেন পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে সেই ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।

৭) এই সংস্কার পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে আরো যাহা কিছুর প্রয়োজন হইবে (যেমন - জিনিসপত্র এবং শিক্ষক মণ্ডলী) সেই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণসহ আরো কত পরিমাণ খরচ হইবে তাহার একটি রিপোর্ট অবিলম্বে গভর্নরের সমীপে পেশ করিতে হইবে।

৮) সরকার কমিটির সদস্যদের কার্যক্রমের জন্য যারপর নাই আনন্দিত এবং এইজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে যে, বহু পরিশ্রম করিয়া তাহারা এই কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও মাদ্রাসার সহযোগিতার কাজে তাহারা আগাইয়া আসিবেন।

www.waytojannah.com

মাদ্রাসার নূতন পাঠ্যপুস্তক

এই সংস্কার পরিকল্পনা অনুমোদিত হওয়ার পর মাদ্রাসার প্রত্যেক ক্লাসে নিম্নলিখিত পুস্তকাদি পাঠ্য হিসাবে অনুমোদন করা হয় ঃ

প্রথম শ্রেণী (উলা)

সুল্লমুল উলুম, মুসল্লমুস সবুত কামেল, শেফা (কাজী আয়াজকৃত) প্রথম অধ্যায়, হেদায়া (পাঁচটি অধ্যায়), মোকামাতে হারিরী (১ম ভাগ) ও মোতাওয়াল।

দ্বিতীয় শ্রেণী (দুয়াম)

মুতানাব্বি (১ম ভাগ) ও মোখতাসারুল মাআনি (দ্বিতীয় অধ্যায়), তাওজিহ কামেল, মীর কুতবী, তারিখুল খোলাফা ও হেদায়া (চারটি অধ্যায়)।

তৃতীয় শ্রেণী (ছুয়াম)

নূরুল আনওয়ার (দ্বিতীয় খণ্ড) মোখতাসারুল মাআনী (১ম অধ্যায়), শরহে বেকায়া (সাতটি অধ্যায়), কুতুবী (দ্বিতীয় ভাগ), ছাবআ মোয়াল্লাকা ও তারিখুল খোলাফা।

চতুর্থ শ্রেণী (চাহারম)

সেরাজী (কামেল), শরহে মোল্লাজামী (দ্বিতীয় খণ্ড), নূরুল আনওয়ার (প্রথম ভাগ), আজবুল আজায়েব (১ম ভাগ), কিবতী (১ম ভাগ) ও শরহে বেকায়া (পাঁচটি অধ্যায়)

পঞ্চম শ্রেণী (পাঞ্জব)

শরহে তাহজিবে (কামেল), শরহে মোয়াল্লা (১ম ভাগ) ও আনওয়ারে সোহায়লী (দুই অধ্যায়)।

ষষ্ঠ শ্রেণী (শশম)

কাফিয়া, তামাম, মিজান (মনতেক) সম্পূর্ণ, ফসুলে আকবরী (দ্বিতীয় ভাগ), নাফহাতুল ইয়ামন (শেষ খণ্ড ১ম অধ্যায়) ও এখলাকে মোহসেনী (প্রথম বিশটি অধ্যায়)।

সপ্তম শ্রেণী (হাপ্তম)

হেদায়াতুন নহু, ফসুলে আকবরী (১ম ভাগ), নাফহাতুল ইয়ামন (১ম ভাগ), শরহে মায়াত ও গুলিস্তান (চারটি অধ্যায়) এই সময় (১৮৬৯-৭০) হুগলী মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ৪৯ ও আলিয়া মাদ্রাসার ছিল ৯৮।

www.waytojannah.com

ভারত সরকারের বিশেষ সার্কুলার

১৮৭১ সালে ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা প্রসঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবার সমস্যার সূত্রপাত করে। অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অমনোযোগিতা আবার প্রকট আকার ধারণ করে। যাহার ফলে, মুসলমানরা সরকারী চাকুরী হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিল। অতএব সরকার এবং জনগণ এই বিষয়টি নিয়া বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এই নৈরাজ্য সম্পর্কে চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতরা নানা কার্যকারণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই সম্পর্কে ডঃ ডব্লিও হান্টার 'Our Indian Musalman' নামক একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে ভারতের শিক্ষা সমস্যা নিয়ে বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়। মিঃ হান্টার বলেন ঃ

জানিনা কেন মুসলমানদের জন্য সরকারী এবং উচ্চপদস্থ চাকুরীর দ্বার বন্ধ হইয়া আছে। আসলে মুসলমানদের মেধাশক্তির কোন দৈন্য নাই। তাহাদের দারিদ্র্য এবং অভাবক্লিষ্ট মন সব সময় শুভদিনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ। বিভিন্ন জেলাতে নিঃসন্দেহে মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা রহিয়াছে এবং দেশময় সরকার সর্বত্র অসংখ্য স্কুলের পত্তন করিয়াছেন। কিন্তু এই শিক্ষায়তনগুলি না মুসলমানদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারে, না কোন পেশাগত কাজে যোগ দিবার মত যোগ্যতা দান করিতে পারে। এই সব স্কুল হইতে প্রতি বৎসর বহু বিদ্যোৎসাহী হিন্দু ছাত্র পাস করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া ভর্তি হয় এবং তাহারা জীবনের সকল সাফল্যের সিংহ দ্বারে আসিয়া উপনীত হয়। বস্তুতপক্ষে আমাদের এই সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থা হিন্দুদের শতাব্দীকালের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে একটি সতেজ ও বীর্যবান নাগরিক হিসাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু মুসলমানরা এ ব্যাপারে অনগ্রসর রহিয়া গিয়াছে। জাতীয় জীবনে এই ধরনের জাগরণ মুসলমানদের ঐতিহ্য বিরোধী। তাহাদের আদর্শ এবং ধর্ম এই জাগরণকে অসমীচীন মনে করে, পরন্তু ইহা বরং ধর্মের পক্ষে অবমাননাকর। মুসলমানদের শাসনামলে হিন্দুরা যেমন ধৈর্য এবং তিতিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল আমাদের শাসনামলে মুসলমানরাও তদ্রূপ কালাতিপাত করিতেছে। হিন্দুরা এই কথা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছে যে, ইংরেজি শিক্ষার মাঝেই প্রকৃত উন্নতি নিহিত রহিয়াছে। ইতিপূর্বে মুসলমানদের আমলেও তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, ফারসী আয়ত্ত করিতে পারিলে সব রকম সাফল্য লাভ হইবে। হিন্দুদের মধ্যে ফারসী চর্চা এত ব্যাপক হইয়াছিল যে, ১৫০০ সালে হিন্দুরা ফারসীতে রীতিমত কবিতা রচনা করিতে পারিত। ফারসী ভাষায় বহু পুস্তক প্রণয়ন করা হইয়াছে যাহার নিদর্শন এখনও সংরক্ষিত আছে। ইহারা জাতে হিন্দু ছিল, কিন্তু নিজেদের দক্ষতা গুণেই তাহারা মুসলমান ছেলেপিলেদের পড়াইত। মজার কথা হইল মুসলমানী পদ্ধতি এবং মুসলমানী বিষয়ই তাহাদের শিক্ষা দিত।

www.waytojannah.com

Contents

সম্রাট আকবরের সময় হিন্দুদের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং বড় বড় পদে তাহাদিগকে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোল শতকে একজন হিন্দু উজিরও ছিলেন। তিনি দেশের সকল হিসাব নিকাশ ফারসী ভাষায় লিপিবদ্ধের নির্দেশ প্রদান করেন। হিন্দু পাটোয়ারী এবং তহশীলদাররা ফারসী আয়ত্ত করিয়া রীতিমত অফিসাদিতে কাজকর্ম করিত।

অনুরূপভাবে আমরা যখন ইংরেজির প্রবর্তন করি এবং অফিস আদালতেও ইংরেজি চালু করি, হিন্দুরা মনে করিল এখন আর ফারসীতে কাজ হইবে না। ফারসীর বদলে তাহারা ইংরেজির প্রতি মনোযোগী হইল এবং অতি অল্প দিনেই এ ব্যাপারে বেশ অগ্রসর হয়। মুসলমানদের ফারসী ভাষা এবং আমাদের ইংরেজি ভাষা উভয় ভাষাই হিন্দুদের পক্ষে বিজাতীয় ভাষা ছিল। কিন্তু কাল এবং সময়ের প্রয়োজনে তাহারা উভয় ভাষাকেই আপন করিয়া নিয়াছে।

পক্ষান্তরে মুসলমানদের অবস্থা ছিল বিপরীত। আমাদের হাতে শাসনদণ্ড হস্তান্তর হইবার পূর্বে মুসলমানরা শুধু যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ছিলেন তাহা নহে, শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাহারা সুপণ্ডিত ছিলেন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপাতে তাহাদের শিক্ষার মান যতই নিম্নমানের থাকুক, তারও একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য এবং মানদণ্ড ছিল। তাহাদের আদর্শ এবং নীতি নিরর্থক ছিল না। তাহাদের নীতি যেভাবে পালন করা উচিত ছিল হয়ত সেভাবে তাহা পালন করা হয় নাই, কিন্তু তার পরও এই কথা অনস্বীকার্য যে, সেকালের ইহাই ছিল প্রধান এবং আধুনিক নীতি নির্ধারক মানদণ্ড। তাহাদের মানদণ্ডের উপরই তাহাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উৎকর্ষ সৃষ্টি হইয়াছে এবং তখনকার দিনে ইহাই ছিল উপমাহীন। মুসলমানদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা এবং নৈতিক বিধানের ছায়ায় আলোকপ্রাপ্ত হইয়া হিন্দুরাও সামাজিক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের শাসনামলের পঁচাত্তরটি বৎসর তাহাদের এই বিধানের অনুসরণ করিয়াছি এবং তাহাদের শিক্ষা মোতাবেক আমরা আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কর্মী সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু ইহার পর আমরা একটি নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা পত্তন করি এবং এক সম্প্রদায় যখন আমাদের শিক্ষাকে বরণ করিয়া নিল অপর সম্প্রদায়ের (মুসলমান) প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা অবদমিত করিয়াছি। যাহার ফলে জীবিকার ক্ষেত্রে মুসলমানরা সকল দ্বারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এইকথা অনস্বীকার্য যে, হিন্দুদের মতো ধৈর্য ধরার ব্রত নিয়া মুসলমানরাও যদি আমাদের ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিয়া নিতে পারিত তাহা হইলে তাহারা লাভবান হইত। কিন্তু ইহা ছিল মজ্জাগত বিরোধ। একটি প্রাচীন বিজয়ী জাতি নতুন শাসকগোষ্ঠীর কাছে এত সহজে নত হইতে পারে না এবং হৃত গৌরব ও ঐতিহ্যকে ভুলিতে পারে না। এই কারণেই বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বরণ করিয়া

www.waytojannah.com

নিতে পারে নাই। শুধু তাহাই নহে এই সঙ্গে ধর্মীয় ব্যাপারও জড়িত ছিল। বহুকাল যাবত একথা অমীমাংসিত ছিল যে, মুসলমানরা স্বচ্ছন্দে সরকারী স্কুলে ভর্তি হইতে পারে কিনা। আমরা যদি ইংরেজ শিক্ষকদের দ্বারা তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারিতাম অথবা অসম সাহসিকতার সহিত রাতারাতি অফিস আদালতের ভাষা বাংলা করিয়া ফেলিতে পারিতাম তাহা হইলে সম্ভবত আর এই পরিণতি হইত না। কেননা, মুসলমানরা খৃস্টানদেরকে যত খারাপই মনে করুক, খৃস্টানরা যে আসলে 'আহলে কেতাব' একথা মুসলমানরা মানে। পক্ষান্তরে হিন্দুদের ধর্মকে তাহারা পৌত্তলিকতা এবং সারশূন্য ধর্ম বলিয়া অভিহিত করে। ইসলাম ধর্মের সহিত তাহাদের কোন রকম সম্পর্ক নাই। পূর্ব বাংলার স্কুলগুলিতে যেসব ভাষা প্রচলিত আছে তাহা মূলত হিন্দুয়ানী ভাষা। এই সব স্কুলের শিক্ষকরাও অধিকাংশ হিন্দু এবং ইহাও একটি মস্তবড় কারণ যে, মুসলমানরা হিন্দুদের নিকট হইতে হিন্দুয়ানী ভাষা শিখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত।[৪৫]

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের এই অনগ্রসরতা সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারও সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়ো মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এই মর্মে একটি রেজুলেশন পাস করেন, (রেজুলেশন নং ৩০০, তারিখ ৭ই আগস্ট ১৮৭১ সাল) রেজুলেশনটি নিম্নরূপ ঃ

ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি হইয়াছে ভারত সরকার বিভিন্ন সূত্রে তাহার একটি সম্যক ধারণা গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মনে হয় সারা উপমহাদেশের সীমান্ত এবং পাঞ্জাব প্রদেশ ছাড়া আর কোথাও মুসলমানদের শিক্ষার কোন সুষ্ঠু বন্দোবস্ত নাই। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই দেশের এমন একটি বিরাট সম্প্রদায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অনীহা প্রকাশ করিয়া বসিয়া আছে। অথচ তাহাদের কাছে নিজস্ব সাহিত্য, ইতিহাস এবং সংস্কৃতির বিরাট সম্ভার রহিয়াছে এবং এক বিশেষ শ্রেণী এই সব পৌরাণিক শিক্ষায় নিয়োজিত থাকিয়া উপকৃত হইতেছে। আমাদের শিক্ষাকে বর্জন করিয়া তাহারা নৈতিক এবং সামাজিক উন্নতি হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। অথচ তাহাদের পাশাপাশি অন্য সম্প্রদায় এই শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইতেছে। গভর্নর জেনারেল আন্তরিকভাবে এইকথা বিশ্বাস করেন যে, বর্তমানে স্থানীয় ভাষায় যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, মুসলমানরা উহাতে উপকৃত হইতেছে না। এমতাবস্থায় উহার সহিত যদি আরবী এবং ফারসী সুশৃঙখল পদ্ধতিতে প্রবর্তন করা হয় তাহলে মুসলমানদের কাছে তাহা গ্রহণীয় তো হইবেই উপরন্তু তাহারা ইহার প্রতি সহযোগিতা প্রদর্শন করিবে।

৪৫. Our Indian Musalman - Dr. W. W. Hunter — P-169

www.waytojannah.com

এই পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নর জেনারেলের একান্ত ইচ্ছা, সকল স্কুল-কলেজে ক্লাসিক্যাল এবং মুসলনানদের স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাকে যথাসম্ভব উৎসাহিত করিতে হইবে। ইহাতে বর্তমানে প্রচলিত বিষয়াদির উপরে কোন চাপ পড়িবে না এবং উহা তেমন কোন পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে না। ইংরেজি প্রধান স্কুলগুলি বেশির ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত, এইসব স্কুলগুলিতে যোগ্য মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে। ভার্ণাকুলার স্কুলগুলিতে যেমন সরকার সাহায্য প্রদান করে তেমনি এ ধরনের ইংরেজি স্কুলগুলিতেও সরকারকে সাহায্য প্রদান করা উচিত যাহাতে মুসলমানরা শেষাবধি নিজেদের জন্য স্কুলের পত্তন করিতে পারে। মুসলমানদের বিশেষ ভার্ণাকুলার স্কুলগুলিতেও সরকারকে পর্যাপ্ত সাহায্য করা উচিত। সেক্রেটারী অব স্টেট বারংবার এই মর্মে সুপারিশ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাবধি এই সম্পর্কে কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় নাই।[৪৬]

১৮৭২ সালে বাংলার শিক্ষা পরিস্থিতি

উক্ত রেজুলেশনের কপি প্রাদেশিক সরকারের দফতরে প্রেরণ করার পর প্রাদেশিক সরকার ইহার জবাবে একটি রিপোর্ট প্রেরণ করেন। রিপোর্টটি নিম্নরূপ (নং ২৯১৮, তারিখ ১৭ই আগস্ট ১৮৭২) ঃ

"লেঃ গভর্নর সত্যি এব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, সম্ভবত এই শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা মুসলমানদের উপকৃত হইবার মতো কোন সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করা হয় নাই। মিঃ বার্ণার্ড-এর লেখা হইতে জানা যায় যে, স্কুলের জন্য যেসব ইন্সপেক্টর কর্মরত রহিয়াছেন তাহাদের মধ্যে একজনও মুসলমান নাই। স্কুলেও সেই একই অবস্থা, মুসলমান শিক্ষক অতি বিরল। মোটকথা, বাংলাদেশের শিক্ষা পরিস্থিতি হিন্দু প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। সরকারী উচ্চপদ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম পদগুলিতেও হিন্দুদের অবাধ কর্তৃত্ব। মুসলমানদের এই অবস্থা সত্যি হৃদয়বিদারক। আমি এই কথা সর্বান্তকরণে স্বীকার করি যে, মুসলমানদের স্বার্থ নিয়া পদে পদে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরূপ রিপোর্ট আসিয়া পৌঁছে। এই সময় লর্ড নর্থব্রুক ভারতের গভর্নর জেনারেল নিয়োজিত হন। শিক্ষা সম্পর্কিত প্রদেশসমূহের এই রিপোর্ট তাহার সামনে পেশ করা হইল। এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মুসলমানদের আগামী শিক্ষা নীতি সম্পর্কে (১৩ই জুন ১৮৭৩) একটি রেজুলেশন দেশময় প্রচার করেন। এই রেজুলেশনে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎপদ সম্পর্কে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এইক্ষেত্রে

৪৬. History of English Education of India— Muhammad. P. 149

www.waytojannah.com

মুসলমানদের ন্যায্য দাবি যাহাতে পুনরুদ্ধার হইতে পারে সেইজন্য কার্যকরী পন্থা অবলম্বনের উপর গরুত্ব আরোপ করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের রেজুলেশন অনুযায়ী দেশের সকল প্রদেশে মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাংলা প্রদেশও সরকারী ইশতেহারের পদাংক অনুসরণ করিয়া চলিবার প্রয়াস চালায়। কিন্তু সকল সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করিতে হইলে যেমন অর্থের প্রয়োজন তেমনি উহা সময়সাপেক্ষ ব্যাপারও বটে। অতএব মুসলমানদের মাঝে এই শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য আলাদাভাবে যে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন পড়ে তাহা কোথা হইতে নির্ণয় করা হইবে, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে বাংলা সরকারের অর্থ বিভাগ নির্লিপ্ততা প্রকাশ করিলেন। অথচ সরকারের ইচ্ছা যে, আলাদাভাবে মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হউক। এইক্ষেত্রে সরকারী ধনভাণ্ডার এক কানাকড়িও ব্যয় করিতে নারাজ। অর্থ বিভাগ কারণ দর্শাইয়া বলে যে, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মাঝে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনসাধারণের অর্থ ভাণ্ডার কিছুই দিতে পারিবে না। ইতিহাস এইখানে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। সরকারের অনুমোদন ও প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরকারের অর্থ বিভাগ কেন এ ব্যাপারে পিঠটান দিলেন তাহার রহস্য বাংলা সরকারই বেশ জানিতেন।

মোহসীন ফান্ড

শেষাবধি মুসলমানদের মাঝে ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রশ্নে বিশেষ খরচের মোকাবিলার জন্য মোহসীন ফান্ডের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। এই ফান্ডের টাকা অদ্যাবধি অবৈধভাবে সাধারণ শিক্ষার পিছনে ব্যয় করা হইতেছে। মুসলমানদের বিশেষ শিক্ষা খাতে ব্যয় করার জন্য এই ফান্ডে বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকারও বেশি বরাদ্দ ছিল। এই ফান্ড দানের পিছনে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছিল। প্রথমত যিনি এই সম্পদ উইল করিয়াছেন তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী এই টাকা ব্যয়িত হইবে। ইতিপূর্বে এই টাকা অবৈধভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খরচ করা হইত। দ্বিতীয়ত মুসলমানদের মাঝে শিক্ষা সম্প্রারণের ক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্বের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও দূরীভূত হইবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সরকার ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করিলেন যে, হুগলী কলেজের (মোহসীন কলেজ নামে পরিচিত) যাবতীয় খরচপত্র সরকার কর্তৃক বহন করা হউক এবং মোহসীন ফান্ডের টাকায় শুধু হুগলী মাদ্রাসা পরিচালিত হইবে এবং বাদ বাকি টাকা কলেজগামী মুসলমান ছাত্রদেরকে বৃত্তি হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। ইহার পরেও যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে মুসলমানদের শিক্ষাখাতে যেখানে যাহা প্রয়োজন হইবে ব্যয় করিতে হইবে।

www.waytojannah.com

মুসলমানদের মাঝে শিক্ষা সম্প্রসারণের নামে মোহসীন ফান্ডের টাকা এতকাল পরোক্ষভাবে হিন্দুদের শিক্ষায় নিয়োজিত ছিল। একজন মুসলিম দানবীরের জনকল্যাণমূলক ফান্ডের এই টাকা হিন্দুদের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হওয়াকে নিঃসন্দেহে অপাত্রে খরচ বলা যাইতে পারে। অতঃপর এই বিষয়ে মুসলমানদের মাঝে কানাঘুষা শুরু হইল এবং তাহারা সরকারের কাছে ইহার প্রতিবাদ করিল। সরকার দেখিলেন এইবারে মুসলমানদের খাতে অর্থ ব্যয়ের একটি সুরাহা হইয়াছে। তাই মোহসীন ফান্ড সম্পর্কে সরকার সহসা সচেতন হইয়া উঠিলেন এবং মোহসীন ফান্ডের টাকা মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। অথচ এতকাল এই অর্থ সরকারের অবহেলা এবং হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের দরুন অপাত্রে ব্যয় হইতেছিল।

হাজী মোহাম্মদ মোহসীন

হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের পিতার নাম ছিল আগা ফয়জুল্লাহ ইস্পাহানী, ইরানের বিখ্যাত সওদাগর আগা ফজলুল্লাহ্‌র পৌত্র ছিলেন তিনি। আগা ফজলুল্লাহ্ সতের এবং আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ের একজন প্রখ্যাত পর্যটক হিসাবে পাক-ভারতে পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতে আগমন করিয়া মুর্শিদাবাদে স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। মুর্শিদাবাদ সেকালের একটি ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। হুগলীতে ইংরেজ বাণিজ্যকর্তাদের কুঠি ছিল। এই জন্য কারবার উপলক্ষে আগা ফজলুল্লাহ্‌কে মাঝেমধ্যে হুগলীতে আসিতে হইত। এইভাবে শেষাবধি তিনি সপরিবারে হুগলীতেই চলিয়া আসেন।

হুগলীতে আসার পর পুত্র আগা ফয়জুল্লাহ্‌র সহিত আগা মোতাহারের (মরহুম) যুবতী এবং ধনাঢ্য স্ত্রীর বিবাহ হয়। আগা মোতাহার সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারের সভাসদ ছিলেন। আগা মোতাহার মোগল দরবার হইতে বাংলাদেশের নদীয়া এবং যশোর জেলায় বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী একটি জায়গীর লাভ করেন। এই জায়গীরের তত্ত্বাবধানের জন্য হুগলীতে চলিয়া আসেন এবং এই খানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও মন্নুজান নাম্নী এক কন্যা রাখিয়া যান। এই স্ত্রীর গর্ভেই ১৭১০ সালে হাজী মোহাম্মদ মোহসীন জন্মলাভ করেন। মোহসীন ছোট বেলা হইতেই সৎস্বভাব এবং দয়ালু প্রকৃতির ছিলেন। মোহসীন ধর্মীয় ব্যাপারে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই জন্য গাজাদারী ইত্যাদি পর্ব অত্যন্ত জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করিতেন। এই সময় তিনি অজস্র সদকা যাকাত দান করিতেন। হাজী মোহাম্মদ মোহসীন সারা জীবন অবিবাহিত ছিলেন। জীবনে বহুবার হজব্রত পালন এবং পবিত্র তীর্থস্থানগুলি পরিভ্রমণ করেন। এই উপলক্ষে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, ইরান, আফগানিস্তান, তুরস্ক এবং আরব সফর করেন। তিনি আরবী

www.waytojannah.com

Contents

ও ফারসী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাহার হস্তাক্ষর ছিল অত্যন্ত সুন্দর। তাহার হস্তলিখিত একখানি কুরআন শরীফ হুগলী লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রহিয়াছে। হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের সৎবোন মনুজানও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি (১৮০৩ সাল) তাহার সমুদয় সম্পত্তি হাজী মোহাম্মদ মোহসীনকে দান করিয়া যান। যেহেতু হাজী মোহাম্মদ মোহসীন বিপত্নীক ছিলেন এই জন্য তাহার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। তিনি একাই অগাধ সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর এই বিশাল সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী থাকিবে না এই জন্য তিনি ১৮১২ সালে এই সম্পত্তি জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করিতে মনস্থ করেন এবং এই মর্মে ১৮০৬ সালে তিনি অসিয়তনামা লিপিবদ্ধ করেন। তাহার এই অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক অসিয়তনামা নিম্নরূপ। এই অসিয়তনামা হুগলীর ইমাম বাড়াতে সংরক্ষিত আছে। Papers of Hoogly Imambara শীর্ষক বাংলা সরকারের রেকর্ডে এই অসিয়তনামার তর্জমা নিম্নরূপ ছিল ঃ

অসিয়ত-নামা

Registered by me at Hoogly, this 9th day of June 1806 of the hour of 3, under valume 122, Page 80 of book containing Deeds of leases and other temporary transfers.

Sd/. J. Hadges Registrar

I, Hazi Mohammad Mohsin son of Hazi Faizullah son of Aga Faizullah inhabitant of Hoogly, being in state of full possession of all the facilitiies and power to control and dispose of my property, as the law directs of my own free will and consent, do truly and legally declare and acknowledge that I have bequethed for pious uses and have given as an endowment in perpetuity, the whole of my Zamindary, or landed Estates of Pargana Syedpur etc. Situated In Zila Jessore, also Parganas sobhanol, Situated in the aforesaid Zilla and one house or building situated at Hoogly known by the name of Imambara, and also the Imambazar with the Hat of Market thereof likewise situated at Hoogly, also all the articles and furnitures etc. appertaining to the sald Imambara and contained in the seperate list, the whole of which descended to me by Inheritance, and so has been in my Propriety possession: and whereas I have no children or descandents or relations succed as my legal or lineal heirs for the purpose of preservling entire customary usages and charages of the pious works and ceremonies belonging to the celebrations of the relegious rits and festivals of the falthful, which has always been

www.waytojannah.com

observed by my family in all their generations, and which I propose to continue: therefore I have bequethed and endowed as aforesaid all the rights and apportunities whatsover to the aforesaid property purely and sincerely for the sake of God to the appropriated and disposed in manner following and for these purposes I have appointed, Rajab Ali Khan S/O Shaikh Md. Sadiq and Shakir Ali Khan of whose understanding and Sagacity and faith and observance of relegion I have had experience to be Mutawallis (prefects or superintendents) and have made over to these two persons all the bequests and endowments above mentioned that they, In every respect whatsover, mutually assisting and Co-operating with each other and acting with mutual consent and advice may preserve in the complete and due performance of this business entrusted to them in the following manner.

Namely that they, the Mutawllis, after dully discharging the Public Revenues of Government (for the landed estates in question) devlope the surplus proceeds of the mahals of the aforesaid into nine shares and first appropriate these shares thereof to the expenses of the relegious observance for the great Prophet and for the rest of his descendants, also for the expenses of the ten days fastivals of the Muharram and for the all other appointed fastivals; and for the repairs of the Imambara and buriai ground, and that they appropriate two shares of the said nine shares for their own use and enjoyment and four shares for maintaining the Amlah or establishment and the persons whose names are seperately written in a list signed and sealed by me, and in disposing of the pensions and allowances, whether daily or yearly pension and the better class of peadahs and others who now stand nominated to receive allowances ; the motawallis after me will exercise their discretion and authority either to continue or discontinue them as they may think proper and I have made over generally to these two persons the Tawliat or charge of superintendency. In the event of either mutawalli finding him self incompetent to discharge the function, he is authorised to appoint any person whom he may consider qualified for the duty in his stead.

To this end I have drawn up this deed or writing to be executed when necessity requires.

www.waytojannah.com

Dated the 9th Baisakh 1221, Hizri corresponding with 1213 B. S. (corresponding with 20th April 1806)

Signed Sealed and witnessed :

Signature of Waqif
Mohammad Mohsin

Witnesses :

1. Md Raza Tehrani (Umdatut Tujjar)
2. Nasrullah Khan bahadur
3. Khawja Faizullah
4. Sayed Fazal Ali

মুতাওয়াল্লীদের দুর্নীতিপরায়ণতা

অসিয়তনামায় রজব আলী এবং শাকের আলী খান নামক দুইজনকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা হয়। অতএব হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের মৃত্যুর পর তাহারা সমুদয় সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং যথার্থ মালিকের মত সম্পত্তির আয়-ব্যয়ের উপর অধিকার খাটাইয়া চলিতে লাগিলেন। ওয়াক্‌ফনামার উদ্দেশ্য এবং মর্ম যাহাতে সাধারণ্যে প্রচারিত না হয় তজ্জন্য তাঁহারা আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে সম্পত্তির আয়ের উপর দীর্ঘ দুই বছর যাবত ভোগ দখল করিতে থাকেন। কিন্তু সত্য কোনদিন গোপন থাকে না। ১৮১৪ সালে যশোরের কালেক্টর বিশেষ সূত্রে জানিতে পারিলেন যে, হাজী মোহাম্মদ মোহসীন তাহার সমুদয় সম্পত্তি ধর্মীয় এবং জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য উইল করিয়া গিয়াছেন। রজব আলী এবং শাকের আলী শুধু মুতাওয়াল্লী মাত্র। অতঃপর এই সম্পত্তি ১৮১০ সালের ভূমি সম্পত্তি আইনের ১০ নং বিধি অনুযায়ী সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু সরকার এখানে ভুল করিলেন যে, উক্ত দুইজনকেই এই সম্পত্তির দেখাশুনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ফলে, সম্পত্তির তহশীল এবং আয়-ব্যয় নিরূপণে নানা বিশৃংখলা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। অতঃপর ১৮১৬ সালে সরকার বাধ্য হইয়া এই মুতাওয়াল্লীদ্বয়কে পদচ্যুত করেন। তাহাদের বিরুদ্ধে বিরাট অংকের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। কিন্তু মুতাওয়াল্লীদ্বয় সরকারের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করে। তাহাদের দাবি ছিল ওয়াক্‌ফনামায় একমাত্র তাহাদিগকেই এই সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু আদালত তাহাদের কোন দাবিই শুনিলেন না। তাহাদের পদচ্যুতির উপর রায় বহাল করিলেন। ১৮১৭ সালে এই সম্পত্তির দায়িত্ব যশোহরের কালেক্টরের উপর অর্পণ করা হয় এবং এই বছরেই বোর্ড অব রেভিন্যুর অনুমোদন ক্রমে হুগলীতে মোহসেনীয়া মাদ্রাসার পত্তন করা হয়। মাদ্রাসার বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৬০ হাজার ৬০ টাকা। এই সমুদয় ব্যয় মোহসীন ফাণ্ড হইতে নির্বাহ

www.waytojannah.com

করা হইত। ১৮১৮ সালে নওয়াব আকবর আলী খানকে সরকার এই সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী ও এজেন্ট নিয়োগ করেন। কিন্তু সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ এবং ব্যবস্থাপনা বোর্ড অব রেভিন্যুর হাতে ছিল। যশোরের কালেক্টরের মধ্যস্থতায় এই সম্পত্তির কার্যক্রম পরিচালিত হইত।

পদচ্যুত মুতাওয়াল্লীদ্বয় সরকারের অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে পুনরায় মামলা দায়ের করেন এবং প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত এই মামলা গড়ায়। কিন্তু এই বারেও আদালত সরকারের পক্ষে রায় প্রদান করেন।

এই মকদ্দমা চলাকালীন ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় (জরুরী এবং নির্দিষ্ট খরচ বাদে) ক্রমশ জমা হইতে লাগিল। তাহা ছাড়া দুইজন মুতাওয়াল্লীর স্থলে একজন মুতাওয়াল্লী থাকায় সেখানেও খরচ কম হইতে লাগিল। এইভাবে ১৮২১ সাল অবধি প্রায় ৮ লক্ষ ৬১ হাজার ১ শত টাকা জমা হইল। এই সময় সরকার ওয়াক্ফের সমুদয় সম্পত্তির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়া প্রজাদের কাছ হইতে এককালীন ৬ লক্ষ টাকা উসুল করেন। কিন্তু এই সম্পত্তি নিয়া প্রিভি কাউন্সিল অবধি মামলা চলিতে লাগিল– এইজন্য সরকার আশংকা করিতে লাগিল যে, মামলায় যদি প্রথম মুতাওয়াল্লীদ্বয় জয়লাভ করে তাহলে এককালীন সেলামী সুদসহ প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এই জন্য সরকার সেলামীর টাকা সরকারী ঋণ হিসাবে লগ্নি করে। অতঃপর ১৮৩৫ সাল অবধি এই টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মামলার শেষ পর্যায়ে দশ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। মামলার রায় ঘোষণার পর সরকার উক্ত অর্থ মোহসীন ফান্ডে জমা করেন।

মোহসীন ফান্ড সম্পর্কে সরকারের নীতি

১৮৩৫ সালের ২৮শে অক্টোবর এক বিবৃতিতে (নং ২৮২) সরকার শিক্ষা বিভাগীয় জেনারেল কমিটিকে মোহসীন ফান্ড সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবরণ দান করেন ঃ

"গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের (মুতাওয়াল্লীদের নামে ওয়াক্ফকৃত) সমুদয় সম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ অধিকার রাখেন এবং তিনি যেইভাবে ইচ্ছা করেন এই ফান্ডের টাকার সদ্ব্যবহার করিবেন। অবশ্য ওয়াক্ফকারীর ইচ্ছা অনুযায়ী যথাসম্ভব সেই কাজ সম্পন্ন করা হইবে।

এখন সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িল যে, যশোহর স্টেটের এই সম্পত্তিই হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের ওয়াকফকৃত সম্পত্তি। সাব কমিটির ধারণানুযায়ী হুগলীর ইমামবাড়ার বিভিন্ন খরচ, ভাতা এবং কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদিতে বৎসরে প্রায় ৪৫ হাজার টাকা এই ফান্ড হইতে খরচ হইতেছে। এই খরচের ব্যাপারে হাজী মোহাম্মদ মোহসীন নিজেই অসিয়তনামায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

www.waytojannah.com

এই জন্য গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল এই অসিয়তনামার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াক্ফের সমুদয় আয়ের অংশ ইমামবাড়ার জন্য বরাদ্দ করিতে চান এবং অংশ বিশেষ সরকারী মুতাওয়াল্লী বা এজেন্টের জন্য বরাদ্দ করিতে চান। সরকার দ্বিতীয় কোন মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করিতে চাননা আর মোহসীন কর্তৃক নিয়োজিত মুতাওয়াল্লীদের বংশধরদের জন্যও কিছু বরাদ্দ করিতে সম্মত নহেন। ইহা ছাড়া বাদবাকি যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হইবে। এখানে আমি একথাও বলিতে চাই যে, এই জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন তৈয়ার করিতে হইবে। কেননা, পরবর্তীকালে কোন মুতাওয়াল্লী পুরানো নজীর উত্থাপন করিয়া কোন বিশৃংখলার যেন সৃষ্টি করিতে না পারে। সম্ভবত নূতন বন্দোবস্তের পর বর্তমান মুতাওয়াল্লী আকবর আলী খানের ভাতা ওয়াক্ফকারীর ইচ্ছার বাইরে কিঞ্চিৎ বেশি হইবে। কিন্তু বর্তমানে তিনি যেহেতু বেশি ভাতা পাইতেছেন এই জন্য এই ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করার কোন প্রয়োজন নাই। ওয়াক্ফকারী নয় ভাগের চার অংশ পেনশন ও কর্মচারীদের বেতনের জন্য বরাদ্দ করিয়াছিলেন, তাহা যেমন ছিল তেমনই থাকিবে। কিন্তু যেসব পেনশন বন্ধ হইয়া যাইবে উহা ফান্ডে জমা করিয়া অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা সরকারের থাকিবে। হাসপাতালের ব্যয় এই ফান্ড হইতেই নিয়মিত নির্বাহ করা হইবে কিন্তু রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, এই ফান্ডের কিছু অর্থ শিক্ষাখাতেও ব্যয় করা হয়, আগামীতে এই ফান্ড হইতে শিক্ষা খাতে খরচ না করিয়া বরং জেনারেল ফান্ড হইতে তাহা খরচ করা হইবে।

এইজন্য গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, এই শেষোক্ত অর্থ হইতে ইমামবাড়া ও অন্যান্য পবিত্র স্থাপত্যের মেরামত ও সংস্কার করা হইবে এবং অতঃপর উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা একটি ট্রাস্ট গঠন করা হইবে। অতঃপর এই ট্রাস্টের আমদানী ও অন্যান্য আয় হইতে শিক্ষা বিভাগের খরচ নির্বাহ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটি কলেজের পরিকল্পনাও কার্যে পরিণত করিতে হইবে। এই কলেজে সব রকম বিভিন্নমুখী শিক্ষার সমাবেশ থাকিবে।

গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে এইভাবেই ওয়াক্ফকারীর আসল উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই নতুন পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতের আয় নিম্নরূপ ধার্য করা হইবে ঃ

১. জমিদারীর বার্ষিক আয়ের নয় ভাগের এক অংশ।

২. বৃত্তি এবং ভাতার উদ্বৃত্ত অর্থ, যাহা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

৩. এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ফান্ডের আরো লভ্যাংশ যাহা প্রমিসারী নোট হিসাবে জমা হইবে।[৪৭]

৪৭. Bengal Education Code-1931

www.waytojannah.com

Contents

হুগলীর মোহসীন কলেজ

এই ফান্ডের আমদানী হইতে সর্বাগ্রে হুগলীতে একটি কলেজের পত্তন করা হয়। কলেজটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত ও অনুমোদিত। কলেজে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই ভর্তি হইতে পারিত। শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ মোহসীন ফান্ডের অর্থে এই কলেজের জন্য একটি ভবন খরিদ করেন এবং ১৮৩৬ সালের ১লা আগস্টে উহার উদ্বোধন করেন এবং কলেজটির নাম রাখা হয় মোহসীন কলেজ। উদ্বোধনের মাত্র তিনদিন পরই কলেজে ইংরেজি বিভাগের ছাত্র সংখ্যা বারো শতে উন্নীত হয়। তাছাড়া আরো ৩ শত ছাত্র ওরিয়েন্টাল বিভাগে ভর্তি হয়। ইংরেজি বিভাগে মুসলমানদের ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৩১ জন। পক্ষান্তরে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৯৪৮ জন। ওরিয়েন্টাল বিভাগেও মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৮১ আর হিন্দুদের সংখা ছিল ১৩৮। বাদবাকি ছাত্র ছিল বিদেশী। তা সত্ত্বেও এই কলেজের সমুদয় খরচ মোহসীন ফান্ড হইতে গ্রহণ করা হইত। উইলিয়াম হান্টারের মতে এই কলেজে বার্ষিক পাঁচ হাজার পাউন্ড ব্যয় হইত।

১৮৫০ সালে যখন মুসলমানদের মাঝে ইংরেজি শিক্ষা প্রসার লাভ করে তখন এই কলেজে মাত্র পাঁচ জন মুসলমান আর ৪৯০ জন হিন্দু ছাত্র ছিল। অনুরূপভাবে স্কুল বিভাগে ৭ জন মুসলমান আর ২৩০ জন হিন্দু ছিল। অথচ সরকার তারপরও একজন মুসলমান দানবীরের অর্থে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেন। মোহসীন ফান্ডের অর্থের অপব্যয় সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টার বলেন ঃ

এই অসিয়তনামা (হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের) জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। কি ধরনের কল্যাণমূলক কাজে এই অর্থ ব্যয় করা হইবে তাহাও এই অসিয়তনামায় সবিস্তারে উল্লেখ ছিল। যেমন, বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় পুণ্যকর্মাদি অর্থাৎ হুগলী ইমামবাড়া ও বড় মসজিদের মেরামত, কবরস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ, কতিপয় লোকের ভাতা, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ইত্যাদি। এই অসিয়ত অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পত্তনের গুরুত্ব রহিয়াছে, কিন্তু এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ মুসলমানদের, অমুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য নয়। মোহসীন কলেজে যেহেতু অমুসলমানদের প্রাধান্য বেশি এবং মুসলমানদের অবস্থান নামেমাত্র, অতএব এই কলেজ পত্তন সম্পূর্ণ অসিয়ত বিরোধী। কোন মুতাওয়াল্লী যদি অনুরূপ কার্য করেন তাহাও অবৈধ এবং অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। মুসলমানদের ওয়াক্ফ ধর্মীয় ব্যাপারের সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। এমনকি যেখানে শিয়া সম্প্রদায়দের কোন ওয়াক্ফ সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে হইলে তাহাও আইনগতভাবে বৈধ করিয়া লইতে হয়, সেখানে মুসলমানদের ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে হিন্দুরা কেমন করিয়া উপকৃত হইবে? মুসলমানদের অভিযোগ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু

www.waytojannah.com

সরকার মুসলমানদের এই ক্ষোভের প্রতি কোনরূপ আমল না দিয়া মোহসীন কলেজ পত্তন করিলেন। এই কলেজের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমানদের ধর্ম এবং ঐতিহ্য সম্পর্কিত কোন বিষয় ছিল না। তদুপরি কলেজের প্রিন্সিপাল এমন একজন ইংরেজকে নিয়োগ করা হইয়াছিল যিনি আরবী ফারসীর একবর্ণও জানিতেন না। প্রিন্সিপালের বেতন ধার্য করা হইয়াছিল ১৫ শত পাউণ্ড।

প্রায় পয়ঁত্রিশ বৎসর যাবত সরকার এই ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির টাকা অপাত্রে খরচ করিয়াছে। মুসলমানদের এই অভিযোগকে ঢাকা দিবার জন্য সরকার কলেজের সাথে একটি ছোট মাদ্রাসা পত্তন করেন। ইহা সম্পূর্ণ হাস্যকর প্রয়াস। যেখানে কলেজের বার্ষিক ব্যয় পাঁচ হাজার পাউণ্ড, সেখানে মাদ্রাসার ব্যয় ছিল মাত্র ৩ শত ৫০ পাউণ্ড।

হাজী মোহসীন এই ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় হইতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার মত কোন ইঙ্গিতই তাহার অসিয়তে করেন নাই। তিনি অসিয়তে জনকল্যাণমূলক কাজের উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই অসিয়তে অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজের পাশে শুধু ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। কিন্তু কার্যত সরকারের অপচেষ্টা ও হিন্দুদের ষড়যন্ত্রে হাজী মোহাম্মাদ মোহসীনের এই ওয়াক্‌ফ পদে পদে ব্যর্থ হয়।

বাংলা সরকারের নূতন শিক্ষানীতি

ভারত সরকারের নিদেশক্রমে বাংলা সরকার একটি নূতন শিক্ষা পরিকল্পনা তৈয়ার করেন যাহার অধিকাংশ ব্যয় মোহসীন ফান্ড হইতে করার প্রস্তাব করা হয়। এই পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) আগামীতে মোহসীন ফান্ডের অর্থ হইতে হুগলী কলেজের ব্যয় নির্বাহ করা হইবে না।

(২) যে অর্থ হুগলী কলেজে ব্যয় করা হইত এবং যে অর্থ আলিয়া মাদ্রাসার জন্য ব্যয় করা হইত–এই সমুদয় অর্থানুকূল্যে তিনটি বিশেষ ধরনের আরবী মাদ্রাসার পত্তন করা হইবে। মাদ্রাসা তিনটি নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) হুগলীতে একটি ছোট মাদ্রাসা।

(খ) ঢাকা অথবা চাটগাঁতে একটি মাঝারি ধরনের মাদ্রাসা।

(গ) এবং কলিকাতায় একটি বড় ধরনের মাদ্রাসা।

(৩) কলিকাতা এবং হুগলী মাদ্রাসার পরিচালনার জন্য আরবী জানা একজন ইংরেজ প্রিন্সিপাল নিয়োগ করিতে হইবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার অন্যান্য মাদ্রাসার জন্য স্বল্প বেতনে একজন ইংরেজ অফিসার নিয়োগ করা হইবে।

www.waytojannah.com

(৪) মোহসীন ফান্ড এবং মাদ্রাসার গ্রান্ট সর্বমোট ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা হয় (তন্মধ্যে আলিয়া মাদ্রাসার বর্তমান খরচ ৪৬ হাজার টাকা, ছাত্র বেতন ১৫০০ টাকা এবং স্কলারশীপের সাত হাজার টাকাও ইহাতে শামিল রহিয়াছে)। এই টাকা নিম্নোক্ত খাতে ব্যয় করা হইবে ঃ

(ক)	আলিয়া মাদ্রাসার খরচ ও প্রিন্সিপালের বেতন	৫০,০০০ টাকা
(খ)	হুগলী মাদ্রাসা	১১,০০০ টাকা
(গ)	ছাত্র বৃত্তি ইত্যাদি	৭,০০০ টাকা
(ঘ)	বিবিধ	৫,০০০ টাকা
(ঙ)	ঢাকা কলেজের আরবী বিভাগের জন্য	৪,০০০ টাকা
(চ)	চট্টগ্রাম মাদ্রাসার	২৭,০০০ টাকা
(ছ)	হুগলী কলেজের সাহায্য	৫,০০০ টাকা

(৫) শিক্ষা বিভাগের প্রধানকে এই মর্মে তাগিদ করা হইতেছে যে, প্রত্যেক বিভাগে মুসলমানদের নিয়োগের ব্যাপারে যেন গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ ডেপুটি ইন্সপেক্টর ও নর্মাল স্কুলের চাকুরী ইত্যাদি।

(৬) মোহসীন ফান্ডের যে টাকা কোথাও ব্যয় হয় নাই এবং তা সরকারী তহবিলে আছে, কলিকাতায় একটি ছাত্রাবাস এবং চট্টগ্রামের মাদ্রাসা ভবন ও ছাত্রাবাস নির্মাণ কার্যে তাহা ব্যয় করিতে হইবে।

এই রিপোর্ট যথাসময়ে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলের খেদমতে পেশ করা হয়। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক সারা দেশের শিক্ষা পরিস্থিতি তথা এই রিপোর্ট সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন ঃ

রিপোর্টের সর্বত্রই একটি বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদেরকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই এবং মুসলমান যুবকরা সত্যিকার শিক্ষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া নিজেদেরকে যথার্থ উপযুক্ত করিয়া তুলিতে ব্যর্থ হইয়াছে। রিপোর্টে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, সরকার দেশে যে শিক্ষা প্রবর্তন করিতে সচেষ্ট মুসলমানরা সেই ব্যাপারে তেমন বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না। অবশ্য বর্তমান শিক্ষামাধ্যম ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাহারা বিরোধিতা করে। তাহাদের এই বিরোধিতার পিছনে তাহাদের পুরনো সংস্কার, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের কারণও বিদ্যমান। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দুর্বল পদ্ধতি তাহাদের এই অমনোযোগিতাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যে ভাষার প্রবর্তন করা হইয়াছে, মুসলমানরা তাহাতে মোটেই সম্মত নহে। কিন্তু এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা এমন কোন জটিল ব্যাপার নয় যে, উহার একটি সুচিন্তিত সমাধান করা যাইবে না।

www.waytojannah.com

এই ব্যাপারে বাংলাদেশের লেঃ গভর্নরের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, তিনি সেখানকার স্থানীয় আনুকূল্যের মাধ্যমে এই শিক্ষা সম্পর্কিত বিসাদৃশ্যের নিরসন করিতে চান। এ ব্যাপারে স্মর্তব্য যে, ১৮৭১ সালে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল স্কুলগুলিতে আরবী ও ফারসীর প্রবর্তন করিতে হইবে। প্রয়োজন বশত মুসলমানরা স্কুলে এই উভয় ধরনের শিক্ষার সংস্পর্শ লাভ করিতে পারিবে। মাদ্রাসা শিক্ষারও পুনর্বিন্যাস সাধন করিতে হইবে। মোহসীন ফান্ডের টাকায় এ যাবত শুধু হুগলী কলেজই পরিচালিত হইতেছিল, ইহার পর এই ফান্ডের টাকায় প্রদেশের সকল ব্যয়সাপেক্ষ স্থলে খরচ করার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, যাহাতে সকল অঞ্চলের মুসলমানরা এই ফান্ডের অর্থে উপকৃত হইতে পারে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ও এই মর্মে রাজী হইয়াছে যে, ডিগ্রী পর্যায়ের পরীক্ষাগুলিতে আরবী ও ফারসী অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

গভর্নর জেনারেল ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির শিক্ষাও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে চালু করিবার পক্ষপাতী। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করিবার জন্য মুসলমানদের গ্রন্থাবলী শিক্ষার বিষয়ভুক্ত করিবার জন্য গ্রন্থাবলী প্রণয়ন তৎপরতা শুরু করিতে হইবে এবং এইজন্য আর্থিক সাহায্য ও পুরস্কারাদির বন্দোবস্ত করা উচিত। এই ব্যাপারে অন্যান্য ভাষার অনুবাদকর্মও শুরু করিতে হইবে।

সরকার নীতিগতভাবে শিক্ষা সম্পর্কিত সকল সহযোগিতা ও সাহায্য এমনভাবে খরচ করিতে চান যাহা সকল বাসিন্দার ভাষা এবং সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে এবং এই সঙ্গে উৎকৃষ্ট শিক্ষা বিষয়গুলিও (ইংরেজি) যাহাতে সম্প্রসারিত হইতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

মোটকথা, ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারের এই সর্বশেষ শিক্ষা প্রস্তাব পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করেন এবং এই মর্মে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এ সি লয়ালের মাধ্যমে বাংলা সরকারকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, এই সম্পর্কে বিস্তারিত ক্ষমতা প্রয়োগাদি প্রাদেশিক সরকার করিবেন। অতঃপর প্রদেশের শিক্ষা খাতে আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা বরাদ্দ করেন এবং সম্পূর্ণ নতুনভাবে একজন ইংরেজ প্রিন্সিপাল নিয়োগ অনুমোদন করেন (নির্দেশ নং ২৪৮ তাং ১৩ই জুন, ১৮৭৩ সাল)।

প্রিন্সিপাল পদের শর্তাবলী

সরকার কলিকাতা মাদ্রাসা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য মাদ্রাসার তদারকের জন্য মাসিক এক হাজার টাকা বেতনের একজন সুযোগ্য ও সুদক্ষ প্রিন্সিপাল নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। প্রিন্সিপালের এই বেতন মোহসীন ফান্ড হইতে প্রদান করা হইবে। আরবী ফারসী ভাষায় প্রিন্সিপাল বিশেষ ব্যুৎপন্ন থাকিবেন যাহাতে তিনি নিজে ছাত্রদের পড়াইতেও পারেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানেও যথেষ্ট পণ্ডিত হইবেন। এই সমুদয় যোগ্যতার বাহিরে তাহার ব্যক্তিত্বও থাকিতে হইবে প্রভাবশালী।

www.waytojannah.com

এদেশের যুবকদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবার ব্যাপারে তিনি থাকিবেন একজন যথার্থ আদর্শ পুরুষ এবং আলোর দিশারী। মোটামুটিভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক হইতে তিনি সরকারী স্কুলসমূহের হেড মাস্টারের সমমানের হইবেন এবং জনসাধারণের প্রতি তাহার বিশেষ প্রভাব থাকিতে হইবে।

এই শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অতঃপর ১৮৭৮ সালে মিঃ এ. ই. গোগকে প্রিন্সিপাল পদে নিয়োগ করা হয়।

তিনটি নূতন মাদ্রাসা

পূর্ব প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় তিনটি মাদ্রাসার পত্তন করা হয়। ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত এই তিনটি মাদ্রাসার জন্য যথাসময়ে সুযোগ্য সুপারিনটেনডেন্ট ও শিক্ষকমণ্ডলীও নিয়োগ করা হয়। কলিকাতা মাদ্রাসার সিলেবাস অনুযায়ী এই মাদ্রাসার পাঠ্য বিষয় প্রবর্তন করা হয়। এই তিনটি মাদ্রাসার জন্য বিশেষ নির্দেশে বলা হইয়াছিল যে, ছাত্ররা ইংরেজি পড়িতে ইচ্ছুক হইলে মাদ্রাসা বিশেষে সেখানে ইংরেজি চালু করিতে হইবে। তবে ঢাকা মাদ্রাসার উদ্বোধনের সময় হইতেই ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। কলিকাতা মাদ্রাসার আভ্যন্তরীণ শিক্ষা পদ্ধতি ও শৃংখলার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করা হয়। ফেকার অধ্যায় বিশেষ এবং নির্ভরযোগ্য অংশ পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

মোহসীন ফান্ড হইতে স্কুল ও কলেজে সর্বমোট ৪২টি বৃত্তি বরাদ্দ করা হয়। অতএব আলিয়া মাদ্রাসার জন্যও ১০ই জুলাই ১৮৭৪ সালের ২২৪৮ নং নির্দেশ অনুযায়ী ১৮টি বৃত্তি সংরক্ষণ করা হয়। তন্মধ্যে চারটি বৃত্তির অংক প্রতিসাসে ৮ টাকা হিসাবে, চারিটি ৬ টাকা হিসাবে, চারিটি ৪ টাকা হিসাবে এবং দুইটি প্রতিমাসে ৩ টাকা হিসাবে প্রদত্ত হইবে। এবং এই বৃত্তি শুধু আরবী বিভাগের ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ করা থাকিবে। এই বৃত্তি ব্যবস্থা ১৯৩৬ সাল অবধি বলবৎ ছিল অতঃপর সরকার এক নির্দেশে (নং ২৯৩৯ তাং ৩১শে আগস্ট ১৯৩৬ সাল) আট টাকার দুইটি বৃত্তি হ্রাস করেন। তখনকার দিনে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুলে মোহসীন ফান্ডের বৃত্তির বদৌলতে বহু ছাত্র বিনা বেতনে বা অর্ধেক বেতনে পড়াশুনার সুযোগ লাভ করে। বাংলাদেশের এমন অনেক স্কুল ছিল যেখানে ফারসী বিষয়ের শিক্ষকের বেতন সম্পূর্ণভাবে মোহসীন ফান্ড হইতে দেওয়া হইত।

এই সমুদয় শিক্ষানীতি হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, বাংলা সরকার মুসলমানদের জন্য আর বাড়তি কোন অর্থ বরাদ্দ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে মোহসীন ফান্ডের অর্থানুকূল্যেই মুসলমানদের শিক্ষার যৎসামান্য সহায়তা হইয়াছে, সরকারের ইহাতে তেমন কোন দান নাই। কেননা সরকার ২৯১৮ নং নির্দেশে পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, কোন বিভাগেই সরকার বিশেষ কোন অর্থ বরাদ্দ করিবেন না। অবশ্য এই ব্যাপারে হিন্দুদের ষড়যন্ত্র বিশেষভাবে কার্যকরী ছিল।

www.waytojannah.com

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণের পিছনে সরকারের যে উদ্দেশ্য নিহিত ছিল জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরকে প্রদত্ত (নং ১২০০৯ তাং ১৯শে জুলাই ১৮৭৩ ইং) সরকারের এক চিঠিতে উহা বিধৃত হইয়াছে ঃ

সরকারী স্কুল এবং কলেজের শিক্ষা বিষয় ও পদ্ধতি সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মনঃপুত নয় বলিয়া একটি চিরাচরিত অভিযোগ চলিয়া আসিতেছে। মুসলমানদের এই অভিযোগ দূরীভূত করার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাহশাহীতে তিনটি মাদ্রাসার পত্তন করা হইয়াছে। কেননা এই দেশের প্রচলিত নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করাও সরকারী শিক্ষানীতির অন্যতম অঙ্গ।

জনশিক্ষা বিভাগের ১৮৮১–৮২ সালের রিপোর্টে মাদ্রাসা সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে ঃ

মুসলমানদের এই বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার একমাত্র প্রতিষ্ঠান আলিয়া মাদ্রাসা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এবং এই খাতে সরকারী অর্থ তহবিল হইতে প্রতি বছর ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হইতেছে। এই মাদ্রাসায় আরবী বিভাগ নামে একটি বিশেষ বিভাগ রহিয়াছে। এই বিভাগের সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা ২৫৩ জন। অন্য বিভাগটির নাম এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ। এই বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স মান অবধি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিভাগের ছাত্রসংখ্যা ৩৮৬ জন। এই বিভাগে সংশ্লিষ্ট একটি প্রাথমিক স্কুল আছে। এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৪৮৪ জন। এই মাদ্রাসার সর্বমোট ১১২৩ জন ছাত্রের মধ্যে ৭১৬ জন ইংরেজি পড়ে। সরকার মোহসীন ফান্ডের আয় মুসলমান ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। মোহসীন ফান্ডের বর্তমান বার্ষিক আয় ৫৫ হাজার টাকা। এই টাকা হইতে ২৮ হাজার টাকা ঢাকা, হুগলী, রাজশাহী ও চট্টগ্রামের মাদ্রাসার জন্য ব্যয় করা হয়। এই মাদ্রাসাসমূহে কলিকাতা মাদ্রাসার সিলেবাস অনুসৃত হয়। প্রত্যেক মাদ্রাসাতেই ইংরেজি শিক্ষার মান এন্ট্রান্স-এর সমান। এই চারটি মাদ্রাসার ১০৪৮ জন ছাত্রের মধ্যে ৩২২ জন ইংরেজি পড়ে। মোহসীন ফান্ডের বাকি ২৭ হাজার টাকা বিভিন্ন শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়। বস্তুত এই ফান্ড হইতে ৮ হাজার টাকার মত কলিকাতার বাইরের কিছু কলেজের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মুসলমান ছাত্রদের বেতনের বাবদে খরচ করা হয়। তাছাড়া কতিপয় স্কুলের আরবী এবং ফারসী শিক্ষকদের বেতনও এই ফান্ড হইতে প্রদান করা হয়। এই ফান্ড হইতে ৯ হাজার টাকা বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হয়। ১৮৮১ সালের সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী কলিকাতার বাইরেও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বেতন হ্রাস বা মওকুফ করা হইয়াছে। এই নূতন পদ্ধতিতে যেসব ছাত্র কলিকাতায় পড়াশুনা করিবে তাহাদের জন্য বিশেষ ফলদায়ক হইবে।

www.waytojannah.com

১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশন

১৮৮২ সালে লর্ড রিপন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি শিক্ষা কমিশনের পত্তন করেন। এই কমিশন বৃটিশ ইণ্ডিয়ার সামগ্রিক শিক্ষা, বিশেষভাবে মুসলমানদের শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করিবেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও 'Our Indian Musalman' গ্রন্থের লেখক মিঃ ডব্লু ডব্লু হান্টারকে এই কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। বৃটিশ সরকারের সুদক্ষ অফিসার এবং বিখ্যাত লেখক হিসাবে পরিচিত মিঃ হান্টার ভারতের সত্যিকার পরিস্থিতি এবং চাহিদা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। তিনি বহুকাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত ছিলেন। এই কমিশন ব্যাপক ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদদের বিশেষ সাক্ষাৎকার এবং পরামর্শ গ্রহণ করেন। কমিশন বাংলাদেশের শিক্ষা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিবার জন্য মিঃ এ ডব্লু ক্রাফ্‌ট্‌-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি এই দেশের শিক্ষা প্রসঙ্গে দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ইহারা দুইজন ছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফ খান বাহাদুর সি. আই. এ ও রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলী।

নওয়াব আবদুল লতিফের বিবৃতি

নওয়াব আবদুল লতিফকে সর্বাগ্রে বাংলা দেশের প্রাইমারী শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ১৮৮০-৮১ সালের রিপোর্টের ১০৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছিল যে, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার (এই তিন প্রদেশ একীভূত ছিল) প্রাইমারী স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা ১৫৬০৮১ অথচ মুসলমানদের সর্বমোট জনসংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষের কাছাকাছি। এখন স্কুলের সংখ্যাসাম্য সম্পর্কে আপনারাই বিবেচনা করুন। আমার মতে বাংলাদেশের কৃষক-মজুর শ্রেণীর জন্য সত্যিকার অর্থে কোন প্রাইমারী স্কুল নাই। এই প্রসঙ্গে আমি দৃপ্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিতে চাই যে, বাংলা সরকার ১৮৮১ সালের ১৯শে নভেম্বর যে রেজুলেশন প্রকাশ করিয়াছিলেন উহার সাতটি দফাতে কি ছিল? উক্ত রেজুলেশনে নিম্নোক্ত বিবৃতি ছিল ঃ

"দেশে প্রচলিত সাধারণ প্রাইমারী স্কুলগুলি হিন্দুদের জন্য যেমন উপযোগী তেমনি মুসলমানদের জন্যও সমান উপযোগী। কেননা, মুসলমানদের মাতৃভাষা আর হিন্দুদের মাতৃভাষা একই। মুসলমানদের 'মকতব'গুলিতেও (যেখানে কুরআন পড়ানো হয়) সরকারী অর্থানুকূল্যের ব্যবস্থা করিতে পারিয়া বাংলার লেঃ গভর্নর বিশেষ হৃষ্ট হইয়াছেন। তবে শর্ত হইল এইসব মকতবে যৎ-কিঞ্চিৎ মাতৃভাষা ও অংক শিখাইতে হইবে।

www.waytojannah.com

মকতব

মকতবে মূলত কুরআন শরীফ পড়ানো হয়। এই মকতবে নিম্নবিত্তদের চাইতে মধ্যবিত্তের ছেলেপিলেরা বেশি পড়াশুনা করে। অতএব এই মকতবে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করা হইলে মধ্যবিত্তের মাঝে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা সম্প্রসারণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু নিম্নবিত্তরা ইহাতে মোটেই উপকৃত হইবে না। এ ব্যাপারেও আমরা পুরাপুরি ধারণা পাই যে, বাংলার মামুলী পাঠশালা ব্যবস্থা সাধারণ মুসলমান কৃষকদের পক্ষে কতটুকু উপকারী হইবে। কেননা, আমি জানি এইসব পাঠশালা বা চণ্ডিমণ্ডপে হিন্দুদের পদ্ধতি ও রীতি-রেওয়াজের প্রাধান্যই বেশি। এইসব পাঠশালার গুরু (শিক্ষক) হিন্দুরাই থাকেন। ছাত্ররাও বেশির ভাগ হিন্দু অতএব এই পাঠশালা মুসলমানদের ছেলেপিলেদের জন্য উপযোগী নহে। ইণ্ডিয়ান মুসলমানের লেখক তাহার পুস্তকের ১৭৮ পৃষ্ঠায় ইহার একটি চমৎকার চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন ঃ

মুসলমানদের তিনটি প্রধান ভাবাবেগের দরুন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পদে পদে ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। প্রথমত শিক্ষার মাধ্যম যেহেতু বাংলা চালু করা হইয়াছে এইজন্য মুসলমানরা এ ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেন। কেননা, শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান মুসলমানরা ইহা খুবই অপছন্দ করেন। দ্বিতীয়ত এইসব স্কুলের শিক্ষকরা প্রায় সকলেই হিন্দু। এইসব স্কুল শিক্ষকরা যখন মুসলমান ছাত্রদের সহিত জোড়াতালি দিয়া উর্দু বলার চেষ্টা করে তখন এক হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত হিন্দু শিক্ষকদের ব্যবহার ও শিক্ষা পদ্ধতি মুসলমান ছাত্রদের মনে শ্রদ্ধার চাইতে বরং অশ্রদ্ধার সৃষ্টিই বেশি করে। কিছু দিন পূর্বে একজন মুসলমান কৃষক ওনৈক ইংরেজ অফিসারকে জানায় যে, দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নাই যে মুসলমানদেরকে হিন্দু শিক্ষকদের কাছে পড়িতে বাধ্য করিবে।"

প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষা-মাধ্যম

আমি ড. হান্টারের ধারণার সহিত একমত যে, প্রাথমিক শিক্ষা বাংলা ভাষার মাধ্যমে হওয়া চাই। কিন্তু সে বাংলা কি তথাকথিত পাঠশালার সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা। সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা হিন্দুদেরই চিন্তা, ধ্যান-ধারণা এবং মানসিকতার ফসল। এইসব পাঠশালার ভাষা এমন ধরনের বাংলা হইতে হইবে যে, উহা সংস্কৃত এবং পুঁথির মাঝামাঝি পর্যায়ের হইবে। কেননা পুঁথি সাহিত্যে আরবী-ফারসীর শব্দ এবং প্রবাদাদি রহিয়াছে।

এ ধরনের ভাষা প্রচলিত নহে একথা বলা সম্পূর্ণ অবান্তর হইবে। এধরনের মাঝামাঝি বাংলা ভাষা প্রদেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে চালু রহিয়াছে। আপনারা এ ব্যাপারে সুবিদিত যে, ইসলামী বিধান অনুযায়ী দীর্ঘকাল ফৌজদারী আদালত পরিচালিত হইয়াছে। তাছাড়া ইহাও সকলের জানা আছে যে, শুধু ফারসীই

www.waytojannah.com

একমাত্র বিচার বিভাগীয় ভাষা ছিল। আদালত হইতে ফারসীকে বাদ দেওয়ার পর বহু ফারসী বিশেষজ্ঞ বিচারক, কৌঁসুলী ও অন্যান্য কর্মচারী সমাজে বিচরণ করিতেছেন যাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষায় ফারসীর প্রাধান্য রহিয়াছে। আরবী-ফারসীর সংমিশ্রণে তৈরি মাঝারি ধরনের বাংলাভাষা হিন্দু-মুসলিম উভয়েরই বোধগম্য হয়। অতঃপর ইহাই যেন প্রকৃত মাতৃভাষায় পরিণত হইয়াছে। বইপুস্তকে যে সব সংস্কৃত শব্দ দৃষ্ট হয় তাহা সংস্কৃতের প্রভাব প্রসূত। এই জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। মুসলমানদের পাঠশালাতে সংস্কৃত ঘেঁষা কোন বাংলা পুস্তকই যেন না থাকিতে পারে।

আমার মতে বর্তমান প্রাইমারী শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী (বর্তমানে শ্লেট পেন্সিলে যে অংক শেখানো হয় তাহার পরিবর্তে) অংক শিক্ষা দেওয়া উচিত। অংক শিক্ষা দেওয়ার এই উভয় পদ্ধতিই যদি একসঙ্গে কার্যকরী করা সম্ভব না হয় তাহলে নূতন পদ্ধতির পরিবর্তে পুরনো পদ্ধতির প্রাধান্য দেওয়া উচিত হইবে। কেননা শেষোক্ত পদ্ধতিতে ছাত্ররা বেশি উপকৃত হইবে। এই সম্পর্কে সরকার পূর্বাহ্নেই জনশিক্ষা বিভাগের জেনারেল রিপোর্টের (১৮৮০-৮১) ১৪০ নং দফার মাধ্যমে অবগত হইয়াছেন।

অংক ছাড়া প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রদের সাধারণ পঠন প্রণালীর উপর জোর দিতে হইবে যাহাতে ছাত্ররা আদালতের নথিপত্র, অফিসের কাগজপত্র ও জমিদারীর রসিদপত্র ইত্যাদি সহজেই পড়িতে পারে। অনুরূপভাবে ছাত্রদেরকে লেখার প্রতিও আকৃষ্ট করিতে হইবে। তাহারা ছোট ছোট বাক্যাদি যেন সহজেই লিখিতে পারে।

মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য এখন হইতে মুসলমান ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়োগ করিতে হইবে। ১৮৮০-৮১ সালের শিক্ষা রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, নর্মাল স্কুলগুলিতে (লেঃ গভর্নরের অধীনস্থ) ৩০ জন মুসলমান ৫৩৭ জন হিন্দু ও ৭৫ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী শিক্ষক ছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হইবে যে, বাংলাদেশের মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম। আমাদের মতে মুসলমান শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। কেননা, যোগ্য এবং বক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষকের উপরই প্রাইমারী শিক্ষার উন্নতি ও সম্প্রসারণ নির্ভরশীল।

প্রাইমারী শিক্ষার উন্নতির উপায়

ডঃ হান্টার এই ব্যাপারেও Our Indian Musalman গ্রন্থের ২০৫ নং পৃষ্ঠায় বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশের নিম্নস্তরের লোকদের কাছেও প্রাইমারী শিক্ষার আলোক পৌঁছাইতে হইবে। কিন্তু মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন আমি উহার সহিত একমত নহি।

www.waytojannah.com

তিনি বলেন ... "তাহা সত্ত্বেও আমার একান্ত বিশ্বাস, সরকার অতি অল্প খরচে সকল পর্যায়ের মুসলমানদের জন্য বেশ ভাল শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। এই শিক্ষায় উত্তম, মধ্যম ও নিম্নমান—এই তিন ধরনের বন্দোবস্ত থাকিবে। নিম্নমানের শিক্ষা ব্যবস্থাগুলির জন্য সরকারের গ্রান্ট ইন এইডের যথেষ্ট বন্দোবস্ত থাকিবে। এই ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করার ততখানি প্রয়োজন নাই যতখানি মুসলমানদের অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রগুলির জন্য প্রয়োজন রহিয়াছে। সরকার একথা ঘোষণা করিয়া অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন যে, প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর একটি স্কুল থাকিতে হইবে। পাঁচ মাইলের ভিতরে কোন স্কুল থাকিলে সরকার তাহাতে কোন সাহায্য করিবেন না। কেননা এই ধরনের খরচে মূলত সরকারের ক্ষতি হইবে এবং অনর্থক জোট তৈরির সুযোগ হইবে।"

চতুর হিন্দুরা এইক্ষেত্রেও অন্যান্য ব্যাপারের মত অগ্রগামী। তাহারা সারা দেশের আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো এমন সব স্কুল পত্তন করিয়াছে যে, তাহাতে তাহাদেরই প্রয়োজন সাধিত হইবে এবং পক্ষান্তরে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এইজন্য এই পাঁচ মাইলের আইনকে কিঞ্চিৎ শিথিল করা উচিত যাহাতে মুসলমানদের স্কুলগুলি গ্রান্ট লাভ করিতে পারে। এই স্কুল যত ব্যবধানের মাঝখানেই হউক না কেন, যেখানে আলাদা স্কুলের প্রয়োজন নাই সেখানে সরকার মুসলমানদের বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে পারেন। ওখানকার হিন্দু স্কুলগুলিতে একজন স্বল্প বেতনের মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে। সপ্তাহে পাঁচ শিলিং-এর বিনিময়ে এই ধরনের মুসলমান শিক্ষক পাওয়া যাইবে।

পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলির প্রাইমারী শিক্ষা সম্পর্কে আমার বক্তব্য হইল, মুসলমান কৃষক মহল পর্যন্ত যোগসূত্র স্থাপনের জন্য সরকার একটি বিভাগের পত্তন করিবেন। এক সময় হিন্দুদের জন্যও এই ধরনের সংস্থার প্রয়োজন ছিল। এই সময় লর্ড হার্ডিঞ্জ বিভিন্ন জেলাতে অসংখ্য সরকারী স্কুলের পত্তন করেন। স্থানীয় লোকেরা এই ধরনের স্কুল নিজেদের খরচায় চালাইতে পারিত না। ১৮৬৬ সালে এই ধরনের প্রায় আটত্রিশটি স্কুল আমার পরিচালনাধীন ছিল। এইসব স্কুলে সরকারের বার্ষিক ১১শত পাউণ্ড খরচ হইত। ছাত্র বেতন আলাদা ছিল। তাহাতেও প্রায় ২৬৭ পাউণ্ড আমদানী হইত। যদিও এইসব স্কুল স্থানীয় জনগণের একক প্রচেষ্টায় চলিতে পারিত না তবুও এই স্কুল প্রতিষ্ঠায় যে উপকার হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। যেখানেই কৃষক শ্রেণী গরীব অসহায় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নিতান্ত গোঁড়া ছিল সেখানে অস্থায়িভাবে একটি হার্ডিঞ্জ ইন্সটিটিউটের পত্তন করা হইত এবং প্রথম দিকে গ্রাম্য লোকরা বিনা পয়সায় শিক্ষালাভ করিত। ইহার পর যখন তাহারা শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িত তখন তাহাদের কাছ হইতে ফিসও আদায় করা হইত। ইহার পর কয়েক বছরেই একটি

www.waytojannah.com

সাহায্যমূলক স্কুলের বদলে একটি হাই স্কুল জন্ম লাভ করিত। অতঃপর এই হার্ডিঞ্জ স্কুল দেশের অন্য অনুন্নত অঞ্চলের জন্য স্থানান্তর করা হইত। এই ভাবে বাংলা দেশের পশ্চিম দক্ষিণাঞ্চলের অজ পাড়াগাঁয়েও ক্রমশ শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। ১৮৬৫-৬৬ সালে এতদঞ্চলে ২৮০টি স্কিুল ছিল। এইসব স্কুলের সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৬০৪৩ জন। আমার মতে দেশের পূর্বাঞ্চলেও এই ভাবে শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। উত্তরাধিকার সূত্রে সরকার এবং প্রচলিত শিক্ষার বিরোধিতা পোষণকারী এই গোঁড়া এবং আদিম লোকদের মধ্যে গ্রান্ট ইন এইড কোনরকম কার্যকরী হইতে পারে না। তবে সস্তা ধরনের গোটা দশেক স্কুলের পত্তন করিয়া তাহাতে স্বল্প বেতনের মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ করিয়া এবং ইহার বেশির ভাগ ব্যয় যদি সরকার বহন করিতেন তাহা হইলে পূর্ব বাংলার লোকদের মনোভাব এক পুরুষের আমলেই পরিবর্তিত হইত। এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রথমত তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু আস্তে আস্তে মুসলমান কৃষক শ্রেণীর যুবকদের মন ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। এবং স্বল্প বেতনভোগী মুসলমান শিক্ষকদের প্রতিও তাহারা অনুরক্ত হইয়া পড়িত। সরকার প্রদত্ত সাপ্তাহিক পাঁচ শিলিং এইসব শিক্ষকদের জন্য যথেষ্ট। এইভাবে আমরা আমাদের বিরোধিতা পোষণকারী এই জাতিকে অতি সহজেই আয়ত্তে আনিতে পারিব।"

আমাকে প্রাইমারী শিক্ষার সমস্যাদি সম্পর্কে পুরাপুরি ব্যাখ্যা করিতে হইলে ইহার রাজনৈতিক দিকও পর্যালোচনা করিতে হইবে। পাক ভারতের ওহাবী আন্দোলন বাংলাদেশের কৃষক মজুরদের মনে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সেই সম্পর্কে ডঃ হান্টার তাহার গ্রন্থে (১৪৭ পৃষ্ঠায়) মিঃ ওকনীলের বক্তব্য পেশ করেন ঃ

'এই ধ্বংসাত্মক আন্দোলন মুসলমানদের কৃষক শ্রেণীর মাঝে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে উহার কারণ ইহাদের শিক্ষার প্রতি বৃটিশ সরকারের অন্যায়মূলক অমনোযোগিতা।"

আমিও গত বিশ বছরে এই ব্যাপারে প্রচুর গবেষণা করিয়াছি এবং প্রায় এই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, আমি এই প্রভাব সম্পর্কে ততবেশি সংবেদনশীল নই যতটুকু মিঃ ওকনীলে বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও বিপ্লবের সকল দাবানল সরকারী প্রচেষ্টা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যেমন মওলানা কেরামত আলী ও তাহার পুত্র মওলবী হাফেজ আহমদের উপদেশ ও বক্তৃতার গুণে চাপা পড়িয়াছে, কিন্তু জনসাধারণ যদি এইভাবে ভ্রান্ত পথেই অগ্রসর হইতে থাকে তাহলে সব সময় রাজনৈতিক বিশৃংখলার আশংকা থাকিবে।

আমি এই ব্যাপারে সচেতন যে, লোকেরা আমার এই মতামতের সহিত হান্টারের বক্তব্যের মিল খুঁজিয়া পান। কিন্তু তাহাদিগকে আমার বলার কিছু নাই। এই ধরনের

www.waytojannah.com

মিল দুনিয়ার সকল ব্যাপারেই পরিলক্ষিত হয়। তবে সত্যিকার এবং সঠিক ঘটনাবলী কোন সময় উপেক্ষা করা চলে না। আমার মতের সহিত হান্টারের বক্তব্যের মিল আছে জানিয়া আমি বরং আরো বেশি আশ্বস্ত হইলাম এবং দৃঢ়চিত্তে আমি মত প্রকাশ করিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিতেছি।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মধ্যবিত্ত লোকদের শিক্ষা সম্পর্কে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন ঃ

"লোর বাংলার মধ্যবিত্তদের শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি এবং ছাত্র সংখ্যা সম্পর্কে জনশিক্ষা বিভাগের রিপোর্টের ১০৬ ও ১০৭ নং পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ পরিসংখ্যান প্রদান করা হইয়াছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মুসলমান ছাত্রসংখ্যা	হিন্দু ছাত্রসংখ্যা
ইংরেজি হাই স্কুল	৩৬০৩	৩৬৬৮৬
ইংরেজি মিডল স্কুল	৪৩৪৬	২৯৪৬৯
ভার্ণাকুলার মিডল স্কুল	৭৪৭৫	৪৬২৮১
লোর ভার্ণাকুলার স্কুল	৯৮৯৯	৪৮২৬৯
মাদ্রাসা	১৫৫৮	২৮৩৫
অন্যান্য স্কুল	৪০৮	৬৫৪১

আমার মতে এইসব স্কুল দ্বারা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্ররা যথাযথভাবে উপকৃত হইতে পারে না দুইটি কারণে। প্রথমত বেতন দানের অক্ষমতা, দ্বিতীয়ত স্কুলের দূরত্ব।

মধ্যবিত্তদেরকে সাধারণত দরিদ্রই বলা যাইতে পারে। মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইহাদের অবস্থার আরো অধঃপতন ঘটিয়াছে। উপরোক্ত কারণ দুইটি আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাদের বিশেষ বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। এই বন্ধ্যাত্ব দূর করিতে হইলে হয় ফিস হ্রাস করিতে হইবে অন্যথায় বিশেষ ছাত্র বৃত্তির বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই সঙ্গে আমাদের এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধারণ স্কুল মুসলমানদের উদ্দেশ্যমূলক বিষয়াদির শিক্ষা দিতে পারে না। ইংরেজি তো মুসলমানরা অবশ্যই শিখিবে এবং এই ব্যাপারে আর কোন কথার অবকাশ নাই। কেননা অন্য কোন উপকার থাকুক বা না থাকুক জীবিকা ও চাকুরীর প্রশ্নে মুসলমানদের ইংরেজি শিখিতে হইবে। বিশেষভাবে বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে বাংলাও শিখিতে হইবে। কেননা ইহা তাহাদের নিত্যকার ভাষা। কিন্তু ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে মুসলমানদেরকে উর্দুতে ভাল দক্ষতা এবং ফারসীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইতে হইবে এবং সম্ভব হইলে কিছু আরবীও শিখিতে হইবে।

www.waytojannah.com

ডঃ হান্টারও তাঁহার পুস্তকের ১৭৮–১৭৯ নং পৃষ্ঠায় এই ব্যাপারে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

"দ্বিতীয়ত আমাদের গ্রাম্য স্কুলগুলি মুসলমানদের জন্য মোটেই উপযুক্ত নহে। এইসব স্কুলের ভাষা পড়িয়া মুসলমানরা সামাজিক বা ধর্মীয় – কোন ক্ষেত্রেই মর্যাদা অর্জন করিতে পারিবে না। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের কিছু ফারসী শিক্ষা করা উচিত। কিন্তু ফারসী এমন কি আমাদের হাইস্কুল গুলিতেও পড়ানো হয় না। শহুরে মুসলমান হউক আর গ্রাম্য মুসলমান, প্রত্যেককেই একটি উপযুক্ত ভাষার মাধ্যমে উপাসনা সম্পন্ন করিতে হয়। কিন্তু আমাদের স্কুলগুলি এই ভাষাকে মোটেই কবুল করিতে চায় না।"

ডঃ হান্টার উক্ত পুস্তকের ২০৭ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

"মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে ইহার চাইতে কিছু কম রদবদল করিলেই চলিবে। ওহাবী আন্দোলন সংক্রান্ত অফিসার এই কথার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক জেলার সরকারী স্কুলগুলিতে মৌলভী শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে। এই একটুখানি প্রয়াসই যথেষ্ট ফলদায়ক হইবে। মৌলভীরা সাধারণ প্রবন্ধাবলী উর্দু ভাষার মাধ্যমে পড়াইবেন এবং উহা ভালভাবে শিখাইতেও পারিবেন। বিভিন্ন জেলার সরকারী স্কুলগুলিতে অধিকার প্রদান করা উচিত যে, তাহারা যেন মুসলমান ছাত্রদের মাঝে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ সৃষ্টি করেন।

ডঃ হান্টারের মতো মহান ব্যক্তির এই বর্ণনাই যথেষ্ট নহে, শিক্ষা বিভাগ যেন এইসব কার্যকরী করেন। আমার মনে হয়, সকল মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় ভার্ণাকুলার স্কুলগুলিতে উর্দু শিক্ষকের এবং মিডল স্কুলগুলিতে ফারসী আরবী উভয় ভাষাতে পারদর্শী শিক্ষকের প্রয়োজন।

উচ্চ বিদ্যালয়

উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে নওয়াব আবদুল লতিফ বলেন ঃ

মুসলমানদের মাঝে উচ্চ শিক্ষার পরিস্থিতি খুবই নগণ্য। মাধ্যমিক শিক্ষাও তেমন সন্তোষজনক নয়। কেননা মাধ্যমিক পড়ার পর খুব কম ছাত্রই উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে চায়। ইংরেজি পড়াশুনা করিয়াছে এই ধরনের মুসলমান ছাত্র বিরল। অধিকাংশ ছাত্রই দারিদ্র এবং অনটনের দরুন আর এদিকে অগ্রসর হইতে পারে না। হালে লেঃ গভর্নর মুসলমান ছাত্রদের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ মোহসীন ফান্ড হইতে দেওয়ার যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহা মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার দিকে ধাবিত করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ ছাত্র নিজেদের খরচাদি বহন করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। কলিকাতা শহরে থাকা-খাওয়া এবং বইপুস্তক কিনিয়া পড়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য এই সব ছাত্রের নাই।

www.waytojannah.com

Contents

এইকথা অসস্বীকার্য যে, উচ্চ শিক্ষাই উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরীর একমাত্র পথ। অতএব উচ্চ শিক্ষার প্রতি মুসলমানদেরকে আগাইয়া নিয়া যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহাতো মুসলমানদের চিরন্তন অভিযোগ যে, মোহসীন ফান্ডকে বহুকাল অপাত্রে খরচ করা হইয়াছে। তাছাড়া আলিয়া মাদ্রাসার বন্দোবস্তও সন্তোষজনক নয়। কিন্তু এখন খুবই আনন্দের কথা যে, মুসলমানদের এই উভয় অভিযোগ এতদিনে দূরীভূত হইল। মোহসীন ফান্ডকে বর্তমানে আরবী এবং ফারসী শিক্ষার উন্নতির জন্য নিয়োজিত করা হইয়াছে। অবশ্য ফান্ডের একটি ক্ষুদ্র অংশ ইংরেজি শিক্ষার খাতেও ব্যয় করা হইবে।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও বৃটিশ সরকারের একটি বিরাট গোষ্ঠী এবং এই দেশী জনসাধারণের এক বিরাট সম্প্রদায় এই সরকার প্রবর্তিত শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে না। এবং সমকালীন অন্যান্য আধুনিক মতাবলম্বীর সাথেও তাহারা সমান তালে চলিতে পারে না। অতএব ইহার চাইতেও অধিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে যাহাতে তাহারা হিন্দুদের তুলনায় যতটুকু পশ্চাৎপদ হইয়াছে তাহা পূরণ করিয়া লইতে পারে। মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাইসরয় বলিয়াছেন ঃ

"মুসলমানদের মধ্যে এই ধরনের লোক খুবই বিরল যাহারা হিন্দু আমীর উমরাদের মতো ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ছাত্রদের জন্য বৃত্তির বন্দোবস্ত করিতে পারেন। হিন্দুদের ধন-সম্পদ আছে, তাহারাই এই ধরনের কাজ করিতে পারেন।

আমি এই ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন যে, আমি শিক্ষা সম্পর্কে আমার মতামত ব্যক্ত করিতে গিয়া সরকারের শিক্ষা নীতির বিরোধিতা করিয়াছি। সরকার বলিয়াছেন ঃ

"সরকার শুধু প্রাইমারী শিক্ষার বেলায় সাহায্য দান করিবেন, উচ্চ শিক্ষার বেলায় করিবেন না।" এমতাবস্থায় মুসলমানদের অবস্থা হিন্দুদের মতোই, একথা মনে করা মোটেই সমীচীন হইবে না। অতএব মুসলমানদের স্বার্থে যেসব প্রস্তাব পেশ করা হইল তাহা কার্যকরী করিতেই হইবে।

বাংলা এবং বিহারের মুসলমানদের মাতৃভাষা

বাংলা এবং বিহারের মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যম কি হইবে এই প্রশ্নের জবাবে নওয়াব আবদুল লতিফ বলেন ঃ

"শিক্ষার প্রশ্নে আমি সব সময়ই মনে মনে ধারণা পোষণ করি যে, নিম্নবিত্ত মুসলমানদের (যাহাদের রীতিনীতি হিন্দুদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ) প্রাইমারী শিক্ষার

www.waytojannah.com

মাধ্যম বাংলা হইবে। তবে এই বাংলায় সংস্কৃত শব্দের বদলে আরবী ফারসীর প্রাধান্য বেশি থাকিতে হইবে এবং এক্ষেত্রে আদালতে ব্যবহৃত বাংলাকে অনুসরণ করা উচিত। পক্ষান্তরে, মধ্য ও উচ্চবিত্ত মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যম হইবে উর্দু। সম্ভ্রান্ত এবং রুচিশীল মুসলমানরা গ্রামে এবং শহরে এই ভাষাতেই কথা বলে এবং এই ভাষার বদৌলতে সমাজে সম্মান প্রাপ্ত হয়। মধ্য এবং উচ্চবিত্ত মুসলমানরা সাধারণত বিজয়ী ও কুলীন মুসলমানদের অধঃস্তন পুরুষ, যাহারা সেকালে আরব, পারস্য এবং সেন্ট্রাল এশিয়া হইতে বাংলাদেশে আগমন করিয়াছেন এবং দিল্লীর দরবারে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ রাজকার্যে নিয়োজিত হন। এই মুসলমানরা বিভিন্ন সময়ে রাজকীয় প্রয়োজনে বাংলাদেশে আসেন এবং কালক্রমে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া যান। তাহাদের মাতৃভাষা উর্দুই ছিল। এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, ছেলেপিলেদেরকে প্রথমত মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করিতে হয়। আমার মতে ভাষা নির্বাচনের প্রশ্নেও মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি এবং অবনতি নির্ভরশীল।

বিহারে এযাবত উর্দু ভাষাই স্বতঃসিদ্ধভাবে তাহাদের মাতৃভাষা হিসাবে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। বিহারে ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান সকলেই উর্দু ভাষায় কথা বলে এবং তাহাদের শিক্ষার মাধ্যমও তাহাই। কিন্তু কিছুদিন যাবত আমাদের সরকার তাহাদের উপর হিন্দি ভাষা চাপাইয়া দিয়াছেন। এই ব্যাপারে মুসলমানদের ঘোর আপত্তি রহিয়াছে। কেননা, এই কথা সর্বজন বিদিত যে, কোন জাতিই মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিয়া শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হইতে পারে না। বিহারের মুসলমানদের ভাষা উর্দুই, ইহাই আমার একমাত্র বক্তব্য। তবে হিন্দিতে চলনসই সামান্য লেখাপড়া তাহাদের থাকা উচিত এবং উহা ঐচ্ছিকভাবে কয়েক মাসের কোর্সে সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

সৈয়দ আমীর আলীর মতামত

বাংলা ও বিহারের মুসলমানদের শিক্ষা পরিস্থিতি এবং ইংরেজিতে মুসলমানদের অনাসক্তির কারণ সম্পর্কে রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি এই সম্পর্কে একটি দীর্ঘ মতামত পেশ করেন ঃ

মাদ্রাসা শিক্ষা

আমি উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর জবাব একই সঙ্গে দিতে চাই, যাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণগুলি এই জবাবের মাধ্যমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। পুরানো দিনের স্মৃতিচারণ করিয়া লাভ নাই, বরং আমি মাত্র পঁচিশ বৎসর আগেও শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমানদের কতটুকু সুযোগ-সুবিধা ছিল তাহার একটা চিত্র তুলিয়া ধরিতে চাই। আমার মতে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের এই অনগ্রসরতাকে শুধু

www.waytojannah.com

রাজনৈতিক কারসাজীর ফলশ্রুতি বলা যাইতে পারে না। আজ হইতে পঁচিশ বৎসর আগে মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষাক্ষেত্রে ততখানি আগ্রহশীল ছিল না, যতখানি বর্তমানে দৃষ্ট হয়। মুসলমানরা শুধু ইংরেজি এবং ফারসীর জন্যই উৎসর্গ প্রাণ, ইংরেজির প্রতি তাহাদের কোন টান ছিল না। সেকালে এতদঞ্চলে মাত্র দুইটি মাদ্রাসা ছিল। একটি কলিকাতায় ও অপরটি হুগলীতে। ছাত্ররা আরবী ফারসী শিক্ষা লাভ করিবার জন্য বাংলা ও বিহারের দূর-দূরান্ত হইতে এই মাদ্রাসায় জমায়েত হইত। শুধু দীনী শিক্ষা লাভের মানসেই যে এই ছাত্ররা এই দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসিয়া ভর্তি হইত তাহা নহে, বরং একটি পার্থিব উদ্দেশ্যও ইহাতে নিহিত ছিল। কেননা, ছাত্ররা সিনিয়র স্কলারশীপ পাস করার পর মুসান্নিফ বা ছদরুল ইয়ামীনের মতো দুইটি বড় পদে চাকুরী লাভ করিতে পারিত। দূর-দূরান্তের ছাত্ররা হুগলী বা কলিকাতায় শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে আসিলে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাহাদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতেন। ইহাকে স্থানীয় ভাষায় 'জাগীর' বলা হইত। আমার বেশ মনে পড়ে ১৮৫৫ সালে হুগলী মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন ছাত্র জাগীর ছিল। মোটকথা, প্রত্যেক অবস্থাপন্ন মুসলমান এই ধরনের দুই-চারজন জাগীর রাখিতেন। কলিকাতায় এই জাগীরপ্রথার ক্ষেত্র ছিল আরো প্রশস্ত। এইসব ছাত্র সাধারণত অসচ্ছল ও গরীব ধরনের পরিবার হইতে আসিত এবং ইংরেজ সাহেবদের খানসামাদের বাড়িতে জাগীর থাকিত। সেকালে কলিকাতায় খানসামাদেরও বেশ সামাজিক মর্যাদা ছিল। জাগীরে অবস্থানকারী এইসব ছাত্র মোটামুটি ভালভাবেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত। যদি কোন মতে স্কলারশীপ লাভ করিতে পারিত বাড়ির মালিক তাহাকে জামাতা হিসাবে বরণ করিয়া নিত এবং খানসামারা তাহার ইংরেজ 'বসের' তোষামোদ করিয়া জামাতার জন্য সম্ভাব্য সকল উন্নতির বন্দোবস্ত করিয়া লইত। মোট কথা, আরবী ফারসী পড়ুয়াদের শিক্ষা জীবনের সুযোগ-সুবিধা এবং উপকরণ এই ধরনের ছিল। এই ধরনের ছাত্রদেরকে মাদ্রাসায় ফিস্‌ও দিতে হইত না। শতকরা পঞ্চাশ জন ছাত্রই তাহাদের শিক্ষা জীবনের খরচ এই ভাবে নির্বাহ করিত। বৃটিশ সরকারের রেকর্ড হইতে জানা যায় যে, মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত এ ধরনের শতকরা পঁচিশ জন ছাত্রই জীবিকা ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত এবং ভাল সরকারী পদে চাকুরী লাভ করিত। এই মাদ্রাসার ছাত্রদের তুলনায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা চাকুরীর ক্ষেত্রে তেমন সুবিধা করিতে পারিত না।

প্রাইমারী শিক্ষা

তদানীন্তন প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ভিন্ন ধরনের। প্রত্যেক মসজিদ সংলগ্ন একটি মক্তব থাকিত। মসজিদের মোল্লা বা খতিব সকাল বিকাল পাড়া-প্রতিবেশীর ছেলেপিলে বা যেসব ছাত্ররা মসজিদে থাকিত তাহাদের পড়াইতেন। এই ভাবে স্থানীয়

www.waytojannah.com

Contents

মুসলমান ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত হইত। সাধারণত এইসব মকতবে আরবী বর্ণশিক্ষা, কুরআন শরীফের আমপারা এবং গুলিস্তাঁ বোস্তাঁ অবধি পড়ানো হইত। আমি সেকালের শিক্ষার মানদণ্ড এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে এইজন্য আলোকপাত করিলাম যাহাতে এতকাল পরের শিক্ষা পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেওয়া যাইতে পারে। এখন আরবী-ফারসীর গুরুত্ব বহুলাংশে কমিয়া আসিয়াছে। ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে সবাই আজকাল উৎকণ্ঠিত। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সবাই আগ্রহশীল। এবং এই পরিবর্তনের পাশাপাশি মুসলমানদের সর্বস্তরে দারিদ্রের কালোছায়া নামিয়া আসিয়াছে। পূর্বে যেসব মধ্যবিত্ত ও অবস্থাপন্ন মুসলমান মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে জাগীর রাখিত, বর্তমানে তাহাদের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা আর জাগীর রাখিতে পারিতেছেন না। ফলে চিরাচরিত জাগীর প্রথা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমান এখনও জাগীর রাখিতে পারেন কিন্তু আগেকার মতো এ ব্যাপারে তাহাদের তেমন উৎসাহ নাই এবং এ ব্যাপারে তাহারা কোনরূপ সাহায্য বা সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে অসম্মত। সমাজের ধনাঢ্য বা আমীর উমারা ধরনের লোকেরা নিজেরা যেমন শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন তেমনি অপরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। মোটকথা, ধন-সম্পদ মানুষের বিলাস সত্তাকে জাগ্রত করিয়া তোলে। যাহার কাছে অগাধ ধন-সম্পত্তি আছে তিনি ভাবেন আমি আমার সন্তানদের লেখাপড়া শিখাইব। কিন্তু এধরনের বাবার ছেলেরা লেখা-পড়াকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। লেখাপড়া হইতে গা-বাঁচাইয়া চলে।

মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা

মাধ্যমিক এবং উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা সম্পর্কে আমার মতামত হইল, প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি শিক্ষার জন্য সরকার যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়াছেন তাহা খুবই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানরা যে শুধু বিজাতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি শিক্ষা হইতে বিরত রহিয়াছে তাহা নহে। বরং ইহার পিছনে আরো অন্য কারণ আছে। পূর্বেকার লোকেরা অবশ্য এই কারণেই শিক্ষালাভ করে নাই। কিন্তু আজকাল সেই মানসিকতা অনেকাংশে বদলাইয়া গিয়াছে। এখন সকলেই ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে মুসলমানদের অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হইল তাহাদের দারিদ্র এবং অসচ্ছলতা।

সত্য বলিতে কি, সমাজে এমনও কিছু সংখ্যক অবস্থাসম্পন্ন মুসলমান রহিয়াছেন যাহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন মূল্যে ছেলেদের দ্বারা শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দু এমনকি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদেরকেও পিছনে ফেলিয়া যাইবার নজীর স্থাপন করিতে পারেন কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এইসব পিতা ছেলেদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন না। পক্ষান্তরে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে, বহু বিদ্যোৎসাহী এবং মেধাবী ছাত্র

www.waytojannah.com

বিপুল প্রতিশ্রুতি নিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু ঠিক উচ্চ শিক্ষার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া নাটকীয় ভাবে তাহারা পড়াশুনা ক্ষ্যান্ত দিতে বাধ্য হয়। কারণ, বাবা-মা তাহাদের খরচ চালাইতে পারেন না। সাধারণত এইসব ছাত্র মাদ্রাসার পঞ্চম শ্রেণী (পাঞ্জম) পর্যন্ত আসিয়া আর অগ্রসর হয় না। কলিকাতা, পাটনা বা হুগলীর মত নগরীতে থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য খরচাদি চালাইবার মতো আর সামর্থ্য থাকে না তাহাদের। ফলে, প্রতিটি মেধাবী ছাত্র জীবনের যাত্রাপথে এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

হুগলী কলেজ সংলগ্ন যে বোর্ডিং রহিয়াছে তাহাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া ছাত্রদের থাকিতে হয় উহা সাধারণ দৃষ্টিতে খুবই কম। কিন্তু এতটুকু খরচও মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে বহন করা সম্ভব হয় না। যখন 'জাগীর' প্রথা ছিল তখন ছাত্ররা বোর্ডিং-এর মুখাপেক্ষী হইত না। কিন্তু জাগীর প্রথার বিলুপ্তির পর ছাত্রদেরকে বোর্ডিং-এর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। অতএব এই ব্যাপারে দুইটি কারণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, প্রথমত মুসলমানদের রাজনৈতিক অধঃপতনের কারণ হইল তাহাদের মৌলিক সচ্ছলতা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে, দ্বিতীয়ত ছাত্ররা আগেকার মতো পড়াশুনা করিতে আসিয়া যেসব আনুকূল্য লাভ করিত তাহা আজকাল বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। অতএব স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের শিক্ষার গতি বাধাপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য।

ইংরেজির প্রতি ঔদাসীন্যের অন্যান্য কারণ

মুসলমানদের অধঃপতনের যে প্রবহমান ধারা চলিয়াছে তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়া এখনো যে দুই-চারিজন ভাগ্যবান মুসলমান টিকিয়া আছেন তাহারাও ইংরেজির প্রতি সমান উদাসীন। আর যেসব মুসলমান আমীর -উমারা বিভিন্ন পদে ক্ষমতাসীন রহিয়াছেন তাহারাও ছেলেপিলেদেরকে নামেমাত্র ইংরেজি শিক্ষা দিয়া থাকেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীরাই সত্যিকার অর্থে জাতীয় জীবনের প্রাণ, তাহারা ক্রমশ উন্নতি লাভ করিয়া উচ্চবিত্তদের দলভুক্ত হইয়া বৃটিশ শাসনের প্রথমদিকে বড় বড় সরকারী পদলাভ করিয়াছিল। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। তাহাদের জীবনের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজির ক্ষেত্রে মুসলমানদের ঔদাসীন্যের কারণ শুধু ইহাই নহে বরং জেলা স্কুলগুলিতে হিন্দু শিক্ষকদের প্রাধান্যও অন্যতম কারণ। তাছাড়া শিক্ষা বিভাগীয় দফতরেও মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। যাহার ফলে এইসব স্কুলে বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। এই কথা অনস্বীকার্য যে, উপকূলবর্তী জেলাসমূহ ছাড়া সর্বত্রই মুসলমানদের ভাষা উর্দু। অতএব বাঙালী শিক্ষকরা- ঘনিষ্ঠ এবং হৃদয়গ্রাহীভাবে মুসলমান ছাত্রদেরকে শিক্ষাদান করিতে পারে না। কিছুদিন পূর্বেও কোন জেলা স্কুলে আরবী-ফারসীর বন্দোবস্ত ছিল না। আরবী ফারসীর বন্দোবস্ত না থাকায় মুসলমানরা বহুকাল এসব স্কুল হইতে দূরে সরিয়া ছিল।

www.waytojannah.com

এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় অনেকখানি পিছাইয়া গিয়াছে। কিন্তু মুসলমানরা এখন জাগ্রত হইয়াছে এবং ক্রমান্বয়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ধাবিত হইতেছে।

মুসলমানদের মাঝে জাগরণ আসার পর তাহারা প্রথমত নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের একটি বিপর্যস্ত ও বিশৃংখল জীবন গত হইয়াছে। আরবী ফারসী ক্রমশ বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। আমার যতটুকু মনে পড়ে ১৮৫৫ সালে হুগলী মাদ্রাসার আরবী ও ফারসী শিক্ষারত সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা ছিল দেড় শো হইতে দুই শতের মধ্যে। ১৮৬০ সালে এই ছাত্র সংখ্যা মাত্র ৩০ জনে আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাহার পরিবর্তে ছাত্ররা যে ইংরেজি স্কুলে গিয়া ভর্তি হইয়াছে এমন নয়। ১৮৬৮ সালে হুগলী মাদ্রাসার এ্যাংলো-বাংলা বিভাগের ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র দশ-পনের জন। তন্মধ্যে বাংলার ঘন্টায় হিন্দু ছাত্ররা বাংলা পড়িত আর মুসলমান ছাত্ররা তাহার বদলে একজন মৌলবীর কাছে ফারসী পড়িত। অবশ্য ১৮৭১ সালে লর্ড মেয়ো মুসলমানদের শিক্ষায় অনগ্রসরতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন এবং ৭ই আগস্টের এক ইশতেহারে মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকার ইতিপূর্বে কতখানি সহযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন উহার বর্ণনা পেশ পূর্বক বলেন ঃ

"গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল বিশ্বাস করেন যে, মাধ্যমিক এবং উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রদান করা হয় তাহা হইলে ছাত্ররা সহজেই লেখাপড়া করিতে পারিবে এবং এই সঙ্গে যদি আরবী এবং ফারসীরও বন্দোবস্ত রাখা হয় তাহা হইলে মুসলমানরা এই বন্দোবস্ত পছন্দ করিবে। পরন্তু বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল লোকেরা এই ব্যবস্থাকে সানন্দে অনুমোদন করিবেন।"

তদানীন্তন বাংলার লেঃ গভর্নর জর্জ ক্যাম্পবেল গভর্নর জেনারেলের এই উক্তির বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, আরবী-ফারসীর জন্য সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই দিতে হইবে। গভর্নর জেনারেল শেষাবধি লেঃ গভর্নরের মতামতই সামান্য রদ-বদলের পর মঞ্জুর করেন। যাহার ফলে ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম মাদ্রাসার পত্তন করা হয়।

এবারেও মুসলমানেরা পরাজিত হইল। অর্থাৎ ১৮৭২ সালে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য ইংরেজি বাধ্যতামূলক না করিয়া যে ভুল করা হইল তাহার (ফলে যে ভাষার মাধ্যমে বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ঘাটতি পূরণ করা অবশ্য প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইল) এই শিক্ষার অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। এইভাবে এই সময়ও ইংরেজির উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বদৌলতে প্রাপ্ত শিক্ষারত ছাত্রদের একটি হিসাব পাওয়ার পর আমি বর্তমান মুসলমানদের শিক্ষার উপর একটা সম্যক ধারণা নিতে পারি। কলিকাতার আলিয়া মাদ্রাসাতেই বিপুল সংখ্যক ছাত্র পড়াশুনা করে। কেননা

www.waytojannah.com

আলিয়া মাদ্রাসা ও মাদ্রাসার ব্রাঞ্চ স্কুল মুসলমানদের নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানে দুইটি বিভাগ রহিয়াছে, একটি পাশ্চাত্য শিক্ষা, অপরটি প্রাচ্য শিক্ষার জন্য চালু রহিয়াছে।

এই দুইটি বিভাগের মধ্যে আরবী বিভাগ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের তদানীন্তন প্রিন্সিপালের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

"আরবী বিভাগে দুইটি জুনিয়র ও চারটি সিনিয়র ক্লাস রহিয়াছে। জুনিয়র ক্লাস দুইটিকে এন্ট্রান্স-এর সর্বোচ্চ দুইটি ক্লাসের সমমানের এবং শেষোক্ত চারটি ক্লাসের মান কলেজের সমপর্যায়ের। সাধারণত এ্যাংলো ভার্ণাকুলার কলেজিয়েট স্কুলের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। শেষোক্ত চারটি ক্লাসে দুই বৎসর অন্তর Lower standered এবং Higher standered-এর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই দুইটি পরীক্ষাই বাংলার সেন্ট্রাল মাদ্রাসা একজামিনেশনের পাবলিক পরীক্ষা হিসাবে পরিগণিত। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ এবং বি. এ.র সমমানের পরীক্ষা। অতএব এই বিশেষ পরীক্ষার ভিত্তিতে কলিকাতা ও প্রদেশের অন্যান্য মাদ্রাসার সমন্বয়ে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকেও একটি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষা বলা যাইতে পারে।"

আলিয়া মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগের প্রধান হিসাবে একজন হিন্দু শিক্ষক এবং আরবী বিভাগের প্রধান হিসাবে একজন হেড মৌলভী কর্মরত রহিয়াছেন। ব্রাঞ্চ স্কুলের উভয় বিভাগ একজন খৃস্টান শিক্ষকের অধীনে রহিয়াছে। অতঃপর গোটা প্রতিষ্ঠান একজন প্রিন্সিপালের অধীনে পরিচালিত হয়। উভয় বিভাগের খরচই সরকার বহন করেন। অবশ্য ছাত্রদের ফিস এবং মোহসীন ফান্ডের কিছু অর্থ এই দুই প্রতিষ্ঠানের মাঝে শুধু আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রাবাসের খাতে খরচ করা হয়। এই বোর্ডিং -এ সকল বিভাগের ছাত্ররা থাকিতে পারে। মাদ্রাসার বোর্ডিং-এর নূতন বন্দোবস্ত এবং সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। আলিয়া মাদ্রাসার সম্ভ্রান্ত এবং অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকদের ছেলেরা পড়াশুনা করে। পক্ষান্তরে ব্রাঞ্চ স্কুলের ছাত্ররা গরীব এবং নিম্নবিত্ত মুসলমানদের ছেলেপিলে। এই সময় মাদ্রাসায় ৩৮৮ জন এবং ব্রাঞ্চ স্কুলে ৩০৮ জন ছাত্র পড়াশুনা করিত।

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা

শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে কি ধরনের সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজন, এই প্রশ্নের জবাবে সৈয়দ আমীর আলী জানান যে, জর্জ ক্যাম্পবেল পূর্ব বাংলায় বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন উহা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। অতএব সরকারকে বর্তমানে দুইটির যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। রাজশাহী এবং চট্টগ্রামের মাদ্রাসার শিক্ষার মান কমাইয়া

www.waytojannah.com

দিতে হইবে, অথবা এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে জেলা স্কুলের সহিত একীভূত করিয়া দিতে হইবে। সরকার এই দুইটির একটি পন্থা অবলম্বন করিলে অনেক অর্থ বাঁচিয়া যাইবে এবং সেই অর্থ অন্যান্য সৎকর্মে ব্যয় করা যাইবে। অন্যান্য সৎকর্ম কি হইতে পারে তাহা আমি বারান্তরে আলোচনা করিব।

আমার মতে, মিডল স্কুল, হাই স্কুল এবং কলেজগুলিতে ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। এদেশের লোকদের ইংরেজি বাদ দিয়া শুধু প্রাচ্য দেশীয় শিক্ষা দেওয়ার ফল খুবই খারাপ হইবে। শুধু এই ধরনের পড়াশুনায় কোন চাকুরী বা জীবিকার সংস্থান হয় না। এই ধরনের লোকরা সমাজের অকর্মণ্য এবং পরগাছা হিসাবে বিরাজ করে। বর্তমান বিশ্বের প্রগতি এবং কালচার সম্পর্কে যাহারা খোঁজ-খবর রাখে না তাহারা যথার্থই অথর্ব। ক্রমান্বয়ে তাহারা অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয় এবং সবাই তাহাদের ঘৃণার চোখে দেখেন।

প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানের একান্ত ইচ্ছা যে, শিক্ষা বিভাগে মুসলমানদেরকে সন্নিবেশিত করা হউক। প্রত্যেক জেলা স্কুলগুলিতে ন্যূনপক্ষে দুই-তিনজন মুসলমান শিক্ষক বাধ্যতামূলকভাবে রাখিতে হইবে। তাহারা ছাত্রদেরকে ফারসী এবং আরবী শিক্ষা দিবেন। হিন্দু শিক্ষকরা মুসলমান ছাত্রদের নিয়া যেখানে অসুবিধায় পড়েন সেখানে মুসলমান শিক্ষকরা তাহাদের সহযোগিতা করিতে পারিবেন। কেননা হিন্দু শিক্ষকরা উর্দু জানেন না। মুসলমানদের জন্য উর্দু অবশ্য পাঠ্য, যেমন হিন্দুদের জন্য বাংলা। হিন্দুদের বেলায় সংস্কৃত যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি মুসলমানদের জন্য ফারসী এবং আরবী। মুসলমান ছাত্রদের চারিটি ভাষা পড়িতে যেন বাধ্য না করা হয়।

দ্বিতীয়ত আলিয়া মাদ্রাসাকে কলেজের পর্যায়ে উন্নীত করিতে হইবে। দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে, হুগলী মাদ্রাসার শিক্ষা-দীক্ষার পদ্ধতি মুসলমানদের সীমারেখার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে মুসলমানদের কতখানি দোষ বা সরকারেরই বা কতটুকু ত্রুটি রহিয়াছে তাহা এইখানে আলোচনা করা উদ্দেশ্য নহে। আমার মতে, মুসলমানী বিষয়ের শিক্ষা আর মাদ্রাসায় না রাখাই ভালো। হুগলীর মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া দিলে অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে। এই টাকা হইতে হুগলী কলেজ, কলিকাতা এবং শিরপুরের কলেজের মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তি বরাদ্দ করা যাইবে।

বোর্ডিং-এর বন্দোবস্ত আরো উন্নতমানের করিতে হইবে। কলিকাতা ছাড়া প্রদেশের অন্যান্য জেলাতেও ছাত্রাবাসের প্রয়োজন রহিয়াছে। যাহাতে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছাত্ররা আসিয়া একটি ভাল পরিবেশে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারে। বোর্ডিং না থাকিলে ছাত্রদেরকে অবাঞ্ছিত পরিবেশে থাকিয়া লেখাপড়া করিতে হয়। এইসব বোর্ডিং-এ কতিপয় ছাত্রের জন্য বিনা ব্যয়ে থাকিবার বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। এইসব বোর্ডিং-এর রক্ষণাবেক্ষণ মুসলমান শিক্ষকদের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে।

www.waytojannah.com

মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন ম্যানেজিং কমিটির হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে, আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করি। কেননা এই ধরনের কমিটিতে পরস্পর বিরোধী লোক থাকিবে। কেউ পাশ্চাত্য শিক্ষা, আবার কেউ বা প্রাচ্য শিক্ষার পক্ষপাতিত্ব করিবেন। ফলে তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ চলিতে থাকিবে এবং ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হইয়া যাইবে।

কমিশনের ১৭টি প্রস্তাব

নওয়াব আবদুল লতিফ ও রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলীর উপরোক্ত বিবৃতি অনুযায়ী মুসলমানদের শিক্ষা পুনর্গঠন বিষয়ক কমিশন নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন ঃ

১) মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার ও সম্প্রসারণকল্পে যে বিশেষ ব্যয় বরাদ্দ করা হইবে উহা জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও প্রাদেশিক সরকারের বাজেট হইতে নির্বাহ করা হইবে।

২) মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুক্তহস্তে দান করিতে হইবে যাহাতে অন্য ধর্মের পাঠ্য বিষয়ও ইহাতে শামিল করা যাইতে পারে।

৩) মুসলমানদের প্রাইমারী শিক্ষার একটি বিশেষ মান সৃষ্টি করিতে হইবে।

৪) ভারতীয় ভাষাকে (উর্দু) সাধারণভাবে মুসলমানদের মাধ্যমিক এবং উচ্চস্তরের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। তবে অঞ্চল বিশেষে মুসলমানরা যদি অন্য ভাষাকেও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিতে চায় তাহাও বিবেচনা করা যাইতে পারে।

৫) যেসব এলাকায় উর্দু অফিস-আদালতের ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয় নাই সেসব এলাকায় প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে এই ভাষা চালু করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া, সরকারের অধীনে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাতে অংক শাস্ত্রও এই ভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে।

৬) মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় সরকারী মিডল ও হাই স্কুলে উর্দু ও ফারসী পড়াইবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

৭) ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমানরা খুবই পশ্চাৎপদ। এই ব্যাপারে পর্যাপ্ত সাহায্যের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৮) প্রয়োজন বশত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বৃত্তি বা ভাতার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এবং তাহা হইবে নিম্নরূপ ঃ

ক) প্রাইমারী পাস করিয়া মিডল স্কুলে ভর্তি হইলে ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হইবে।

খ) অনুরূপভাবে মিডল স্কুল পাস করিলে হাই স্কুলের ছাত্রদের জন্যও বৃত্তি বরাদ্দ থাকিবে।

গ) ম্যাট্রিক পাস করিলে কলেজে অধ্যয়নকালেও।

৯) সকল সরকারী স্কুলে বিশেষভাবে কিছু সংখ্যক মুসলমানের জন্য ফ্রি'র বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে।

১০) সরকার অধিকৃত কোন বিশেষ মুসলমানদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় মুসলমানদের ছাত্রদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যয় করা উচিত হইবে।

১১) মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির পরিচালক যদি কোন বেসরকারী ব্যক্তি থাকেন তাহা হইলে সরকার প্রচুর অর্থ নিয়োজিত করিয়া মোতাওয়াল্লীকে এই ব্যাপারে রাজী করাইবেন যে, ইংরেজি শিক্ষার জন্য যেন স্কুল-কলেজের পত্তন করা হয়।

১২) প্রয়োজন বোধে মুসলমান শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর জন্য নর্মাল স্কুল খুলিতে হইবে।

১৩) যেসব মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা মাধ্যম উর্দু সেখানে যথাসম্ভব মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে।

১৪) মুসলমানদের প্রাইমারী শিক্ষার দেখাশুনা ও পরিচালনার জন্য মুসলমান ইন্সপেক্টর নিয়োগ করাই শ্রেয়।

১৫) যেসব সংস্থার কার্যক্রম মুসলমানদের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য নিয়োজিত রহিয়াছে এ ধরনের সংস্থাগুলি সরকারকে অনুমোদন দান করিতে হইবে।

১৬) জনশিক্ষার বার্ষিক রিপোর্টে মুসলমানদের শিক্ষা শীর্ষক আলাদা অধ্যায় প্রবর্তন করিতে হইবে।

১৭) শিক্ষিত মুসলমানদেকে তাহাদের দাবি এবং অধিকার অনুযায়ী চাকুরী প্রদানের পদক্ষেপ লওয়ার জন্য প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।[৪৮]

রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের প্রস্তাব

কমিশনের উক্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর ভারত সরকার একটি ইশতেহারে (নং ৩০৯/১০ তাং ২৩শে অক্টোবর ১৮৮৪) এ ব্যাপারে শুধু এতটুকু মন্তব্য করেন যে, "গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে আলাদাভাবে চিন্তা-ভাবনা করিতেছে। এখানে এই কথা উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। এ জন্য বিশেষ অবস্থার ভিত্তিতে তাহাদিগকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

৪৮. Education Comission Report, 1882

www.waytojannah.com

গভর্নর জেনারেল উপরোক্ত মন্তব্যে যে বিশেষ চিন্তা-ভাবনার কথা বলিয়াছেন মূলত তাহার উৎস ছিল ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের কাছে পেশকৃত কলিকাতার মোহামেডান এসোসিয়েশনের একটি স্মারকলিপি। এই স্মারকলিপিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রসরতা এবং অনগ্রসরতার কারণসমূহের একটি বিশদ ফিরিস্তি প্রদান করা হইয়াছে। সর্বশেষ এই লিপিতে মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির সহায়ক কতগুলি প্রস্তাবও পেশ করা হয়। এই মেমোরেন্ডাম কমিশনের খেদমতেও পেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই লর্ড রিপন ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। অবশ্য এই ব্যাপারে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তিনি বলিয়াছেন যে, আগামী গভর্নর জেনারেল যেন মুসলমানদের এই দাবি-দাওয়া সম্পর্কে বিবেচনা করেন। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল কমিশনের এই রিপোর্ট ও প্রস্তাবাদি বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন এবং একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনার ধারাগুলি ছিল সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক এবং পূর্বেকার সকল প্রস্তাব এই পরিকল্পনার প্রথম অংশে ধারাবাহিকভাবে আদ্যপান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া অতঃপর গভর্নর জেনারেল তাহার সর্বশেষ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। পরিকল্পনাগুলি নিম্নরূপ ঃ

১) মুসলমানরা সরকারী চাকুরী ততদিন অবধি লাভ করিতে পারিবে না যতদিন না তাহারা শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দুদের সমকক্ষতা অর্জন করিতে পারিবে। সরকার প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার প্রতি যতদিন না তাহারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইবে এবং এই শিক্ষায় পারদর্শী হইবে ততদিন তাহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে না।

২) জনশিক্ষা বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে আলাদাভাবে "মুসলমানদের শিক্ষা" শীর্ষক অধ্যায়টি আরো সম্প্রসারিত করা হইবে। ইহাতে মুসলমানদের শিক্ষায় জরুরী এবং সঠিক পর্যালোচনা প্রদত্ত হইবে যাহাতে সরকার এ ব্যাপারে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

৩) মুসলমানদেরকে উচ্চ শিক্ষার প্রতি ধাবিত করিতে হইলে তাহাদের জন্য অচিরেই পর্যাপ্ত বৃত্তি বা ভাতার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং আগামীতে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার যে পরিকল্পনাই গ্রহণ করিবেন তাহাতে মুসলমানদের স্বার্থও সম্পৃক্ত থাকিবে।

৪) যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশি রকম অনগ্রসর সেখানেই মুসলমান স্কুল ইন্সপেক্টর নিয়োগ করিতে হইবে।

৫) ইহা মোটেই সম্ভব নহে (মোহামেডান সোসাইটির প্রস্তাব) যে, সরকারী চাকুরীর জন্য যে পরীক্ষা গৃহীত হইবে তাহাতে অংশগ্রহণ ছাড়াই মুসলমানদেরকে চাকুরী দেওয়া হইবে।

৬) এবং পরীক্ষার প্রশ্নে কোন রকম শিথিলতাও প্রদর্শন করা সম্ভব নয়।

www.waytojannah.com

৭) বৃটিশ সরকারের একান্ত ইচ্ছা যে, প্রজাসাধারণের সহিত যেন সকল ব্যাপারে নিরপেক্ষতা বজায় থাকে এবং সকল শ্রেণীর প্রজারা যেন সমানভাবে চাকুরী লাভ করিতে সমর্থ হয়।[৪৯]

লর্ড ডিফরেনের (গভর্নর জেনারেল) এই বক্তব্যে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, সরকারী চাকুরীর বেলায় সব ভাষার উর্ধ্বে ইংরেজি ভাষার প্রাধান্যই থাকিবে এবং এ ব্যাপারে কোন রকম শৈথিল্য প্রদর্শন করা হইবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে হিন্দুদের পাশাপাশি কঠোর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। শিক্ষা বা চাকুরীর পরীক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য কোন রকম রেয়াত করা হইবে না। কেননা, এ ব্যাপারে অনেক মুসলমানই বিরোধিতা করিয়াছেন। তাহাদের মতে ইহাতে মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি বিঘ্নিত হইবে এবং এভাবে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে কোনদিনই তাহারা হিন্দুদের সমকক্ষতা অর্জন করিতে পারিবে না।

আলিয়া মাদ্রাসায় কলেজ প্রবর্তন

রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলী ও নওয়াব আবদুল লতিফের পূর্বোক্ত মতামতের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলা সরকার এই মর্মে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য আলিয়া মাদ্রাসাতেই যদি কলেজ চালু করা হয় তাহলে স্বল্প বেতনের মাধ্যমেই ছাত্ররা সহজে কলেজের শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। এই উত্থাপিত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১৮৮৪ সালে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগকে উন্নত করিয়া সেকেণ্ড গ্রেড কলেজে রূপান্তরিত করা হইবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই কলেজ প্রবর্তন করিতে যাইয়া এমন কতগুলি অপ্রতিরোধ্য অসুবিধা দেখা দিল যে, অবশেষে সরকারকে তাহার সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া নিতে হইল। অতঃপর এই ব্যাপারে নতুন ইশতেহার প্রকাশ করা হইল যে, আলিয়া মাদ্রাসাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত করিতে হইবে এবং আগামীতে আর মাদ্রাসাতে কলেজের মানের শিক্ষা প্রদান করা হইবে না। অবশ্য মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য এতটুকু সুবিধা দেওয়া হইবে যে, মাদ্রাসার ছাত্র হিসাবে তাহারা চিহ্নিত হইবে এবং মাদ্রাসায় যে ধরনের নামেমাত্র বেতনে লেখাপড়া করিত, প্রেসিডেন্সী কলেজেও তাহারা এইটুকু সুবিধা ভোগ করিবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পর এই নিয়ম ১৯০৮ সাল অবধি বলবৎ ছিল। কেননা এবছরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসাকে একটি প্রচলিত কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে অসম্মতি জানায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট মাদ্রাসা কলেজের শিক্ষা

৪৯. History and problem of Muslim Education in Bengal, by Sayed Azizul Haque, p-63 and History of English Education in India, by Syed Mohammad, P-174-175.

www.waytojannah.com

Contents

বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে মনে করেন। এই জন্য ১৯০৯ সালে মাদ্রাসার কলেজ বিভাগ চিরতরে বন্ধ করিয়া দিতে হইল। অবশ্য সরকার শেষাবধি মাদ্রাসার জন্য এতটুকু সুবিধা রাখেন যে, পুর্বেকার নিয়ম অনুযায়ী মাদ্রাসার ৩৫ জন ছাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইয়া মাদ্রাসার মতো স্বল্প বেতন ইত্যাদি সুযোগ ভোগ করিতে পারিবে।

এই সময় মাদ্রাসার সামগ্রিক অবস্থা

১৮৮৪-৮৫ সালে জনশিক্ষা বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহ সম্পর্কে নিম্নরূপ বিবরণ পেশ করা হয় ঃ

মাদ্রাসার নাম ছাত্র সংখ্যা সরকারী সাহায্য বেসরকারী ব্যয় মোট খরচ

১) আলিয়া মাদ্রাসা (১৮৮৪ – ৮৫)

(আরবী বিভাগ) ২৫৫ - ৩৩৬ ১১৪৬৪ টাঃ ১২৭৩ টাঃ ১২৭৩৭ টাঃ ৯২২৬

১৫৯৫ " ১০৮২১ "

২) হুগলী মাদ্রাসা ৩৯ ৩৯ — ৫৬৩১ " ৫৬৩১ "

২৫১৯ " ২৫১৯ "

৩) ঢাকা মাদ্রাসা ২৩৮-৩৫০ — ১৩৪১০ " ১৩৪১০ "

১২২৭৩ " ১২২৭৩ "

৪) চট্টগ্রাম মাদ্রাসা ৩৪১.৪৯৭ — ৮৯৬৫ " ৮৯৬৫ "

৯১২১ " ৯১২১ "

৫) মুর্শিদাবাদ মাদ্রাসা ৫৩-৫০ ১৭৭১১ টাঃ ১৭৭১১ "

১৬১৬৫ " ১৬১৬৫ "

৬) রাজশাহী মাদ্রাসা — ৫০ — ৫৬১৬ " ৫৬১৬ "

২৩৮৬ " ২৩৮৬ "

১৮৮৩ সালে রাজশাহী মাদ্রসায় ক্রমশ ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় পরবর্তী বৎসরে মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু মুসলমানরা ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। অবশেষে সরকারকে বাধ্য হইয়া দ্বিতীয়বার রাজশাহী মাদ্রাসা চালু করিতে হয়। অবশ্য মাদ্রাসার মান হ্রাস করিয়া শুধু জুনিয়র ক্লাস অবধি চালু করা হয় এবং এখানে রাজশাহী কলেজেও একটি শাখা প্রবর্তন করা হয়। মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা ও লেখাপড়া রাজশাহী কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত ছিল। মাদ্রাসার পাঠ্য বিষয় কলিকাতা ও অন্যান্য মাদ্রাসার অনুরূপই ছিল।

www.waytojannah.com

উপরোক্ত মাদ্রাসাগুলি ছিল সরকারী বা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান। এসব মাদ্রাসা ছাড়াও প্রদেশে এমন আরো কয়েকটি মাদ্রাসা ছিল যেগুলিকে সরকার অনুমোদন করিয়া কিছু অর্থও বরাদ্দ করেন। মাদ্রাসাগুলির নাম ও পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

মাদ্রাসার নাম	আমদানীর উৎস
১) জোড়াঘাট মাদ্রাসা, হুগলী	মোহসীন ফান্ড হইতে প্রতি মাসে ৪০ টাকা।
২) কক্সবাজার মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম	সরকারী তহবিল হইতে প্রতি মাসে ৪০ টাকা।
৩) মীর এহিয়া মাদ্রাস, চট্টগ্রাম	মীর এহিয়ার ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় হইতে।
৪) সীতাপুর মাদ্রাসা, হুগলী	ইহার খরচ সরকারই নির্বাহ করিত। এই মাদ্রাসার জন্য যে ওয়াক্ফ বরাদ্দ ছিল সরকার উহা ১৮৭২ সালে নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

এইভাবে ১৮৮৫ সালে প্রদেশে সরকারী এবং বেসরকারী মাদ্রাসার তালিকা দশ অবধি উন্নীত হয়। এই দশটি মাদ্রাসার মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩৮৬। তন্মধ্যে সরকারী মাদ্রাসার ১০৫৭ জন এবং বেসরকারী মাদ্রাসায় ৩২৯ জন। মুর্শিদাবাদের নবাবের মাদ্রাসাটি যদিও সরকারী মাদ্রাসা হিসাবে পরিগণিত ছিল এবং সরকারী খরচেই উহা পরিচালিত হইত, প্রকৃত পক্ষে মাদ্রাসাটি ছিল নবাবদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি হাইস্কুল বিশেষ। এই মাদ্রাসার পাঠ্য বিষয় ছিল ভিন্নতর এবং ব্যবস্থাপনাও ছিল আলাদা ধরনের। এই মাদ্রাসা মূলত রাজনৈতিক কারণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মুসলমান ইন্সপেক্টর নিয়োগ

১৮৮২ সালের সুপারিশক্রমে ১৮৮৯ সালে বাংলা সরকার (রেজুলেশন নং ২১৫—২৫/৭ তাং ১৫ই জুলাই ১৮৮৫ সাল) মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়ন ও পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলা ও বিহারের জন্য দুইজন সহকারী ইন্সপেক্টর নিয়োগ করেন। অতএব এই নিয়োগ অনুযায়ী বাংলা প্রদেশের জন্য মওলবী আহমদ কবীর এম. এ সহকারী ইন্সপেক্টর নিয়োজিত হন। জনশিক্ষা বিভাগের রিপোর্ট (পৃঃ ৬৭) পর্যালোচনা করিয়া জানা যায় যে, সহকারী ইন্সপেক্টর যেন মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এবং মাদ্রাসাগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও অংক, ভূগোল এবং দেশীয় ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। এই রিপোর্টে আরো বলা হইয়াছে যে, মোহসীন ফান্ডের অর্থ যেন সঠিক এবং ন্যায্যভাবে খরচ করা হয় এ ব্যাপারেও ইন্সপেক্টর বিশেষ সচেষ্ট থাকিবেন।

www.waytojannah.com

মোহসীন ফান্ডের খরচের তালিকা

১৮৮৮-৮৯ সালে মোহসীন ফান্ডের শিক্ষা খাতের আমদানী বৃদ্ধি হইয়া বাৎসরিক প্রায় ৬৩ হাজার টাকায় উন্নীত হয়। এই অর্থ নিম্নলিখিত বরাদ্দ অনুযায়ী খরচ করা হইত।

	টাকা	আনা	পাই
১) বেসরকারী মাদ্রাসাগুলির জন্য	৩০৩৮৯	২	১১
২) হাইস্কুলের মৌলবীদের বেতন	৫৮৫৬	১১	১১
৩) ছাত্রবৃত্তি	৯০২২	৫	৯
৪) ছাত্রদের বেতন বাবদ	১৪৭৮৪	১২	৫
	৬০০৫৩	৫	০

মোহসীন ফান্ড হইতে শুধু মাদ্রাসাগুলিতে যে অর্থ ব্যয় করা হইত তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

মাদ্রাসার নাম	ছাত্র সংখ্যা ১৮৮৮.৮৯	সরকারী খরচ ১৮৮৮.৮৯	মোহসীন ফান্ডের খরচ ১৮৮৮.৮৯
১) কলিকাতা মাদ্রাসা (আরবী বিভাগ)	৩৬২ ৪০৮	১০০৩৬ ১১২৫১	১৬২২-১৭৩৩
২) হুগলী মাদ্রাসা	৩৭.৬০		২১১৭-২৩৮০
৩) ঢাকা মাদ্রাসা	৩৩৬-৪২৪		১৩৭১০-১৪১৭৬
৪) চট্টগ্রাম মাদ্রাসা	৩৫৬-৪০১		৮৮৫৫-১১১১১
৫) কক্সবাজার মাদ্রাসা	৩৪-২৮	৪৮১-৪০১	১১৮-১১৮
৬) মুর্শিদাবাদ মাদ্রাসা	৫৮-৫৯	১৫৮৯৯-১৪৬৮০	
৭) রাজশাহী মাদ্রাসা	৪৬-৭৬		৩০২০-৩৯৩৫
মোট	১২২৯ - ১৪৫৬	২৬৪১৭ - ২৬৩৩২	২৯৪৪২ - ৩২৫৩৩

১৮৮৮ সালের পরীক্ষার্থীদের বিবরণ

মাদ্রাসার নাম	ছাত্র সংখ্যা	১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	সর্বমোট
১) কলিকাতা মাদ্রাসা	৭২	২৯	১৮	১২	৬৯
২) ঢাকা মাদ্রাসা	৫৭	১০	১২	১৬	৩৮
৩) চট্টগ্রাম মাদ্রাসা	৫১	১১	৭	১৩	৩১
৪) হুগলী মাদ্রাসা	১৯	৭		৫	১২
৫) সাসারাম মাদ্রাসা	৭	—	—	—	—

www.waytojannah.com

এই সময় আলিয়া মাদ্রাসার মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১৭০ জন। তন্মধ্যে ২৫ জন ছাত্র কলেজ বিভাগে এবং ৩০০ জন কেলেঙ্গা ব্রাঞ্চ স্কুলে ছিল। ঢাকা মাদ্রাসার সর্বমোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪২৪ জন, তন্মধ্যে ২৩৮ জন আরবী ও ১৮৬ জন ইংরেজি বিভাগে ছিল। চট্টগ্রাম মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা ৪২১ জন ছিল। হুগলী মাদ্রাসার ছাত্র ছিল মাত্র ৬০ জন। সীতাপুর মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যাও ৬০ জন ছিল। জোড়াঘাট মাদ্রাসায় ছিল ৫৫ জন। চট্টগ্রামের মীর এহিয়া মাদ্রাসায় ১০৮ জন ছাত্র পড়াশুনা করিত। এ সময় চট্টগ্রামের সরকারী মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলবী আবদুল ওয়াদুদ সাহেব একটি স্বতন্ত্র মাদ্রাসার পত্তন করেন। এই মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যাও অল্পদিনে ৩১৮ জনে উন্নীত হয়। মাদ্রাসাটির নাম রাখা হয় এ্যাংলো এরাবিক মাদ্রাসা। গয়ার ইসলামিয়া মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা ছিল ১১১ জন। গয়ার আওরঙ্গবাদস্থ মাদ্রাসায় তখন মাত্র ২২ জন ছাত্র পড়াশুনা করিত।

১৮৯০-৯১ সালে দেশের আনাচে-কানাচে বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিষ্ঠিত মকতবগুলিকে সরকারী পর্যায়ে অনুমোদন দান করা হয়। ১৮৮২ সালের কমিশনকে প্রদত্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের অভিমত অনুযায়ী মকতবগুলির উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছিল। কিন্তু এযাবত মকতবগুলির প্রতি কোনরূপ দৃকপাত করা হয় নাই। অতঃপর এই বৎসরে সরকারী পর্যায়ে মকতবগুলির অনুমোদন দান করিয়া সরকারের পক্ষ হইতে কিছু সাহায্যও মঞ্জুর করা হয়। ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার আলফ্রেড ক্রাফ্‌ট। তিনিই শেষাবধি মকতবগুলির প্রতি মনোযোগী হন এবং মকতবের উন্নয়নকল্পে প্রচুর শিক্ষক ও ইন্সপেক্টর নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি প্রাইমারী স্কুলগুলিতে মুসলমান ছাত্রদের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করেন, যাহার ফলে মকতবের অবস্থার দিন দিন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

এসময় মুসলমান ছাত্রদের দ্বিবিধ প্রকারে বৃত্তি বা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হইত। প্রথমত সরকারী তহবিল হইতে এবং দ্বিতীয়ত মোহসীন ফান্ড হইতে এই বৃত্তি প্রদান করা হইত। মোহসীন ফান্ডের বৃত্তি নিম্নরূপ বরাদ্দ করা ছিল ঃ

১) আরবী বিভাগগুলির জন্য ৪৪ টি বৃত্তি। (৩ হইতে ৭ টাকার মধ্যে)।

২) ইংরেজি স্কুলের ছাত্রদের জন্য দুই বৎসর মেয়াদী ৩৪টি বৃত্তি।

৩) এন্ট্রান্স পাস করার পর কলেজ জীবনে প্রাপ্ত ৮টি বৃত্তি।

৪) এফ-এ পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া ৫টি বৃত্তি।

৫) ২টি পোস্ট গ্রাজুয়েট বৃত্তি।

www.waytojannah.com

সরকারী বৃত্তি নিম্নরূপ ছিল ঃ

১) ৭ টাকা হিসাবে ২০টি বিশেষ জুনিয়র বৃত্তি।

২) ১০ টাকা হিসাবে ২০টি সিনিয়র বৃত্তি।

৩) ৩টি পোস্ট গ্রাজুয়েট বৃত্তি।

অতএব উপরোক্ত ব্যবস্থাদি এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল এবং অসংখ্য ছাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। অতঃপর একদিন দেখা গেল যে, মিঃ গ্রান্টের পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা ফুলেফলে সুশোভিত হইয়া উঠিল। ক্রমান্বয়ে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনেকেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল এবং ইহাকে একটি অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা হিসাবে অভিহিত করিতে লাগিল। অতঃপর এমন দিনও আসিল বহু গ্রাজুয়েট মুসলমান ছাত্র কুরআন শরীফটুকু পড়িয়া লইবার অবসরটুকু পর্যন্ত করিতে পারে নাই।

ছাত্রাবাস সমস্যা

এ যাবত আলিয়া মাদ্রাসা ভবনেই ছাত্রদের থাকার বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু এসময় ছাত্রদের সংখ্যা এতই বাড়িয়া যায় যে, মাদ্রাসা ভবনের নির্দিষ্ট কামরাগুলিতে আর ছাত্রদের স্থান সংকুলান হইতেছিল না। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ছাত্রগণ দলে দলে রাজধানী কলিকাতায় আসিয়া ভিড় জমাইতে লাগিল। কলিকাতা শহর এমনিতেই জনবহুল, সাধারণ লোকদের মাথা গুঁজিবার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত নাই। এমতাবস্থায় ক্রমবর্ধমান ছাত্রদের জন্য আলাদা হোস্টেল পত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯২ সালে দ্বিতল বিশিষ্ট 'ইলিয়ট হোস্টেল' নামে একটি ছাত্রাবাসের পত্তন করা হয়। এই হোস্টেলে একশত পঁয়ত্রিশ জন ছাত্রের থাকিবার বন্দোবস্ত করা হয়। হোস্টেলে আলিয়া মাদ্রাসার উভয় বিভাগের এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের মুসলমান ছাত্রদের জন্য সিট সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু ছাত্রকে বাহিরে থাকিতে হইত। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে হোস্টেলকে আরো একতলা সম্প্রসারিত করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছাত্রদের আবাসিক সমস্যার কোন সুরাহা হয় নাই। অতঃপর ১৯০৮ সালে এই মর্মে মাদ্রাসার শুভানুধ্যায়ীদের এক বৈঠক বসে এবং এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ইলিয়ট হোস্টেল শুধু মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত থাকিবে। আর কলেজের ছাত্রদের জন্য আলাদা একটি নূতন হোস্টেলের জন্য সরকারের কাছে জোর সুপারিশ করা হউক।

www.waytojannah.com

অতঃপর এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের জন্য বৌ বাজারে একটি বাড়ি ভাড়া নেন এবং ইহাকে হোস্টেলে রূপান্তরিত করেন। ইলিয়ট হোস্টেলে যে সব কলেজের ছাত্ররা ছিল সকলেই এই নূতন হোস্টেলে চলিয়া আসে। হোস্টেলটি ঘনবসতি পূর্ণ হিন্দু-প্রধান এলাকায় অবস্থিত ছিল। এখানে সব সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশংকা লাগিয়াই থাকিত। এজন্য মুসলমানরা আবার দাবি জানাইয়া বসিল যে, একটি উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করিয়া কলেজের মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন হোস্টেলের পত্তন করা হউক। এই দাবির অগ্রভাগে ছিলেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য নওয়াব আবদুল জব্বার। এই মর্মে অতঃপর ১৯০৮ সালে উক্ত নওয়াবের বাড়িতে একটি জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কলেজের ছাত্রদের জন্য পূর্ব পরিকল্পিত একটি ছাত্রাবাসের প্রয়োজন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই মর্মে সরকারের কাছে জোর দাবি পেশ করা হয়। কিন্তু এই দাবি কার্যকরী হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। অতঃপর এই মর্মে পুনরায় মুসলমানরা ১৯০৯ সালে টাউন হলে একটি বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে মুসলমানরা প্রস্তাবিত হোস্টেলের জন্য মুক্ত হস্তে অর্থদান করিতে শুরু করিলেন। এই চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপারে ঢাকার নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং অনায়াসেই প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়।

এই চাঁদা সংগ্রহ এবং ছাত্রাবাস নির্মাণের ব্যাপারে মুসলমানদের উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত হইয়া হোস্টেল নির্মাণে সরকার আধাআধি খরচ বহন করিবেন বলিয় অঙ্গীকার করেন। মোটকথা, এইভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি আলাদা সুরক্ষিত ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ অগ্রসর হয়। হোস্টলটির নামকরণ করা হয় 'ব্যাকার হোস্টেল'। ১৯১৭ সালে এই হোস্টেলটির আরো সম্প্রসারণ হয়। এই হোস্টেলে প্রায় দুই শত ছাত্র স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত।

অতঃপর উভয় হোস্টেলের ছাত্রদের ধর্মীয় প্রয়োজনে একটি মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৯১৮ সালে আকস্মিকভাবে মিঃ কে. এ. এস জামাল সি আই এ মাদ্রাসা পরিদর্শন করিতে আসিলে মসজিদ সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হন এবং নিজের তহবিল হইতে দশ হাজার টাকা চাঁদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে কিছুদিনের

মধ্যেই ৪০ হাজার টাকার একটি তহবিল গঠিত হয়। এই তহবিলে যাহারা মোটা অংক দান করিয়াছেন তাঁহাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১. মিঃ কে. এ. এস জামাল সি. আই. এ		১০ হাজার টাকা
২. শামসুল উলামা আতাউর রহমান	অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী	১৬ হাজার টাকা
৩. চৌধুরী আজিরুল হক, মুঙ্গের	(বিহার)	১ হাজার টাকা
৪. অনারেবল মিঃ আমিনূর রহমান	কলিকাতা	৩ হাজার টাকা
৫. অনারেবল মিঃ আলতাফ আলী চৌধুরী	কলিকাতা	৫ হাজার টাকা
৬. মিঃ আতাউল হক সওদাগর,	কলিকাতা	৫ হাজার টাকা
	মোট —	৪০ হাজার টাকা

পাঁচ শত টাকা পুরস্কার প্রদানের ভিত্তিতে মসজিদের জন্য উপযুক্ত শিল্পীদের কাছে নক্‌শা আহবান করা হয়। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপত্যবিদ ও শিল্পীদের পক্ষ হইতে বহু নকশা পেশ করা হয়। কিন্তু শেষাবধি পাটনার মৌলভী জমিরুদ্দীন নামক জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের নকশা মনঃপুত হয়। নকশা অনুযায়ী মসজিদ নির্মাণ শুরু করার প্রারম্ভেই দেখা গেল দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত বেশি। অতএব মসজিদের জন্য আরো চাঁদা সংগ্রহ করিতে হইবে। এইভাবে মসজিদ নির্মাণের কাজ বেশ কিছুকাল পিছাইয়া যায় এবং শেষাবধি ১৯৩৭ সালে এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়। ইলিয়ট এবং বেকার হোস্টেলের মাঝখানে স্থাপিত এই মসজিদ বেশ ঐতিহ্য মণ্ডিত এবং মুসলিম স্থাপত্যের একটি প্রকৃষ্ট নমুনা হিসাবে বিরাজমান।

পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্ট

১৮৯২—৯৮ সালে প্রকাশিত জনশিক্ষা বিভাগের পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, মোহসীন ফাণ্ডের বার্ষিক আয় ততদিনে ৬৩১০০ টাকায় উন্নীত হইয়াছে। এই রিপোর্ট মেয়াদে মোহসীন ফান্ডের ব্যয় বরাদ্দ নিম্নরূপ ছিল ঃ

	টাকা	আনা	পাই
১. আরবী মাদ্রাসাসমূহের জন্য	৩৩৮৫২	১৪	১
২. হাই স্কুলের মৌলবীদের বেতন	৫৩৩৪	১৫	১
৩. বৃত্তি বা ভাতা	৮৪৩৯	১১	৬
৪. ছাত্রদের কলেজের বেতন বাবদ	১৯৮০৩	১	৪
	৬৭৪৩০	১০	৪

www.waytojannah.com

ইহাতে বেসরকারী মাদ্রাসাগুলিতে প্রদত্ত সাহায্যও শামিল করা হইয়াছে। যেমন সিলেট মাদ্রাসার জন্য ৮ শত টাকা, সীতাপুর মাদ্রাসার জন্য ২০ টাকা, জোড়াঘাট মাদ্রাসার জন্য ৪৮০ টাকা, ত্রিপুরা রংপুর মাদ্রাসার জন্য ৭২০ টাকা এবং মেদেনীপুর মোহামেডান হোস্টেলের জ্য ১৯২ টাকা।

১৮৯২-৯৩ সালে মাদ্রাসার খরচের তালিকা

মাদ্রাসার নাম	ছাত্রসংখ্যা	সরকারী খরচ	মোহসীন ফান্ডের খরচ
	১৮৯২-৯৩	১৮৯২-৯৩	১৮৯২-৯৩
১) আলিয়া মাদ্রাসা	৪২৫-৫০০	১১৮০৯-১১৪১৯	২২০১-২৬১৬
২) ঢাকা মাদ্রাসা	৪২২-৪১৬	— —	১৫৩৯১-১৪৩২৫
৩) চট্টগ্রাম মাদ্রাসা	৫৪৩-৫৫৮	— —	১১৫৭৮-১১৬৩৮
৪) হুগলী মাদ্রাসা	৬৮-৪৮	— —	২১২৩-২৩৮৯
৫) রাজশাহী মাদ্রাসা	৫৯-৭৪	— —	৩৫২৭-৩৪৯২
৬) কক্সবাজার মাদ্রাসা	৬০-৬০	৪২৯.৪৬৫	১১১-২৪৯২
৭) মুর্শিদাবাদ মাদ্রাসা	৫৯-৬৬	১৫২১৯-১৩৩৪৭	— —
		২৭৪৫৭.২৫২৩১	৩৪৯৩১-৩৪৭৫২

মুর্শিদাবাদের নবাবের মাদ্রসা মূলত একটি হাই স্কুল ছিল। অতএব মূল খরচ হইতে এই মাদ্রাসার খরচ বাদ দিলে দেখা যায় যে, ১৮৯৩ সালে সরকার কর্তৃক সকল মাদ্রাসার জন্য সর্বমোট ১১৮৮৪ টাকা এবং মোহসীন ফান্ড হইতে ৩৪৭৫২ টাকা খরচ করা হইয়াছে। অথচ এই বৎসর বাংলা সরকারের শিক্ষা বাজেট ছিল ৫,৭৮,৮৭০ টাকা।

এই বৎসর মাদ্রসার আরবী বিভাগের ইংরেজি ক্লাসে ৩৫ জন ছাত্র শিক্ষারত ছিল। ১৮৮৮ সালে মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি নাইট স্কুল খোলা হইয়াছিল। এই স্কুলের উপস্থিতির তেমন বাধ্যবাধকতা ছিল না। এই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩১ জন। স্কুলটি অতঃপর এই বৎসরে আসিয়া বন্ধ হইয়া যায়। মাদ্রাসার আবাসিক ছাত্রদের সংখ্যাও ৮৪ জন হইতে ৭৮ জনে কমিয়া আসে। অবস্থাপন্ন ছাত্রদের জন্য এযাবত কোন ছাত্রাবাসের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই। ১৮৯২ সালে অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মাত্র ৯ জন ছাত্র মাদ্রাসায় পড়াশুনা করিত। ইহারা অযোধ্যা এবং মহীশুরের নবাব পরিবার হইতে আসিয়াছিল।

এই সময় ঢাকা মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা ছিল সর্বমোট ৪১৬ জন। তন্মধ্যে ২১৭ জন আরবী ও ১৯৯ জন এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে পড়াশুনা করিত। চট্টগ্রামের লোকেরা একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল যে, এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগকে ইংরেজি হাই

www.waytojannah.com

স্কুলের সমমানে উন্নীত করা হউক। কিন্তু সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। রাজশাহী এবং হুগলী মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগের মান কলেজের সহিত সম্পর্কশীল ছিল। এই সময়ে চট্টগ্রামের মীর এহিয়া মাদ্রাসায় মোট ১২২ জন ছাত্র পড়াশুনা করিত। কক্সবাজার মাদ্রাসায় আরবী ফারসী ছাড়াও ইংরেজিং ও বাংলা পড়ানো হইত। এই মাদ্রাসা ক্রমান্বয়ে মিডল স্কুলের রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল।

এই সময় আরো অনেক বেসরকারী মাদ্রাসা ছিল। যেমন - বর্ধমান বিভাগের মেদিনীপুর মাদ্রাসা, বোহারা মাদ্রাসা, কুসুমগ্রাম ও সীতাপুর মাদ্রাসা। ঢাকা বিভাগের ছিল ফরিদপুর মাদ্রাসা, জামালপুর মাদ্রাসা। চট্টগ্রাম বিভাগে ইসলামিয়া মাদ্রাসা, সুলতানপুর ভিক্টোরিয়া মাদ্রাসা চট্টগ্রাম ও হোসামিয়া মাদ্রাসা, ত্রিপুরা। পাটনা বিভাগে আহমদিয়া মাদ্রাসা, পাটনা, ইসলামিয়া মাদ্রাসা, দানাপুর, হানিফিয়া মাদ্রাসা ও আহমদিয়া মাদ্রাসা, আড়া। ভাগলপুর বিভাগে দালালপুর মাদ্রাসা ও ছোট নাগপুর ইত্যাদি মাদ্রাসা চালু ছিল।

প্রিন্সিপালের রদবদল

১৮৮১ সালে মিঃ এ এফ হোর্নেলকে স্থায়ী প্রিন্সিপাল নিয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৯০ সালে তিনি দীর্ঘমেয়াদী ছুটি নিতে শুরু করেন, যাহার ফলে উপর্যুপরি সাময়িকভাবে মাদ্রাসায় কয়েকজন প্রিন্সিপাল নিয়োগ করা হয়। এই ঘন ঘন রদবদল এবং পুনর্নিয়োগের দরুন মাদ্রাসার আভ্যন্তরীণ কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। এই সময় যাহাদের প্রিন্সিপাল নিয়োগ করা হয় তাহাদের নাম যথাক্রমে মিঃ এম, প্রোথেরো এম. এ (১৮৯০), ইহার পর মিঃ এফ জে রো এম. এ (১৮৯২), তাহাকে ১৮৯৫ সালেও আর একবার সাময়িকভাবে প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করা হয়। ১৮৯৫ সালে মিঃ হোর্নেল চিরতরে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৮৯৫ সালে মিঃ জে রো- কে তৃতীয় বারের মতো সাময়িক প্রিন্সিপাল নিয়োগ করা হয়। ইহার পর ১৮৯৯ সালে মিঃ এফ সি হিল বি, এ, বি, এস, সি, কিছুকালের জন্য প্রিন্সিপাল ছিলেন। এই বছরেই স্যার এম. এ স্টেইন পি, এইচ ডি, প্রিন্সিপাল নিয়োজিত হন। অতঃপর ১৯০০-০২ সালে মিঃ স্টার্ককে এই পদে বহাল করা হয়। মাঝখানে মিঃ স্টাক কিছুকাল অনুপস্থিত ছিলেন এবং এই সময়ে লেঃ কর্নেল জি. এস. এ রেংকিং প্রিন্সিপাল ছিলেন। অতঃপর ১৯০৩ সালে বিখ্যাত প্রাচ্য ভাষাবিদ স্যার ডেনিসন রস পি, এইচ ডি মাদ্রাসায় স্থায়ী প্রিন্সিপাল হিসাবে নিয়োজিত হন। তিনি ১৯১০ সাল অবধি এই পদে বহাল ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মাঝখানে সাময়িকভাবে তাহার অনুপস্থিতিতে কয়েক মাসের জন্য মিঃ এইচ. ই. স্টেপলেটনকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯০৭ সালে কিছু কালের জন্য মিঃ চেপম্যানও প্রিন্সিপাল ছিলেন।

www.waytojannah.com

মাদ্রাসা সংস্কারের নূতন উদ্যোগ

মিঃ ডেনিসন প্রিন্সিপাল থাকাকালীন মাদ্রাসার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দানা বাঁধিয়া উঠে। তন্মধ্যে ১৯০৩ সালে মুসলমানরা সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবের মোদ্দা কথা হইল, মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে এবং একটি বিশেষ মান অবধি শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা বিষয় সকলের জন্য সমমানের করিতে হইবে। এই মানের পর হইতে শিক্ষার দুইটি শাখা প্রবর্তিত হইবে। তন্মধ্যে একটি ইংরেজি শিক্ষার জন্য। এই বিভাগে ইংরেজি এবং প্রাচ্য বিষয়াদির শিক্ষা থাকিবে। এই বিভাগের জন্য আলিয়া মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগকে নিয়োজিত করিতে হইবে। দ্বিতীয় বিভাগটি থাকিবে আরবীর জন্য। এই বিভাগ শুধু প্রাচ্য ভাষাদি, বিশেষত ধর্মীয় শিক্ষার প্রাধান্য থাকিবে। কিন্তু সরকার অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে করিলেন না। কারণ সরকার মনে করিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষার জন্য যত বেশি সময় ব্যয় হইবে ততই প্রাচ্য শিক্ষার বেলায় সময়ের ঘাটতি পড়িয়া যাইবে। ফলে প্রাচ্য শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে কমিয়া আসিবে এবং শিক্ষা গ্রহণের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। ফলে এধরনের ছাত্ররা ইংরেজি বা আরবী কোনটাতেই পুরাপুরি ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবে না। এই প্রস্তাবের বদলে অপর একটি প্রস্তাব পেশ করা হইল যে, যেসব ছাত্র (আরবী বিভাগের) ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিতে চায় তাহাদিগকে আগে ভাগেই আরবী বিভাগের পড়া শেষ করিয়া যথা নিয়মে এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে ভর্তি হইতে হইবে। পক্ষান্তরে, এ্যাংলো বিভাগের যেসব ছাত্র আরবী শিখিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে এই বিভাগের পড়া সম্পন্ন করিয়া অতঃপর যথানিয়মে আরবী বিভাগে ভর্তি হইতে হইবে।

ইহার কিছুকাল পর এদেশীয় শিক্ষার পক্ষপাতী একদল লোক আবার একটি অভিনব প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবে বলা হয় যে, মাদ্রাসায় ইসলামী শিক্ষার মানকে আরো এতখানি উন্নত করা হউক যে, এখানে শিক্ষা লাভের পর বাংলাদেশের ছাত্রদেরকে আর যেন কোথাও যাইতে না হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতার আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভের পর বহু ছাত্র ইল্‌মে হাদীস ও তফসীরের আরো ব্যাপক অধ্যয়নের জন্য পাক-ভারতের অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রে গমন করিত। এসব প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, আগামীতে মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপনের পর ছাত্রদেরকে বিশেষ সনদ বা ডিগ্রী প্রদান করিতে হইবে। শেষোক্ত প্রস্তাবটি যেহেতু খুবই যুক্তিযুক্ত, এই জন্য সরকার সনদ বা ডিগ্রী প্রদানের প্রস্তাবটি সম্পর্কে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু কোন একটি কারণে শেষাবধি এই বিষয়ে বিবেচনা নিশ্চল হইয়া পড়ে। অবশ্য এই প্রস্তাবেরই ফলশ্রুতি হিসাবে

www.waytojannah.com

সরকার এক বিজ্ঞপ্তি (নং ৭৩১ তাতে ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৩) হাদীস তফসীর, ইতিহাস ও ভূগোলকে সিলেবাস ভুক্ত করেন। অতঃপর ১৯০৭ সালের এক সম্মেলনে সরকার হাদীস, তাফসীরের জন্য প্রবেশনাল গ্রেডে একটি পদও সৃষ্টি করেন। এই পদে সর্বপ্রথম অধ্যাপক নিয়োজিত হন শামসুল ওলামা মাওলানা সফিউল্লাহ।

জনশিক্ষা বিভাগের পাঁচসালা রিপোর্টের উদ্ধৃতি (১৯০২-৬)

জনশিক্ষা বিভাগের পঞ্চ বার্ষিকী রিপোর্টে (১৯০২-৬) আলিয়া মাদ্রাসা সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করা হইয়াছে, এইখানে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল ঃ

"আলিয়া মাদ্রাসা—আলিয়া মাদ্রাসাতে দুইটি বিভাগ রহিয়াছে এবং এখানে দুই ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়। একটিতে ইংরেজি ও অপরটিতে প্রাচ্য দেশীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরেজি বিভাগটি একটি সাধারণ হাইস্কুলের মানের। আরবী বিভাগের ছাত্ররা স্কুল এবং কলেজের শিক্ষা বিষয়সমূহ এগার বৎসর ধরিয়া পড়াশুনা করে।

একদিক দিয়া মাদ্রাসাকে সাধারণ ইংরেজি কলেজের মান অবধি ধরা যাইতে পারে। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু ছাত্ররা এই কলেজে ভর্তি হইতে পারে। তবে তাহাদের শিক্ষার নির্দিষ্ট কলেজ হইল প্রেসিডেন্সী কলেজ। আলিয়া মাদ্রাসার অস্থায়ী প্রিন্সিপাল এই সম্পর্কে বলেন ঃ

আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের সাথে ছাত্রদের সাক্ষাৎকার অনেক সময় এ কারণেও হইয়া পড়ে যে, এইসব ছাত্ররা মাদাসার হোস্টেলে থাকে। তাছাড়া মুসলিম ইন্সটিটিউটেও এইসব ছাত্রদের সাথে তাঁহার দেখা হয়। ইহা ছাড়া ছাত্রদের সাথে প্রিন্সিপালের দেখা-সাক্ষাতের আর কোন সুযোগ হয় না। অতএব এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোন ইতিহাস হইতেই পারে না। যদিও কোন ইতিহাস প্রণয়ন সম্ভব হয়, তবে তাহা হইবে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসের একটি পাতা। উহা আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাসের কোন অংশ হইবে না।"

"৩১শে মার্চ ১৯০৭ সালে এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের ৪২ জন ছাত্র কলেজে অধ্যয়নরত ছিল। তন্মধ্যে ৩০ জন ছাত্রকে এফ. এ পরীক্ষার জন্য মনোনীত করা হয়। ইহাদের মাঝে ১৭ জন পাস করে এবং একজন ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।"

"এ্যাংলো পার্সিয়ানের স্কুল বিভাগে এসময় ২৬৫ জন ছাত্র ছিল। ২৪ জন ছাত্রকে মেট্রোপলিটন পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে ১৯ জন কৃতকার্য হয়। ইহাদের মাঝে একজন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। গত বছরের (১৯০৬) ফেব্রুয়ারী মাসে একটি সি (c) ক্লাস খোলা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে।"

www.waytojannah.com

গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের জনপ্রিয়তা অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা পূর্বের তুলনায় প্রায় শতকরা চল্লিশভাগ কমিয়া গিয়াছে। প্রিন্সিপাল চীপম্যান এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ

আমরা এই আইনের ঘোর বিরোধিতা করি। সামান্য বেতন দিয়া কোন গ্রাজুয়েট শিক্ষক মেলা বর্তমানে প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব আমি আশা করি সরকার আমার দাবি গ্রাহ্য করিবেন। এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের সমস্যা এখানকার প্রিন্সিপালের কাছে রীতিমত অসমাধানযোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিভাগের হেড মাস্টার ইউরোপীয়ান হওয়া উচিত।"

"আরবী বিভাগে স্কুল এবং কলেজের পাঠ্য বিষয় এগার বৎসরের মধ্যে সীমিত। শিক্ষার মাধ্যম উর্দু। তবে উপরের কতিপয় ক্লাসে কোন কোন বিষয় ফারসীতেও শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিভাগে আরবী এবং ফারসী সাহিত্য ছাড়া বিভিন্ন ইসলামী বিষয় (যেমন ঃ ফেকা, মানতেক, বালাগাত, হেকমত ও দীনিয়াত) শিক্ষা দেওয়া হয়। কুরআন মজিদের তাফসীর এবং হাদীসসমূহের শিক্ষাও ইহাতে সীমাবদ্ধ। ইংরেজিও শিক্ষা দেওয়া হয়, শতকরা ৫৬ জন ছাত্র ইহাতে অংশগ্রহণ করে।"

"১৯০৭ সালের ৩১শে মার্চ এই বিভাগে ৪৭৩ জন ছাত্র অধ্যয়নরত ছিল। এই বিভাগের ছাত্রদেরকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগুলির জন্য প্রস্তুত করা হয়। ১৯০৬ সালে ৬২ জন ছাত্রকে মনোনীত করা হয়। তন্মধ্যে ৫৩ জন উত্তীর্ণ হয় এবং ইহাদের ২৬ জন প্রথম বিভাগ লাভ করে। এইভাবে গড়ে শতকরা ৮৫ জন ছাত্র পরীক্ষায় পাস করে।"

"এই বিভাগের ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু মিঃ চীপম্যানের মতে জনপ্রিয়তা কমিয়া আসিয়াছে। মিঃ চীপম্যান এই ব্যাপারে বলেন ঃ

আলিয়া মাদ্রাসায় আরবী বিভাগের ছাত্র সংখ্যা বর্তমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই বিভাগের শিক্ষা বিষয়ও মোটামুটি একটি গ্রহণযোগ্য মানে উন্নীত করা হইয়াছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিভাগের প্রতি সবার আকর্ষণ কমিয়া আসিয়াছে এবং অচিরেই এই পরিস্থিতির আরো অবনতি হইবে। এই বিভাগের শিক্ষক মহোদয়গণ বিগত পাঁচসালা রিপোর্ট প্রণয়নের সময়ই অশীতিপর ছিলেন। অথচ তাঁহারা এখনও শিক্ষকতা করিতেছেন। কিন্তু আর কতকাল? তাঁহারা নিঃসন্দেহে যোগ্য শিক্ষক। তাঁহারা অবসর গ্রহণ করার পর এই ধরনের যোগ্য শিক্ষক আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"

মিঃ চীপম্যান হুগলী মাদ্রাসা সম্পর্কে বলেন ঃ

"১৯০৭ সালের ৩১শে মার্চে হুগলী মাদ্রাসায় ৮৪ জন ছাত্র ছিল। মাদ্রাসায় সর্বমোট খরচ (১৯০৬-০৭ সালে) সর্বমোট ৩১৫১ টাকা। ১৯০৬ সালে ২৮ জন

www.waytojannah.com

ছাত্রকে পরীক্ষার জন্য মনোনীত করা হয়। তন্মধ্যে ১৫ জন কৃতকার্যতা লাভ করে। এইভাবে শতকরা পাসের হার ৫৪ জনে দাঁড়ায়।

এই সময় সরকারী মাদ্রাসা ছাড়া আরো ১৬টি বেসরকারী মাদ্রাসা ছিল। তন্মধ্যে ৭টি মাদ্রাসায় সরকারী সাহায্য প্রদান করা হয়। এই মাদ্রাসাগুলির পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

বিভাগ	মাদ্রাসার সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
বর্ধমান বিভাগ	৫	১৬৪
পাটনা বিভাগ	৪	৪২৬
ছোটনাগপুর বিভাগ	৪	১৬৭
ভাগলপুর বিভাগ	৩	১৫০

সাবেক জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ নাথন তাঁহার পাঁচসালা রিপোর্টে কলিকাতার স্থানীয় মাধ্যমিক স্কুলগুলির উল্লেখ করিতে গিয়া মুসলমানদের বিশেষ স্কুল হিসাবে মোহামেডান স্কুলের নাম করেন। এই স্কুলটির নাম উডবার্ণ এম. ই. স্কুল। এই স্কুল আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। ১৯০৭ সালের ৩১শে মার্চে এই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৪২ জন। এই স্কুল হইতে ২ জন ছাত্র মাধ্যমিক বৃত্তি লাভ করে। এখন এই ধরনের আরেকটি স্কুল উত্তর কলিকাতায় পত্তন করার প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি। ড. রাস এবং মৌলবী শামছুল হুদা যে প্রাইমারী স্কুলটির পত্তন করিয়াছিলেন উহাকে অতি সহজেই মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত করা যায়।"

মি. নাথন তাঁহার রিভিউর ১১৪১ নং ধারায় মাদ্রাসার কেন্দ্রীয় পরীক্ষার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এইসব কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগুলোর বন্দোবস্ত করেন।

এই পরীক্ষায় আসাম এবং পূর্ব বাংলার ছাত্ররাও অংশগ্রহণ করে। সাধারণত এই পরীক্ষা বছরের এপ্রিল মাসে হইয়া থাকে।

১৯০৬ সালের এপ্রিলে সর্বমোট ২৮৫ জন ছাত্র এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে শতকরা ৫৬ জন হিসাবে ১৫৯ জন ছাত্র পাস করে। এই ছাত্রদের মাঝে এগারজন অনুমোদিত মাদ্রাসার ছাত্রও ছিল। টাইটেল পরীক্ষা প্রবর্তনের প্রশ্নটি বর্তমানে বিবেচনাধীন।

মুসলিম ইন্সটিটিউট

এই পঞ্চ বার্ষিকী রিপোর্টে মাদ্রাসার ছাত্রদের একটি কমন রুমের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম দিকে এই কমনরুম মাদ্রাসার ছাত্রদের ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগঠিত হইয়াছিল। পরে এই কমনরুম আরো উন্নতি লাভ করে এবং মুসলমানদের একটি

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করে। এই ইন্সটিটিউট সম্পর্কে মিঃ চীপম্যান বলেন ঃ

"এই ইন্সটিটিউট বাহ্যত আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের নামে এবং বস্তুত কলিকাতার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুসলমান ছাত্রদের একমাত্র মিলনায়তন হিসাবে পরিগণিত। পদাধিকার বলে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমান ছাত্রদের পারস্পরিক জানাশুনা ও মেলামেশা বহুলাংশে সুগম হইয়াছে।"

"মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কিত জটিলতা তাহাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কার হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বৃটিশ সরকার ইংরেজি প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। হিন্দুরা এই শিক্ষাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিলেন। এই শিক্ষা হইতে মুসলমানরা পিঠটান দিলেন এবং অদ্যাবধি বিপুল সংখ্যক মুসলমান এই শিক্ষাকে সুনজরে দেখে না। অথচ এডুকেশন কমিশনের সুপারিশের সমালোচনা করিতে গিয়া ভারত সরকার সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে,

প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও যতদিন না মুসলমানরা হিন্দুদের মতো এই শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, ততদিন তাহারা উচ্চ রাজকার্যে ক্ষমতাসীন হইতে পারিবে না। মুসলমানরা নিজেদের ছেলেপিলেদেরকে যে শিক্ষা দিতে চান সরকার সে শিক্ষার গুরুত্ব কমাইতে চান না বরং সেজন্য সরকার উপযুক্ত বন্দোবস্তও করিবেন। কিন্তু সরকার চান না যে, এই দুই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে বিরাট ব্যবধান রচিত হইবে।"

মুসলিম ইন্সটিটিউটের গোড়াপত্তন

মাদ্রাসা সংলগ্ন তালতলায় মুসলমান ছাত্রদের দুইটি ভিন্ন সংস্থা ছিল। একটির নাম Muslim debating society ও অপরটির নাম Society for the mutual Improvement of youngmen। এই দুই সংস্থার সদস্য পারস্পরিকভাবে উভয় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিল। কালক্রমে উভয় সংস্থার সদস্যদের শুভ-বুদ্ধির উদয় হইল যে, দুই প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করিয়া একটিতে পরিণত করা হউক। অতঃপর উভয় সংস্থার সম্মতিক্রমে আলিয়া মাদ্রাসায় মুসলিম ইন্সটিটিউটের পত্তন হয়। এই সংস্থা গঠনের ব্যাপারে যাহারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে মৌলবী আবুল মোকারেম ফজলুল ওহাব (পরবর্তী কালে মাদ্রাসার গ্রন্থাগারিক হন), চৌধুরী আজিজুল হক (সংস্থার সেক্রেটারী), মৌলবী আবুল ফয়েজ মোহাম্মদ আব্দুল আলী এম. এ (নওয়াব জাদা), মৌলবী হামেদ ও মৌলবী আবুল হামেদ শাদ এম. এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.waytojannah.com

১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন মাদ্রাসার হেড মাস্টার মিঃ এ. এইচ স্টার্ক বি. এ। পরবর্তী সভাপতি হন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ড. এ ডিরাস এবং সেক্রেটারী নির্বাচিত হন মৌলবী কামালউদ্দিন এম. এ (আই আই এস)। মি. স্টার্ক-এর বিদায় গ্রহণের পর মি. রাস সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং অল্প দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সদস্য বৃদ্ধি হয়। এই প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা শেষে এতখানি বৃদ্ধি পায় যে, মুসলমান ছাড়া অমুসলিমরাও ইহাতে সদস্যভুক্ত হন। স্যার গুরুদাস বানার্জি, স্যার রুপার লুবথরাজ, মি. টিকেনসন, মি. রেডক্লিফ (সম্পাদক, স্টেটসম্যান), রায় শরৎচন্দ্র দাস, কুমার কমলনন্দ সিং ও শ্রীনগরের রাজা মি. হরিনাথদের নাম তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খাজা নাজিমুদ্দিন, জনাব এ. কে. ফজলুল হক ও জনাব সোহরাওয়ার্দীর মতো দেশবরেণ্য নেতারাও এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠানের অভাবিত উন্নতি দেখিয়া বাংলা সরকার বার্ষিক ৩০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের জন্যে আলিয়া মাদ্রাসার ব্রাঞ্চ স্কুলের ভবনটি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। আসবাবপত্র খরিদ করিবার জন্য প্রাথমিকভাবে ৩ হাজার ১ শত পঞ্চাশ টাকা এককালীন প্রদান করা হয়। কলিকাতা পৌরসভা ওয়েলেসলী স্কোয়ারস্থ পুকুরটি এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে অর্পণ করে। ১৯৫০ সালে Journal of the Muslim Institute নামে নিয়মিতভাবে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। ম্যাগাজিনের সম্পাদনা করেন জনাব আবুল ফয়েজ আব্দুল আলী। ১৯০৬ সালে এখান হইতে একটি উর্দু পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। দেশ বিভাগের কিছু কাল পূর্বে আলিয়া মাদ্রাসার বাউণ্ডারীতেই মুসলিম ইন্সটিটিউটের জন্য একটি প্রাসাদোপম ভবন নির্মাণ করা হয়। অদ্যাবধি কলিকাতায় মুসলিম ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম জাঁকজমকপূর্ণভাবে চলিতেছে।

মি. চীপম্যানের একটি বিবৃতি

এমন এক কাল ছিল যখন সরকারের শিক্ষা তহবিলের সমুদয় অর্থ এই দেশীয় শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইত। লর্ড ম্যাকালে এই রীতির মোড় ঘুরাইয়া দিলেন। আমার বিলক্ষণ জানা আছে যে, সংস্কৃতের বেলায় সরকার যেমন অমনোযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি আরবী ফারসীও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে পারে নাই। তবে একথা স্মর্তব্য যে, আরবী ফারসীর বেলায় মুসলমানদের মনে যে পরিমাণ মমত্ববোধ রহিয়াছে, সংস্কৃতের বেলায় হিন্দুদের তাহা নাই।

ইংরেজি উৎকর্ষ ও বিকাশের জন্য রাজকীয় কায়দায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন করা হইয়াছে এবং শুধু কলিকাতা শহরেই অর্ধ ডজন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা

www.waytojannah.com

হইয়াছে। বিজ্ঞান এবং সুকুমার শিল্পের পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই শিক্ষার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই দেশীয় শিক্ষার জন্য তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন ছিল তেমনি স্রোতে গা-ভাসাইয়া চলিয়াছিল। বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা ইহাতে তেমন উপকৃত হইতেছে না। মুসলমানদের উপর বরাবর অভিযোগ আনয়ন করা হয় যে, সরকার শিক্ষা খাতে যে সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তন করিয়াছেন, মুসলমানরা তাহা হইতে উপকার লাভ করেন না, এই কথা সত্য তাহা মানি। কিন্তু মুসলমানরা তাহাদের পৈতৃক ঐতিহ্যের প্রতি এতই আস্থাশীল যে, তাহারা নিজস্ব পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই শিক্ষাই তাহাদের মানসিক পরিপুষ্টির বাহন, এই শিক্ষাতেই তাহারা বেশি প্রভাবিত। আমি জানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ফেলো (fellow) আমার এই কথার প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না। এ ব্যাপারে আমি সরকারের অবিচার সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিতে চাই। সরকারী আইনে সুস্পষ্ট রহিয়াছে যে, মাদ্রাসার চতুর্থ শ্রেণীর (চাহারম) মান এন্ট্রান্স-এর বরাবর থাকিবে। কিন্তু বাস্তবে তাহা হয় নাই। মাদ্রাসা উত্তীর্ণ ছাত্ররা যেন স্কুলের ছাত্রেরই বরাবর, সর্বত্র এই ধরনের একটা ধারণা প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু আমার মতে মাদ্রাসার কোন ছাত্র চাহারম ক্লাসের ফাইনাল পাস করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন গ্রাজুয়েটের চেয়ে কোন অংশে কম যোগ্য হয় না। আমার মতে সরকারের উচিত এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি কোনরূপ সন্দেহজনক মনোভাব না রাখিয়া বরং এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করা। সম্প্রতি আলীগড়ে যে একটি আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে, উহার নাম রাখা হইয়াছে আরবী স্কুল। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইল আরবী দর্শন এবং ইসলামী ইতিহাস নিয়া গবেষণা চালাইয়া যাওয়া। এইখানে আরবী শিক্ষা প্রচলিত পদ্ধতিতেই দেওয়া হইবে। এইখানে পাশ্চাত্য স্কলারশিপের বন্দোবস্ত রাখা হইয়াছে। আরবীর জন্য একজন অধ্যাপক নিয়োগ করা হইয়াছে। সরকারী অধ্যাপক নিয়োগেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জার্মানী হইতে একজনকে আনা হইয়াছে। এই পদ্ধতি এবং কার্যক্রম সঠিকভাবে চালু করা হইয়াছে। বাংলাদেশেও উহার অনুসরণ করা উচিত।

এই পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্টের শেষে বলা হইয়াছে, এইসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করিবার জন্য প্রভাবশালী এবং সভ্রান্ত মুসলমানদের একটি বৈঠক আহবান করা হইতেছে। এই বৈঠকে শিক্ষা সম্পর্কিত জরুরী বিষয়াদি ছাড়াও মাদ্রাসার টাইটেল কোর্স খোলা সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। এইসব জরুরী সংস্কার কার্যকরী করিতে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু এই সংস্কারের অতীব প্রয়োজন রহিয়াছে।

www.waytojannah.com

আর্ল কনফারেন্স

১৯০৩ সালে মুসলমানদের আরবী শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার জন্য সরকারের কাছে একটা আবেদন পেশ করা হইয়াছিল। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার হাদীস ও তাফসীর বিষয়কে এডিশনাল বিষয় হিসাবে অনুমোদন করেন এবং এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইয়াছিল। জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর উপরোক্ত পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্টে এই ব্যাপারটি একটি কনফারেন্সে সম্পন্ন করা হইবে বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বেই বঙ্গভঙ্গের দিন ঘনাইয়া আসে এবং চারিদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝে এসব চাপা পড়িয়া যায়।

বঙ্গভঙ্গ

১৯০৫ সাল বাংলা দেশের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় লর্ড কার্জন (১৬ই অক্টোবর ১৯০৫) চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহকে বাংলা ভূখণ্ড হইতে আলাদা করিয়া আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া আলাদা প্রদেশ হিসাবে চিহ্নিত করেন। অধিকাংশ মুসলমান এই বিভক্তিকে সমর্থন করেন। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় এবং অন্যরা এই বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। যাহার ফলে ১৯১১ সালে দিল্লী সরকার বাধ্য হইয়া এই সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া দেন। বঙ্গ ভঙ্গের এই ছয় বৎসর কাল পূর্ব বঙ্গের মাদ্রাসাসমূহ আলাদা ব্যবস্থাপনার অধীনে চলিতে থাকে। কিন্তু পাঠ্য বিষয় পূর্বে যাহা ছিল তাহাই রাখা হইয়াছিল। ১৯০৭ সালে জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ আর্লকে মুসলমান শিক্ষা সম্পর্কিত একটি চূড়ান্ত সম্মেলনের আয়োজন করিবার জন্য স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করা হয়। মিঃ আর্ল একটি বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনের জন্য বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হইয়াছিল। এই সম্মেলন শেষে মিঃ আর্ল মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কিত একটি চূড়ান্ত সংস্কারমূলক রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন। এই রিপোর্টকে আর্ল কমিটির রিপোর্ট বলা হয়।

আর্ল কমিটির রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার

এ. আর্ল স্কোয়ার আই সি এস-এর পক্ষ হইতে বাংলা সরকারের সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারী সমীপে ঃ

জনাব, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই যে, সরকার ২৮৭৮ নং টি জি, ও ২৮৮০ নং টি জি, তাং ১০ই অক্টোবর ১৯০৭ ইং, এই বিধিমতে একটি নির্দেশ জারি করিয়াছেন। ইহাতে বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত ও সুধী মুসলমানদের একটি সম্মেলন

www.waytojannah.com

আহবান ও আলিয়া মাদ্রাসায় টাইটেল ক্লাস চালু করা হইবে কিনা এই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

২) এই সম্মেলনে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়রা তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন। শুধু কলিকাতার মুসলমানরা যাহাতে এই সম্মেলনে প্রাধান্য অর্জন না করে এইজন্য বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল ও আসাম হইতেও সমান সংখ্যক প্রতিনিধি আহবান করা হয়।

৩) সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন ১৯০৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে কতগুলি ছোটখাট সমস্যা আলোচনা করা হয় এবং তিনটি সাব কমিটি গঠন করা হয়। প্রথম কমিটির বিবেচনার বিষয় ছিল মাদ্রাসার টাইটেল ক্লাস পত্তন, শিক্ষা বিষয়ের পুনর্বিন্যাস ও ইংরেজি শিক্ষা এবং এই সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী বিবেচনা করা। দ্বিতীয় কমিটির বিষয় ছিল মকতব শিক্ষার উন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিবেচনা করা। তৃতীয় কমিটির দায়িত্বে ছিল বাংলাদেশে উর্দুর ভবিষ্যৎ কিভাবে নিরূপন করা যায়। এই তিনটি কমিটি নিজেদের রিপোর্ট ১৯০৮ সালের মার্চে জমা দেন। অতঃপর ১৯০৮ সালের ২২শে এপ্রিল সম্মেলনের পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং রিপোর্টের আলোকে সমুদয় বিষয় সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়।

৪) ১৯০৬ সালে আমি যখন জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করি, মাদ্রাসায় টাইটেল ক্লাস পত্তন ও সংস্কার সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ স্কীম পেশ করার জন্য আমি মাদ্রাসার প্রিন্সিপালকে বলিয়াছিলাম। প্রিন্সিপাল এই বৎসরের এপ্রিল মাসে একটি স্কীম পেশ করেন। আমি এই স্কীম লইয়া সুধী সমাজ ও গণ্যমান্য মুসলমানদের সাথে মত বিনিময় করি। এই সম্পর্কে মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটির বক্তব্য পাইতে অনেক দেরি হয়। ইতিমধ্যে প্রিন্সিপাল মিঃ রাস ছুটি নিয়া চলিয়া যান আর আমি নানা ব্যস্ততার মাঝে এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি নাই।

৫) এই সময় লেঃ গভর্নর একটি বিষয়ের উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, মাদ্রাসার ছাত্ররা লেখাপড়ার পর যেটুকু যোগ্যতা এবং পাণ্ডিত্য অর্জন করে সেই অনুপাতে তাহাদিগকে খুব বেশি একটা মর্যাদা দেওয়া যায় কি? সরকার সরকারী চাকুরীর ব্যাপারে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর অগ্রাধিকার প্রদান করেন। অথচ ইংরেজি বাদে মাদ্রাসার ছাত্ররা অন্য কোন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীদের চাইতে কম নয়। এখন মাদ্রাসার ছাত্রদের সরকারী চাকুরীতে কিভাবে বহাল করা যায় তাহাই চিন্তার বিষয়। জনশিক্ষা বিধানের ধারা অনুযায়ী ইংরেজি ভাষা মাদ্রাসার বাধ্যতামূলক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। ঐচ্ছিকভাবে কলিকাতা ও

www.waytojannah.com

হুগলী মাদ্রাসার ছাত্ররা যেটুকু ইংরেজি অধ্যয়ন করে উহার মানও তেমন উন্নত নয়। এজন্যে মাদ্রাসার শিক্ষা বিষয়ে ইংরেজি শিক্ষার মান বৃদ্ধি করিতে হইবে যদ্বারা মাদ্রাসার ছাত্ররা সরকারী চাকুরী লাভে সমর্থ হয়।

৬) আমি সম্মেলনে এব্যাপারেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি যে, বর্তমানে বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহে যেসব পাঠ্য বিষয় চালু আছে তাহা কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাহ্যত দেখা যায়, যদি টাইটেল ক্লাসের পত্তন করিয়া মাদ্রাসায় ইংরেজি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহলে বর্তমানে পাঠ্য বিষয়ের উপর উহা খুবই প্রভাব বিস্তার করিবে। এই পাঠ্য বিষয়ের সংস্কারের প্রশ্নও উত্থাপিত হইয়াছিল ১৯০৩ সালে, কিছুটা সংশোধন করাও হইয়াছিল। ইতিহাস ভূগোলকে বিষয়ভুক্ত করিয়া হাদীস তাফসীরের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। অতএব এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি সম্মেলনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতে চাই যে, বর্তমানে যদি আরবী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখিতে হয় তাহা হইলে এর চাইতে বেশি সংশোধন বা সংস্কার সম্ভব নয়। স্কুলের বিষয়াদি যদি মাদ্রাসায় চাপাইয়া দেওয়া হয় তা হলে আরবী শিক্ষার উদ্দেশ্য নস্যাত হইয়া যাইবে। আরবী শিক্ষাকে যদি যথার্থ সুপরিকল্পিতভাবে পড়ানো হয় তবে আমি নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি এই শিক্ষাও একটি উৎকৃষ্টমানের শিক্ষায় পরিণত হইবে। এই কথার পাশাপাশি আমি ইহাও বলিতে চাই যে, মাদ্রাসায় ইংরেজি বিষয়াদি প্রবর্তনের প্রয়োজন রহিয়াছে।

৭) যদি টাইটেল ক্লাস সরকার অনুমোদন করেন তবে আরবী শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। ইহা সত্য যে, এই সংশোধন সম্পর্কিত প্রস্তাবাবলীর সাথে মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের কোন সম্পর্ক নাই। কেননা ইহা একটি হাইস্কুলের পর্যায়ে চলিতেছে এবং এই সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের উন্নয়ন পরিকল্পনাধীনে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

৮) জুনিয়র ক্লাসের শিক্ষা বিষয় ঃ অদ্যাবধি জুনিয়র ক্লাসসমূহের বিষয়সূচী ও শিক্ষা পদ্ধতি আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয় নাই। এই ক্লাসসমূহের শিক্ষা বিষয় ও পদ্ধতির পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব প্রিন্সিপালের উপর ন্যস্ত ছিল। শিক্ষা বিভাগের নিয়ম-কানুন ও ধারাসমূহ অবলোকন করিয়া জানা যায় যে, উহাতে শুধু সিনিয়র ক্লাসগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে।

মাদ্রাসার আরবী বিভাগের ক্লাসসমূহের বিন্যাস সাব কমিটিকে পেশ করা হইয়াছে এবং এই শ্রেণী বিন্যাসকে সামনে রাখিয়া টাইটেল ক্লাস সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে।

www.waytojannah.com

সাব কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী শুধু আলিয়া মাদ্রাসায় টাইটেল ক্লাস চালু করা হইবে। বাংলাদেশের অন্যান্য মাদ্রাসার (হুগলীসহ) জুনিয়র এবং সিনিয়র ক্লাসসমূহ পূর্বে যেমন ছিল তেমনই বলবত থাকিবে।

৯) উক্ত কনফারেন্সে এক ধরনের প্রগতিমনা লোক ছিলেন। তাহারা মাদ্রাসাকে সম্পূর্ণ আধুনিকীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহাদের ইচ্ছা, মাদ্রাসায় বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজি রাখিতে হইবে এবং পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে যেন মাদ্রাসার ছাত্ররা নির্বিঘ্নে স্কুলে গিয়া ভর্তি হইতে পারে। অর্থাৎ তাহাদের ইচ্ছা হইল একটা বিশেষ মান অবধি মাদ্রাসায় দুই ধরনের শিক্ষা চালু করিতে হইবে। এক বিভাগে ইংরেজি এবং আরবী ও অন্য বিভাগে শুধু আরবী শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের এই মনোবাসনা নিম্নলিখিত কারণে অনুমোদন করা হইল না।

ক) আরবী শিক্ষার বর্তমান মান ঠিক রাখিতে হইবে।

খ) মাদ্রাসার আরবী বিভাগে ইংরেজি পুরাপুরিভাবে প্রবর্তন করা সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে, এই সম্মেলনে সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব সম্পন্ন এক ধরনের লোক ছিলেন। তাহাদের ইচ্ছা আরবী শিক্ষা শুধু যেমন আছে তেমনই থাকিবে তাহা নহে বরং আরবীর মানকে আরো উন্নত করিতে হইবে। তাহাদের মতে মাদ্রাসায় যৎসামান্য ইংরেজি পড়ানো যাইতে পারে কিন্তু কোনক্রমেই ইংরেজি বাধ্যতামূলক করা চলিবে না।

১০) এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য হইল শেষোক্ত মধ্যপন্থীদের স্বপক্ষে। কেননা, এই দল সরকারী মতের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। সরকার হাদীস ও তাফসীর শিক্ষাকে অনুমোদন করিয়াছেন যদ্দারা আরবী শিক্ষা যথার্থভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে। কিন্তু প্রগতিবাদীরা হয়ত সেকথা ভুলিয়া বসিয়াছেন। হাদীস-তাফসীরের উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্যই ছাত্ররা যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব অঞ্চল অবধি গিয়া থাকে। ছাত্রদের এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে এখানে হাদীস-তাফসীর পাঠ্যভুক্ত করা হইয়াছে। অতএব মাদ্রাসা শিক্ষায় টাইটেল ক্লাস প্রবর্তন না করিলে আরবী শিক্ষার উদ্দেশ্য যেমন পদে পদে ব্যাহত হইবে তেমনি এই শিক্ষাও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অতএব টাইটেল ক্লাস প্রবর্তনের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অপরিহার্য। শেষাবধি সম্মেলনে প্রগতিবাদী বনাম টাইটেল পন্থীদের মাঝে ভোট নেওয়া হয় এবং প্রগতিবাদীরা ভোটে হারিয়া যান।

১১) শিয়াদের পাঠ্য বিষয় ঃ

শিয়াদের পাঠ্য বিষয় নিয়া আরো দুই-চারটি জরুরী কথা আছে। প্রথমত শিয়া এবং সুন্নীদের জন্য ফেকা ও আকায়েদের নানা ধরনের পাঠ্য-পুস্তক নির্ধারণ করা

www.waytojannah.com

হইয়াছিল। মাদ্রাসা কমিটির কিছু সংখ্যক সদস্য আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছিলেন শিয়া ছাত্রদের জন্য আলাদা পাঠ্য-পুস্তক নির্ধারণ না করায় মাদ্রাসায় শিয়া ছাত্ররা ভর্তি হইতে পারে না। যদিও শিয়া ছাত্রদের সংখ্যা খুবই নগণ্য তবুও শিয়া ছাত্রদের জন্য আলাদা পাঠ্য বিষয় নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

১২) সাব কমিটির মতে, প্রয়োজন বোধে প্রিন্সিপাল নিজেই পাঠ্য বিষয়ের রদবদল করিতে পারিবেন, এমন একটা ক্ষমতা থাকা দরকার। ১৯০৩ সালেও প্রিন্সিপালকে এই ধরনের একটা ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। আমিও এই প্রস্তাবের সমর্থন করি। এই ব্যাপারে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা এবং অধিকার সম্পূর্ণ নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বর্তমানে যে পাঠ্য বিষয়াদি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে বর্তমানের জন্য খুবই সময়োপযোগী এবং উৎকৃষ্ট মানের হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মাঝেমধ্যে কিছুটা রদবদলের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অতএব এই ব্যাপারে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা সীমিত রাখিলে চলিবে না।

১৩) আলিয়া মাদ্রাসার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক একটি আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছিল। আমি এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। কনফারেন্সের আগাগোড়া পর্যালোচনায় মাদ্রাসার সিনিয়র পর্যায়ের ক্লাসগুলিকে কলেজের সমমানের বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে এবং সেই মতে আলোচনা অগ্রসর হইয়াছে। কেননা এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের প্রাণের দাবি, তাহাদিগকে স্কুলের মানের ছাত্র হিসাবে জ্ঞান না করা হয়। সরকার যদি ছাত্রদের এই দাবিটিকে নগণ্য মনে করিয়া উপেক্ষা করেন তবে পরিণাম খারাপ হইতে পারে।

আমরা যখন দেখি সিনিয়র ক্লাসের ছাত্ররা এম. এ বা তৎসমতুল্য ক্লাসের আরবীর চাইতেও কঠিন পুস্তকাদি অধ্যয়ন করে, তখন তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের ছাত্রদের সমতুল্য মনে না করার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। সিনিয়র ক্লাসগুলিতে দর্শন, মনতেক, বালাগাত, আকায়েদ, ফেকা ও অসুলে ফেকার মতো বিষয়াদি পড়ানো হয়। এইগুলি কলেজ ভার্সিটিতেও পড়ানো হয়, তবে পার্থক্য হইল শুধু ভাষার।

১৪) টাইটেলের পাঠ্য বিষয় ঃ

হাদীস প্রথম বর্ষের জন্য ঃ মোকামাতে হারিরি (৬-১০ অধ্যায়), কিতাবুল আগানী (১ম খণ্ড ১ম ভাগ), বানাতে ছায়াদ হামাছা, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসলিম শরীফ (সুন্নীদের জন্য), অসুলে কাফী (শিয়াদের জন্য), বয়জাবী, তাফসীরে ছাফী (শিয়াদের জন্য), ফারায়েজ, আকায়েদে জালালী (সুন্নীদের জন্য), তানজিহুল আম্বিয়া (শিয়াদের জন্য), ছোফরা, শামাচ্ছ বাজেগা ও কাজী মোবারক ইত্যাদি। দ্বিতীয় বর্ষের

www.waytojannah.com

জন্য ঃ আবু দাউদ ও নাসায়ী (সুন্নীদের জন্য), কাশশাফে কামেল (সুন্নী), তাফসীরে অছায়েল শরহে মাকাছেক (সুন্নী), শোরাক (শিয়া)। তৃতীয় বর্ষের জন্য ঃ মুসলিম, বুখারী (সুন্নীদের), এছতেবছার (শিয়া), তাফসীরে তিবরী কামেল সুন্নী, মাজমাউল বয়ান (শিয়া), শরহে মাওয়াফেক (সুন্নী) ও শরহে তাজদীদ 'শিয়া' ইত্যাদি।

টাইটেলের ফেকা, আদব ও হেকমত গ্রুপের জন্যও অনুরূপ পাঠ্য বিষয়াদি রহিয়াছে। শেষোক্ত তিনটি গ্রুপের পাঠ্য বিষয়ও শিয়া ও সুন্নীদের জন্য আলাদা কিতাব রহিয়াছে। টাইটেল ক্লাসের এই সমুদয় পাঠ্য-পুস্তক সম্মেলনের ২২শে এপ্রিল ১৯০৮ তারিখের বৈঠক সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১৫) টাইটেল পাসের ডিগ্রীসমূহ ঃ

টাইটেলের মোট চারটি বিভাগের ডিগ্রীসমূহের নামকরণ নিম্নরূপ ঃ

১) তাজুল মুহাদ্দেসীন ২) তাজুল ফোকাহা ৩) তাজুল ওদাবা ৪) তাজুল হোকামা।

এই ডিগ্রীর নামকরণের ব্যাপারে আমাদের সামান্য মতদ্বৈধতা আছে। প্রিন্সিপাল মিঃ রাস ও মাদ্রাসার হেড মৌলবীর পরামর্শক্রমে প্রত্যেক ডিগ্রীর পূর্বে 'তাজের' পরিবর্তে 'ফখ্‌র্‌' শব্দ বসাইয়া দিতে চাই। যেমন ফখরুল মোহাদ্দেসীন।

১৬) ১৯০৩ সালে সরকার জানাইয়াছিলেন যে, যে সব মুসলমান ছাত্র ইংরেজি পড়িতে ইচ্ছুক তাহাদেরকে এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে ভর্তি হওয়া উচিত। কেননা আরবী বিভাগে ইংরেজির প্রাধান্য খুবই কম। কিন্তু এখন যেহেতু আরবী বিভাগের ছাত্রদেরকেও ইংরেজী শিখিতে হইবে এইজন্য আমি একটি প্রস্তাব পেশ করিতে চাই যে, যাহাতে ছাত্ররা স্বচ্ছন্দে ইংরেজি শিখিতে পারে এবং আরবীরও কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে।

কনফারেন্সে মত বিনিময়ের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, মাদ্রাসার সিনিয়র ক্লাসগুলির পড়া সম্পন্ন হইবার পর দুই বছরের জন্য ছাত্রদেরকে একটি বিশেষ ইংরেজি কোর্স পড়াইতে হইবে। ইংরেজি শিক্ষার জন্য এই বিশেষ দুই বৎসরের ক্লাসটি শুধু যে কেবল আলিয়া মাদ্রাসায় থাকিবে তাহা নহে বরং হুগলী মাদ্রাসাসহ কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল মাদ্রাসায় প্রবর্তন করিতে হইবে তবে পূর্বাহ্নে বোর্ড অব একজামিনেশন এই ব্যাপারে নিশ্চিত হইবেন যে, অন্যান্য মাদ্রাসায়ও কলিকাতা মাদ্রাসার সমমানে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হয় কিনা। ইহার পর দ্বিতীয় আরেকটি প্রস্তাব হইল, জুনিয়র তৃতীয় শ্রেণী হইতে উপরের ক্লাসগুলিতে ফারসীকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ধার্য করিতে হইবে।

১৭) একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল যে, যেসব ছাত্ররা টাইটেল কোর্সের (তিন বৎসর) সাথে সাথে ইংরেজির উক্ত দুই বৎসরের বিশেষ কোর্সও সম্পন্ন করিতে চায় তাহাদের জন্য এতটুকু রেয়াত করা যাইতে পারে যে, টাইটেল ও উক্ত ইংরেজি কোর্স সর্বমোট ৪ বৎসরে সে সম্পন্ন করিতে পারিবে। কিন্তু আমার মতে এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, বাস্তবক্ষেত্রে উহা কোন দিন কার্যকরী হইতে পারে না। তবে কোন টাইটেল শিক্ষার্থী যদি সত্যিই ইংরেজির উক্ত কোর্সও সম্পন্ন করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে উভয় কোর্সই আলাদাভাবে পড়িতে হইবে। একই সময়ে উভয় কোর্স নিয়া পড়াশুনা করা ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব নয়।

১৮) এই সম্মেলনে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা সম্পর্কে তুমুল বাকবিতণ্ডা হইয়াছে। সাব কমিটি এই ব্যাপারে ভোট গ্রহণ করে। ফলে এগার ভোটের বিপরীতে চার ভোটে এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। অনুরূপভাবে সাধারণ সভাতেও দশ এবং চৌদ্দ ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। আমার ব্যক্তিগত মত বেশি ভোট দাতাদের পক্ষে রহিয়াছে। আমি একথা সমর্থন করি যে, আরবী ছাত্রদের জন্য ইংরেজি পড়ার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করিতে হইবে, কিন্তু এই ভাষাকে বাধ্যতামূলক হিসাবে চাপাইয়া দেওয়া যায় না। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে ইংরেজিসহ মাদ্রাসা পাস ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কিন্তু সেজন্য মাদ্রাসা শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহত করিয়া দিয়া বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজি পড়িতে হইবে এমন প্রস্তাবও অবান্তর।

১৯) মাদ্রাসা ছাত্রদের ইংরেজি পঠন-পাঠনের মান কি ধরনের হইবে এই ব্যাপারেও সম্মেলনে তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে। সাব কমিটির মতামত ছিল, মাদ্রাসার ইংরেজি শিক্ষার মান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ শ্রেণীর মান অবধি উন্নত হইবে। কিন্তু ড. রাস তাহার এক মন্তব্যে (৩রা মার্চ ১৯০৮) ইহার বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, মাদ্রাসার ইংরেজি শিক্ষার মানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষার মানের তুলনা করার কোন প্রয়োজন নাই। মাদ্রাসায় যে মৌলিক শিক্ষা রহিয়াছে উহার মান খুবই উন্নত ধরনের। এই শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি যথার্থ কালচার্ড হইতে পারে। মাদ্রাসার অনেক ইংরেজি পড়ুয়া ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ ক্লাসের ছাত্রের জ্ঞান ও ধারণার চাইতে বেশি ব্যক্তিত্বশালী।

২০) দুই বৎসর মেয়াদী বিশেষ ইংরেজি কোর্সটি টাইটেলের পূর্ববর্তী ক্লাস বা টাইটেল প্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে আরো একটি প্রস্তাব আনয়ন করা হয় যে, এই দুই মানের ছাত্র ছাড়া নিম্নমানের ছাত্ররা এই বিশেষ কোর্স পড়িতে পারিবে। কিন্তু আমি শেষোক্ত প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করি। কেননা, যেসব ছাত্র জুনিয়র পঞ্চম শ্রেণী (টাইটেলের পূর্ববর্তী শ্রেণী) অতিক্রম করে নাই

www.waytojannah.com

তাহারা এই ক্লাসের ইংরেজি বিষয় কিভাবে আয়ত্ত করিবে? দ্বিতীয়ত এই কোর্সের উদ্দেশ্য হইল যাহারা হায়ার স্টান্ডার্ড পাস করিয়াছে তাহাদের ইংরেজির উচ্চতর শিক্ষার জন্য এই কোর্সের প্রয়োজনীয়তা। অতএব এই বিশেষ দুই শ্রেণীর ছাত্র ছাড়া উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সবাইকে যদি এই কোর্সে শামিল করা হয় তবে এই কোর্সের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

২১) যেসব মাদ্রাসার ছাত্র ইংরেজির প্রতি বেশি মনযোগী তাহাদিগকে বিশেষ বৃত্তি, পুরস্কার, ফ্রিশীপ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সম্পর্কে সম্মেলনের দ্বিতীয় বৈঠকে আলাপ-আলোচনা করা হয়। কিন্তু ড. রাস ও মাদ্রাসার হেড মৌলবী এই ব্যাপারে ফ্রি শীপের ঘোর বিরোধিতা করিয়া বলেন, ইহাতে ছাত্রদের মাঝে গোলযোগের সৃষ্টি হইবে। অতএব আমিও তাহাদের সাথে এই মত পোষণ করি।

আলাপ-আলোচনার পর ইংরেজির ব্যাপারে ছাত্রদেরকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য মাসিক দুই টাকা হিসাবে ছয়টি বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। এই বৃত্তির মেয়াদ থাকিবে এক বছর। জুনিয়র ক্লাসসমূহে যেসব ছাত্র ইংরেজি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিবে তাহাদের জন্য এই বৃত্তি বরাদ্দ থাকিবে। অনুরূপভাবে সিনিয়র ক্লাসগুলির জন্য মাসিক ৪ টাকা হিসাবে আরো দশটি বৃত্তির প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। হুগলী মাদ্রাসায় ইহার অর্ধেক পমিরাণ বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই বৃত্তি বাবদ কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসায় সরকারের সর্বমোট ৯৩৬ টাকা খরচ হইবে।

মাসিক ১৫ টাকা হিসাবে সরকার (নির্দেশনামা নং ২৩৪৫ তাং ২০শে জুলাই ১৯০৪) যে একটি বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন উহা সিনিয়র সর্বোচ্চ শ্রেণীর জন্য দেওয়া হয়। অতঃপর এই ব্যাপারে আরো একটি প্রস্তাব আনয়ন করা হয় যে, এই ধরনের আরো চারটি বৃত্তির বন্দোবস্ত করা হউক। মাদ্রাসার উচ্চতর (সিনিয়র) ক্লাসের পরীক্ষায় যেসব ছাত্র ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ স্থান দখল করিবে তাহাদের জন্য এই বৃত্তি বরাদ্দ থাকিবে। এই বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্ররা টাইটেল ক্লাসে ভর্তি হইবে। এই বৃত্তি বাবদও সরকারের বার্ষিক ১৮০০ টাকা খরচ হইবে।

২২) সম্মেলনে এই বিষয়ের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয় যে, যতদিন না আলিয়া মাদ্রাসা এবং হুগলী মাদ্রাসার শিক্ষকদের মান উন্নত না করা হইবে এবং বেসরকারী মাদ্রাসাসমূহে পর্যাপ্ত সাহায্য প্রদান না করা হইবে ততদিন মাদ্রাসা সম্পর্কে এই সমুদয় পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হইবে না। আমি এই সম্পর্কেও বিশেষ অবগত আছি যে, প্রিন্সিপাল ড. রাস বরাবর জনশিক্ষার ডিরেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন যে, মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন খুবই সামান্য। এই কারণে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া দুর্লভ। গত বছর আমি যখন হুগলী মাদ্রাসা পরিদর্শন

www.waytojannah.com

করি সেখানকার অবস্থা খুবই জড়সড় দেখিতে পাই এবং এই রিপোর্ট কবে কার্যকরী হইবে সেই অপেক্ষা না করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ নূতন শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিশেষ নির্দেশ প্রদান করি।

মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রস্তাবনা আমি (নং ৭৬০ তাং ১০ই অক্টোবর ১৯০৬) সরকারের খেদমতে উপস্থাপন করি তাহার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার যে শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহাতে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসঙ্গকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু এখন আমি প্রস্তাব করিতে চাই যে, মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়টিকে সরকারের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাভুক্ত করা হউক। এই পরিকল্পনায় মাদ্রাসা খাতে যে খরচ বরাদ্দ হইবে উহা সাধারণ হাই স্কুলসমূহের চেয়ে অনেক কম হইবে।

আর্ল রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পদক্ষেপ

১৯০৮ সালের আগস্টে বাংলা সরকারের কাছে আর্ল কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয়। সরকার কমিটির সকল সুপারিশ অনুমোদন করেন। অতঃপর আগস্ট মাসে এই রিপোর্ট জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের খেদমতে পেশ করা হয়। ডিরেক্টরের কাছে প্রেরণের সময় নোট দেওয়া হয় যে, কমিটির সুপারিশকৃত সকল পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন যেন কার্যকরী করা হয়। তবে যেখানে বাড়তি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন দাঁড়াইবে সেখানে সরকারের বাড়তি অর্থ মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত তাহা যেন কার্যকরী করা হয়।

এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসার সকল ক্লাস নূতন পদ্ধতিতে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়। পাঠ্য বিষয়েও সামান্য রদবদল করা হয়। শ্রেণী পুনর্বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত তিনজন নূতন শিক্ষকের পদও সৃষ্টি করিতে হইল।

১) সহকারী মৌলবী গ্রেড S. E. S.

২) সহকারী মৌলবী L. S. E. S.

৩) ভার্ণাকুলার টিচার

কিন্তু কমিটি যে ধরনের শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করিয়াছিল, বেতন ধার্য করার সময় সেই সুপারিশের লক্ষ্য ঠিক রাখা হয় নাই। এই ব্যাপারে যতজন শিক্ষকই নিয়োগ করা হইয়াছে, সকলের বেতনই অপেক্ষাকৃত কম। অতএব এই সব শিক্ষককে প্রচলিত শিক্ষা রীতির ধারা অনুসরণ করিয়া চলিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। ১৯০৯-১০ সালে কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসায় আর্ল কমিটির মতে নূতন শিক্ষানীতি ও পাঠ্য বিষয় চালু করা হয়। পূর্বে মাদ্রাসায় সর্বমোট ৮টি ক্লাস ছিল। আর্ল কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী এখন হইতে সর্বমোট ১১টি ক্লাস করা হইল (ছয়টি জুনিয়র ও পাঁচটি

www.waytojannah.com

সিনিয়র)। সিনিয়র ক্লাসের সর্বোচ্চ আরো তিনটি ক্লাস টাইটেলের জন্য প্রবর্তন করা হয়। টাইটেল ক্লাস পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের সমমানের। অতএব টাইটেল ক্লাসসহ মাদ্রাসায় সর্বমোট ক্লাস চৌদ্দটি হইল।

টাইটেল ক্লাসের হাদীস ও তাফসীর বিভাগের উদ্বোধন করা হয় ১৯০৯ সালে।

আর্ল কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী জুনিয়র তৃতীয় মান অবধি ফারসীকে বাধ্যতামূলক এবং উপরস্থ ক্লাসের যেসব ছাত্র ইংরেজিসহ আরবী পড়িতেছে তাহাদের জন্য ফারসীকে ঐচ্ছিক করা হয়। ফারসী ভাষা সম্পর্কে আর্ল কমিটির এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে সুদূর প্রসারী এবং বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ ইতিপূর্বে মাদ্রাসা শিক্ষায় ফারসীর প্রাধান্যই সর্বাধিক বেশি ছিল। ফারসী না জানিলে কোন লোকই সমাজে সম্মানের দাবিদার হইতে পারিতেন না। কিন্তু এই নূতন পরিবর্তনের প্রভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা হইতে ক্রমান্বয়ে ফারসী বিদায় নিতে শুরু করে।

এতকাল পূর্ববাংলা এবং আসাম আলাদা বিভাগ ছিল এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা কলিকাতা মাদ্রাসারই অনুরূপ ছিল। কিন্তু আর্ল কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী যখন এখানকার মাদ্রাসাসমূহে পরিবর্তনের প্রশ্ন আসিল, এখানকার লোকরা ইহার ঘোর বিরোধিতা করিতে লাগিল। আর্ল কমিটির স্কীম সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং এখানকার জন্য অনুপযোগী বলিয়া তাহারা মন্তব্য করিল। প্রকৃতপক্ষে এই বিরোধিতা আর্ল কনফারেন্সেই উত্থাপন করা হইয়াছিল। এই কনফারেন্সে 'রক্ষণশীল' ও প্রগতিশীল এই দুই দলের লোক অংশগ্রহণ করিয়াছিল। কনফারেন্সেই মাদ্রাসা শিক্ষার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন নিয়া তুমুল বাক-বিতণ্ডা হইয়াছিল। এই উভয় দলই নিজেদের মতামতের উপর দৃঢ় সংকল্প থাকে এবং অতঃপর তাহারা পূর্ববাংলা এবং আসামে নিজেদের মতামত সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য সচেষ্ট হন। বলা বাহুল্য, চরম প্রগতিপন্থী সদস্যরাই এই দুই প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল। তাহারা আর্ল কমিটির এই সামান্যতম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন মোটেই আমল দিলেন না। তাহাদের মতে মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। মাদ্রাসায় পর্যাপ্তভাবে ইংরেজি প্রবর্তন করিতে হইবে। তবে এই সঙ্গে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষাও থাকিবে। এই চরমপন্থী প্রগতিবাদীরা আর্ল কমিটিকে নিজেদের আয়ত্তে আনিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ফলে তাহারা জেদের বশবর্তী হইয়া মনস্থ করে যে, তাহারা পূর্ব বাংলা এবং আসাম প্রদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালাই করিবেন। মোট কথা, আর্ল কমিটির রিপোর্ট সম্পূর্ণভাবে তাহারা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাহাদের এই বিকল্প পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য তাহারা ঢাকাতে আরেকটি পাল্টা কনফারেন্স আহ্বান করেন।

www.waytojannah.com

এই কনফারেন্সে আর্ল রিপোর্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা হয় এবং এই সব ধারা সংশোধনের উপর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। এই কনফারেন্সে বিষয়টির উপর প্রচুর আলোচনা হয় এবং শেষাবধি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, পূর্ব বাংলা এবং আসাম প্রদেশে আর্ল রিপোর্ট কোনক্রমেই কার্যকরী হইতে পারে না। কনফারেন্স শেষাবধি যে একটি খসড়া প্রস্তাব তৈয়ার করে পূর্ব বাংলা এবং আসামের শিক্ষা প্রধান মিঃ সার্টের খেদমতে উহা পেশ করা হয়। মিঃ সার্ট এই রিপোর্ট পড়িয়া মন্তব্য করিলেন যে, আমি এই দুই প্রদেশের এই রিপোর্ট কার্যকরীর জন্য নির্দেশ দিতে পারি না। কেননা রিপোর্টে এমন কতগুলো বিষয় ও ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহা এখানকার শিক্ষা পরিবেশে সফলকাম হইবে না। তবে এই স্কীম পরীক্ষামূলকভাবে কোন সরকারী মাদ্রাসায় প্রবর্তন করা যাইতে পারে। এখানে যদি এই স্কীম যথার্থভাবে ফলবতী হয় তবে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য মাদ্রাসায়ও উহা চালু করা হইবে।

মিঃ সার্টের এই ধরনের অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট মন্তব্য শুনিয়া এ ব্যাপারে গড়িমসি করিতে লাগিল এবং শেষাবধি উহা এক রকম ব্যর্থ হইয়া গেল।

মিঃ সার্টের পর মিঃ নাথন শিক্ষা প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নূতন অফিসারের সামনেও এই স্কীমটি পুনরায় উত্থাপন করা হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনিও এই স্কীমটিকে সাফল্যজনক মনে করিলেন না। পরন্তু তিনি মন্তব্য করিলেন, আমার মতে এতদসংক্রান্ত পাঠ্য বিষয়গুলিকে কিছুটা হালকা ও সহজবোধ্য করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে এমন একটি সুষ্ঠু পাঠ্য বিষয় প্রণয়ন করিতে হইবে যাহা একই সঙ্গে সারা বাংলাদেশের মাদ্রাসায় প্রবর্তন করা যায়। পরীক্ষামূলকভাবে দুই-একটি মাদ্রাসায় এই স্কীমকে চালু করার ব্যাপারে তিনি বিরোধিতা করেন। অতএব এই ব্যাপারে আরো একটি কনফারেন্স আহবানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই কনফারেন্সে মিঃ নাথনের মন্তব্য এবং প্রস্তাবের অনুকূলে আলোচনা করা হইবে। অতঃপর ১৯২২ সালে পুনরায় আবার একটি কনফারেন্স আহবান করা হয়। এই কনফারেন্সে ১৯১০ সালের সমুদয় প্রস্তাব ও স্কীম উপস্থাপন করা হয়।

এই কনফারেন্সে মিঃ নাথনের মন্তব্য অনুযায়ী মাদ্রাসার শিক্ষা বিষয়কে অপেক্ষাকৃত হালকা এবং সহজবোধ্য করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর এই প্রস্তাব সরকারের সামনে পেশ করা হয়। ১৯১২ সালে পুনরায় যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলা এবং আসামের আর কোন আলাদা অস্তিত্ব রইল না। অতঃপর সংশোধনী প্রস্তাব আর একবার চাপা পড়িয়া যায়।

www.waytojannah.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এই সময় ভারত সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্তনের প্রস্তাব মঞ্জুর করেন (নির্দেশ নং ৮১১ তাং ৪ঠা এপ্রিল ১৯১২)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বিভাগের পাশাপাশি 'ইসলামিয়াত' বিভাগও খুলিবার প্রস্তাব আনয়ন করা হয়। ভারত সরকারের নির্দেশক্রমে বাংলা সরকার (নং ৫৬৭ তাং ২৭শে মে ১৯১২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্তনের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি গঠনের পর বিশ্ববিদ্যালয় পত্তনের ব্যাপারে কলিকাতায় ঘন ঘন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং কমিটির আপ্রাণ চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ স্কীম তৈরি হয় এবং কালক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়াত বিভাগ

প্রথমত ইসলামিয়াত বিভাগ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও কাঠামো স্থির করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় ঃ

১) মি. নাথন

২) অনারেবল সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী

৩) মি. ডব্লু, এ. জে. আর্ক বুল্ড

৪) মি. মোহাম্মদ আলী

৫) শামছুল ওলামা আবু নসর ওয়াহিদ

৬) নওয়াব স্যার খাজা সলিমুল্লা বাহাদুর

৭) শামছুল ওলামা মৌঃ শিবলী নোমানী, লক্ষ্ণৌ

৮) মওলানা শাহ সৈয়দ সোলায়মান ফুলওয়ারী, পাটনা

৯) শামছুল ওলামা কামাল উদ্দীন আহমদ এম, এ, সুপাঃ, চট্টগ্রাম মাদ্রাসা।

১০) মৌলভী মোহাম্মদ এরফান এম. এ. অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ।

১১) মৌলভী মোহাম্মদ মুসা বি. এ. সুপাঃ, হুগলী মাদ্রাস।

১২) মৌলভী ফেদা আলী খান এম. এ. অধ্যাপক, চট্টগ্রাম কলেজ।

এই কমিটি পত্তনের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয় ঃ

"গত কয়েক বৎসর যাবত পূর্ব বাংলার এবং পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের মধ্যে মাদ্রাসার বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা বিষয়ের উপর অসন্তোষ পরিলক্ষিত হয়। লোকদের ধারণা মাদ্রাসার বর্তমান শিক্ষা বিষয় জ্ঞানার্জনের জন্য যেমন অপ্রতুল তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থাও খুবই প্রাচীন। অতএব এইসব প্রতিষ্ঠান হইতে যে সব ছাত্র লেখাপড়া শিখিয়া

www.waytojannah.com

বাহির হয় তাহারা সমাজের আগাছা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সাধারণ লোকদের ইচ্ছা, মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করিয়া ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজির উপর জোর দিতে হইবে। এই পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রশ্নে গত ১ শতাব্দী যাবত বহু রকম চেষ্টা চরিত্র চালানো হইয়াছে এবং এই শিক্ষার বহু উত্থান-পতন ও ভাঙ্গাগড়া গত হইয়াছে। ১৯০৯-১০ সালে ঢাকাতে আর্ল রিপোর্টের বিরুদ্ধে যে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় উহার সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং শিক্ষা প্রধান মি. নাথন। দীর্ঘ আলোচনা ও বাক-বিতণ্ডার পর ঢাকা কনফারেন্স নতুন ধরনের পাঠ্য বিষয় সুপারিশ করে। এই পাঠ্য বিষয়ের বিশেষত্ব হইল, জুনিয়র ক্লাসগুলিতে স্কুল সাদৃশ পাঠ্য-পুস্তক প্রবর্তন করা। জুনিয়র এবং সিনিয়র উভয় পর্যায়েই ইংরেজির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল এবং সর্বোচ্চ ক্লাসগুলিতে ইসলামী বিষয়াদির সর্বোচ্চ পাঠ্য-পুস্তক রাখা হইয়াছিল। এই নতুন পাঠ্য বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন ছিল এমন সময় অবিভক্ত বাংলার কথা ঘোষণা করা হয় এবং এই প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া যায়।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়াত বিভাগের জন্য যে কমিটি গঠন করা হইয়াছে উপরোক্ত সকল বিষয় তাহাদের গোচরীভূত করা হইয়াছে। এই কমিটি ভারত সরকারের ইচ্ছানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়াত বিভাগের কাঠামো গঠন করিবে। বিষয়টি খুবই জটিল এবং সময়োপযোগী। তবে সৌভাগ্যক্রমে আমরা মওলানা শিবলী নোমানী ও সৈয়দ সোলায়মান নদভীর মতো গুণী লোকদের পাইয়াছি। তাঁহাদের মূল্যবান উপদেশ আমাদের জন্য বিশেষ উপকারী হইবে। এই কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামিয়াত' বিভাগ পত্তনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য মনে করেন। এই বিভাগে আরবী ভাষা ও সাহিত্য ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়াদির সহিত সমমানের ইংরেজিও থাকিবে।

১৯০৯-১০ সালে ঢাকা কনফারেন্স যে প্রস্তাবাদি গ্রহণ করে উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মোটেই উপযোগী নহে। অতএব এই জন্য একটি আলাদা পাঠ্য বিষয়ের খসড়া রচনা করা হয় এবং এই খসড়া পর্যালোচনা ও সংশোধনের জন্য নওয়াব ইমদাদুল মুল্‌ক্ সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী সি. আই. এস-সি. আই. ই সাহেবের খেদমতে পেশ করা হয়।

মাদ্রাসার জন্য আরেকটি স্কীম

এই স্কীম অনুযায়ী মাদ্রাসার ক্লাসগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ঢাকা কনফারেন্স যেভাবে শ্রেণী বিন্যাসের সুপারিশ করিয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি তাহা রদ করিয়া মাদ্রাসার জুনিয়র বিভাগের ছয়টি ক্লাস সিনিয়র বিভাগে চারটি ক্লাসের

www.waytojannah.com

সুপারিশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়াত কমিটি জুনিয়র ক্লাসগুলির পাঠ্য বিষয়ের কোন পরিবর্তন করিলেন না। তবে সিনিয়র ক্লাসের পাঠ্য-পুস্তকের উল্লেখযোগ্যভাবে রদবদল করেন।

এই শেষোক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য ১৯১৩ সালে আবার একটি কনফারেন্সের আহবান করা হয়। এই কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন স্যার রবার্ট নাথন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়াত কমিটির সমুদয় সুপারিশ সামান্য সংশোধন পূর্বক গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন ক্লাসের বিষয়াদি নিম্নরূপ প্রবর্তন করা হয়।

জুনিয়র ক্লাসসমূহের জন্য ঃ উর্দু, বাংলা, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরেজি, আরবী, সাহিত্য, ড্রইং, হস্তশিল্প ও ড্রিল ইত্যাদি।

সিনিয়র ক্লাসসমূহের জন্য ঃ আরবী সাহিত্য, ইংরেজি ও অংকের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

মাদ্রাসার এই শেষোক্ত স্কীম সরকারের বিশেষ মনঃপুত হয়। সরকার অবিলম্বে এই স্কীম মঞ্জুর করেন (নং টিজি ৪৫০ তারিখ ৩রা জুলাই, ১৯১৪) এই স্কীম মঞ্জুরির পর সরকার এই ব্যাপারে একটি বিবরণও প্রদান করেন ঃ

"গভর্নর ইন কাউন্সিল এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ আস্থাশীল যে, মুসলিম সুধী মণ্ডলী মাদ্রাসার জন্য যে পাঠ্য ও শ্রেণী বিন্যাসের সুপারিশ করিয়াছেন উহা মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নতির জন্য যথেষ্ট সহায়ক হইবে। হিজ এক্সিলেন্সী অতঃপর এই মর্মে অনুমোদন দান করিয়াছেন যে, কলিকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা ছাড়া এই স্কীম প্রদেশের (বাংলা) সকল মাদ্রাসায় কার্যকরী করা হইবে।

এই নতুন সংস্কার অনুযায়ী যেসব মাদ্রাসা পুরনো রীতির পাঠ্য ও শিক্ষা পদ্ধতি চালু রাখিবে সেসব প্রতিষ্ঠানকে সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত করার জন্য চেষ্টা করা হইবে। যেসব মাদ্রাসা এই নূতন স্কীম যথারীতি তাড়াতাড়ি কার্যকরী করার জন্য আগাইয়া আসিবে সরকারী সাহায্যের ব্যাপারে ঐ মাদ্রাসাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। এই সব মাদ্রাসায় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যোগ্য শিক্ষক মণ্ডলীরও বন্দোবস্ত থাকিতে হইবে।

একদিক হইতে একথা বলা যাইতে পারে যে, এই স্কীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র তৈরির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই স্কীম কোনক্রমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্কশীল নহে। ইহা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষা স্কীম। মাদ্রাসার ছাত্রদের অন্যান্য আপেক্ষিক যোগ্যতা না থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়াত বিভাগে যদি ভর্তি না হইতে পারে সেজন্য এই স্কীম দায়ী

www.waytojannah.com

নহে। কেননা মাদ্রাসায় উত্তীর্ণ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়াত ছাড়া অন্যান্য বিভাগেও ভর্তি হইতে পারে। অতএব শুধু ইসলামিয়াত বিভাগের জন্যই এই নূতন স্কীম নহে।

এই নূতন স্কীমের বিশেষত্ব হইল, ইহাতে ফারসীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হইয়াছে। ফারসীর স্থলে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে পঞ্চাশ বৎসর আগেও ফারসীর প্রাধান্য ছিল খুবই প্রবল। কিন্তু এখানকার চিন্তাশীল মহল এই ব্যাপারে সর্বসম্মত যে, নিম্নস্তরের ক্লাসগুলিতে ছাত্রদের পক্ষে এক সঙ্গে চার-পাঁচটি ভাষা আয়ত্ত করা খুবই কষ্টকর। ফারসী ছাড়া আর বাদবাকি ভাষাগুলি ছাত্রদেরকে না পড়িলে চলে না। যেমন, মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা তাহাদেরকে পড়িতেই হইবে। উর্দু পাক ভারতের একমাত্র প্রভাবশালী এবং ধর্মীয় শিক্ষার বাহন, অতএব এই ভাষাও পড়িতে হয়। ইংরেজি না পড়িলে চাকুরী এবং জীবিকার ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যায় না। অতঃপর ধর্মীয় ভাষা হিসাবে আরবীও মুসলমানদের অপরিহার্য ভাষা। এখন একমাত্র ফারসীই তাহাদের জন্য অপ্রয়োজনীয় ভাষা। অতএব এই স্কীম অনুযায়ী ফারসী ভাষাকে সমূলে বাদ দেওয়া হইল।

এই স্কীম যাহাতে ব্যাপকভাবে কার্যকরী হয় এই জন্য গভর্নর ইন কাউন্সিল মোটা রকমের অর্থও বরাদ্দ করেন। যে সব মাদ্রাসা এই স্কীম যথাযথভাবে কার্যকরী করার জন্য আগাইয়া আসিবে, সেসব প্রতিষ্ঠানের অর্ধেক ব্যয়ভার সরকার বহন করিবেন। ১৯১৫ সালের পয়লা এপ্রিল হইতে এই স্কীম সর্বত্র চালু হয় এবং এভাবে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার একটি যুগান্তকারী শিক্ষা স্কীম প্রবর্তিত হয়।

মোহামেডান এডভাইজারী কমিটি ১৯১৫

বাংলা সরকার ১৯১৪-১৫ সালে মোহামেডান এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। এই কমিটির অপর নাম ছিল হোর্নেল কমিটি। এই কমিটি পত্তনের উদ্দেশ্য ছিল, ভারত সরকার মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কিত কতগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই কমিটি এই পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বিবেচনা করিবে। তাছাড়া অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে সেসব বিষয়ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। এই কমিটির অধীনে সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কেই বেশি আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। তবে মাদ্রাসা সম্পর্কেও যেসব পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, উহা নিম্নরূপ ঃ

১) মোহসীন ফান্ডের অর্থ এ যাবত কয়েকটি বিশেষ সরকারী মাদ্রাসাকে দেওয়া হইত। এখন হইতে এই অর্থ সাধারণভাবে সকল মাদ্রাসায় দেওয়া হউক।

www.waytojannah.com

২) আরবী এবং ফারসীতে পারদর্শী এমন একজন বিশেষজ্ঞ মুসলমান শিক্ষাবিদকে মাদ্রাসাসমূহের দেখাশুনার ভার অর্পণ করা উহক।

(৩) রাজশাহী মাদ্রাসাকে নূতন স্কীমের অধীনে সিনিয়র মাদ্রাসা হিসাবে উন্নীত করা হউক।

৪) নূতন স্কীমের অধীনে যেসব জুনিয়র মাদ্রাসা চালু রহিয়াছে, এইসব প্রতিষ্ঠানে উত্তীর্ণ ছাত্ররা সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার পর অথবা স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর যেন নিজস্ব তহবিল হইতে এই ধরনের কয়েকটি বৃত্তি মঞ্জুর করেন।

সরকার মোহামেডান কমিটির উপরোক্ত পরিকল্পনাদির প্রায় সবই গ্রহণ করিলেন। অতএব এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মাদ্রাসার সমুদয় খরচ নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেন এবং অদ্যাবধি এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার যৌথভাবে মোহসীন ফান্ড ও সরকারী তহবিল হইতে পূরণ করা হইয়াছে। রাজশাহী মাদ্রাসার মানও প্রস্তাব অনুযায়ী উন্নত করা হয় এবং ছাত্রদের জন্য যথারীতি বৃত্তি ও ভাতা মঞ্জুর করা হয়। অবশ্য এই সব মাদ্রাসার পরিদর্শন ও তদারকের জন্য একজন মুসলমান অফিসার নিয়োগ করা হয় নাই।

অতএব এইভাবে ১৯০৩ সালে মাদ্রাসা সম্পর্কিত যে পরিকল্পনাদি উপেক্ষা করা হইয়াছিল ১৯০৫ সাল নাগাদ আসিয়া উহা বাস্তবায়িত হইল। এই নূতন স্কীম অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করার পর সরকারের শিক্ষা বিভাগের সম্পূর্ণ মনোযোগ এইদিকে আকৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় যেসব মাদ্রাসা নূতন স্কীম গ্রহণ করে নাই বরং পুরনো রীতিতেই চলিতেছিল, ঐ সব মাদ্রাসা সরকারের সহযোগিতা ও অর্থানুকূল্য হইতে বঞ্চিত হয়। নূতন শিক্ষা নীতির ধারা হইতে আলাদা থাকিয়া এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হইয়া এই সব পুরনোপন্থী মাদ্রাসাগুলি ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কালক্রমে তাহা না হইয়া বরং মাদ্রাসাগুলি অদ্যাবধি বাঁচিয়া আছে।

সরকারী নোটে বলা হইয়াছিল, যেসব মাদ্রাসা নূতন স্কীম গ্রহণ করিবে, সরকারী সাহায্য মঞ্জুরের বেলায় ঐ সব মাদ্রাসাকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। কিন্তু যেসব মাদ্রাসা এই স্কীম গ্রহণ করিবে না ঐ মাদ্রাসাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা হইবে, এমন কথা কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু কার্যত তাহাই হইয়াছে। সরকারের এই নূতন স্কীম ও সরকারী সাহায্য প্রদানের এই নীতি-নির্ধারণের পর বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহের উপর উহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, নিম্নোক্ত তথ্য হইতেই উহা প্রতীয়মান হইবে।

www.waytojannah.com

নূতন স্কীম প্রবর্তনের পূর্বে প্রদেশে ২১৪টি মাদ্রাসা ছিল। তন্মধ্যে মাত্র এগারটি ছিল সিনিয়র মাদ্রাসা। এই এগারটির মধ্যে চারটি সম্পূর্ণভাবে সরকারী এবং বাকি ছয়টি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ছিল। আর বাদবাকি একটি মাদ্রাসা ছিল সরকারী সাহায্য ছাড়াই চলিত। আর জুনিয়র মাদ্রাসাগুলির মধ্যে মাত্র একটি সরকারী ছিল আর বাকিগুলির মধ্যে ১২৯টি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ছিল। পরে বাকি যে তিনটি থাকে সেগুলির খরচ স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল।

নূতন স্কীম কার্যকরীর হিড়িকের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার আলিয়া মাদ্রাসা ছাড়া বাকি তিনটি মাদ্রাসাতেও এই স্কীম চালু করা হয়। সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ৭টি মাদ্রাসার ৬টি এই স্কীম গ্রহণ করে। অতঃপর যে একটি মাদ্রাসা এই স্কীম গ্রহণ করিতে চাহে নাই সেটি হইল ফুরফুরা মাদ্রাসা (হুগলী জিলাধীন এই মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শাহ সূফী মওলানা আবু বকর সাহেব)। আবু বকর সাহেবই নিজের ব্যক্তিগত আয় হইতে এই খরচ নির্বাহ করিতেন।

এইভাবে যেসব মাদ্রাসা নূতন স্কীম গ্রহণ করিয়াছিল ঐগুলিই সরকারী সাহায্য লাভে সমর্থ হয়। আর যেসব মাদ্রাসা পুরনো রীতি ও পাঠ্য পুস্তককে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে ঐ সব মাদ্রাসা সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া এইসব মাদ্রাসা এত খানি কোণঠাসা হইয়া পড়িল যে, এইসব মাদ্রাসার ছাত্ররা সরকারী বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা দিবার অধিকার হারাইয়া বসিল। ১৯১৫-১৭ সালের মধ্যে এধরনের কোন মাদ্রাসাকেই বোর্ডের আয়ত্তাধীন বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। স্মর্তব্য যে, সন্দ্বীপের আহমদীয়া মাদ্রাসাকে বোর্ডের অধীনস্থ মাদ্রাসাসমূহের তালিকা হইতে এই মর্মে বহিষ্কার করা হয় যে, এই মাদ্রাসা নূতন স্কীমের বিরোধিতা করিয়াছিল। ১৯১৭-২২ সালের পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র চট্টগ্রামের দারুল উলুম ও নোয়াখালীর ইসলামিয়া মাদ্রাসাকে অস্থায়ীভাবে বোর্ডের আওতাভুক্ত করা হয়।

নূতন স্কীম প্রবর্তনের শর্ত আরোপ করিয়া পুরনো পন্থী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উচ্ছেদ করিবারই যেন ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। কিন্তু বোর্ড ও সরকারী সাহায্য বঞ্চিত এইসব মাদ্রাসার সংখ্যা দিন দিন না কমিয়া বরং বাড়িতে লাগিল। ধর্মভীরু ও রক্ষণশীল মানুষের মনে এই নূতন স্কীমের প্রতি আস্থা কমিয়া আসিতে লাগিল। আরবী শিক্ষার নামে ইংরেজি শিক্ষার এই প্রাধান্য জনগণের মনে একটি জগাখিচুড়ি পাকাইয়া বসিল। ক্রমান্বয়ে সকলের মনে পুরনো শিক্ষার প্রতি মমত্ববোধ জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ইংরেজি ও আরবী মিশ্রিত এই নূতন শিক্ষার ফলশ্রুতি হিসাবে ছাত্ররা না পাশ্চাত্য শিক্ষায় স্কুলের ছাত্রদের মতো পারদর্শী হইত, না পূর্বেকার আরবী ছাত্রদের

www.waytojannah.com

মতো ধর্মীয় প্রতিভা লাভ করিতে পারিত। মোটকথা, এই নূতন স্কীমের কল্যাণে ছাত্ররা উভয় ক্ষেত্রেই কাঁচা থাকিয়া যাইত। কিন্তু এরপর ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা সরকারী সাহায্য ও বোর্ডের পরীক্ষার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করিয়া নিজেদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় অর্থ নিয়োগের দ্বারা প্রদেশের নানা স্থানে পুরনো পাঠ্যরীতি অনুযায়ী খারেজী মাদ্রাসার পত্তন করিতে লাগিলেন এবং উত্তরোত্তর এইসব মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। অদ্যাবধি এইসব মাদ্রাসাই পুরনো পাঠ্য বিষয় ও পুরনো শিক্ষা পদ্ধতি নিরন্তর চালু রাখিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই দেশের লোকদের ধর্মের প্রতি কতখানি টান রহিয়াছে।

১৯১৫ সালে মাদ্রাসাসমূহে নতুন স্কীম প্রবর্তিত হইবার পর যে শিক্ষা পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছিল, একমাত্র খাঁটি ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করিবার মতো কলিকাতা ছাড়া আলিয়া মাদ্রাসা তখন অন্য কোন মাদ্রাসা ছিল না। এই সময় সরকার আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্য বিষয়ের সামান্য রদবদল ও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই মাদ্রাসার পাঠ্য বিষয়ের এতখানি উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে যে, এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে আর অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ যেন না হইতে হয়। অতএব এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৯১৫ সালে প্রিন্সিপাল হারলীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। জুলাই মাসে এই কমিটির বৈঠক বসে এবং কিছু রদবদল প্রস্তাবও গৃহীত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন এত ব্যাপক ভিত্তিতে ছিল যে, শেষাবধি তাহা আর কার্যকরী হইতে পারে নাই। অতএব এই পরিবর্তন অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতঃপর অনেক কাল গত হইল এবং ১৯২১ সালে পুনরায় আবার এই পরিবর্তনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এবারকার কমিটির সভাপতিত্ব করেন স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা কে. সি. আই। এই কমিটির সেক্রেটারী পদে নিয়োজিত হন শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর মি. টেলর। এই কমিটির রিপোর্ট নিম্নরূপ ঃ

আলিয়া মাদ্রাসার পত্তনের কিছুকাল পরই উহার উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাসা পত্তনের কিছুকাল পরই বিভিন্ন কমিটির অধীনে এই শিক্ষা পদ্ধতির সংশোধন বা পরিবর্তনের ধারা চলিতে থাকে। কাল পরম্পরায় সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি নিয়োজিত করেন এবং তাহারা মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতির পরিবর্তন ও সংশোধন করেন। এইসব কমিটি সব সময় চেষ্টা করিয়াছে যে, মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতিকে এমন ছাঁচে ঢালাই করিতে হইবে যাহা জনগণের জন্য বিশেষ ফলদায়ক হইবে। কিন্তু এত পরিবর্তন ও সংস্কারের তুফান কাটাইয়াও এই শিক্ষাকে সম্পূর্ণ মনমতো করিয়া গঠন করা যায় নাই। অন্তত মুসলমান শিক্ষাবিদ ও সুধী মণ্ডলীর ইহাই ধারণা।

www.waytojannah.com

Contents

সংশোধন বা সংস্কার সম্পর্কিত সর্বশেষ কমিটি গঠন হয় ১৯১৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি। এই কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার (জুলাই মাসে) পর মাদ্রাসার প্রিন্সিপালকে একটি সংশোধিত পাঠ্যতালিকার খসড়া প্রদান করা হয়। প্রিন্সিপাল উক্ত তালিকা যথা নিয়মে সরকারের খেদমতে পেশ করেন।

বাংলা সরকার অত্যন্ত পরিতাপের সহিত একথা জানাইতেছেন যে, বহু চেষ্টা-চরিত্র এবং অক্লান্ত সাধনার পরও মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যাহত হইয়াছে। তাই সরকার এই ব্যাপারে আরো একটি কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই কমিটি মাদ্রাসার আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী ও অনুপযোগী বিষয়াদির তদন্ত করিবে। বাংলা সরকারের ইচ্ছা ছিল, এই কমিটি এমনভাবে গঠিত হইবে যে, এই কমিটি ইসলামী শিক্ষা সংরক্ষণের সমুদয় বিষয়াদির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। এই কমিটিতে এমন সব ব্যক্তির সমাবেশ হইবে যাহারা মাদ্রাসার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকেফহাল এবং যুগ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে যাহাদের সচেতনতা অত্যন্ত বেশি। অতএব সরকার এই কমিটি গঠনের ব্যাপারে উপরোক্ত উদ্দেশ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন যাহাতে কমিটির রিপোর্ট সম্পূর্ণরূপে হৃদয়গ্রাহী ও প্রামাণ্য রূপে গৃহীত হয়।

কমিটির আলোচ্য বিষয়াদি

১) মাদ্রাসার সাধারণ ব্যবস্থাপনা। ২) আরবী বিভাগের প্রচলিত শিক্ষা বিষয়। ৩) মাদ্রাসার আরবী বিভাগের শিক্ষক মন্ডলীর যোগ্যতা, দায়িত্ব এবং শিক্ষকদের সংখ্যা। ৪) আরবী বিভাগের ছাত্রদের ভর্তির জন্য যোগ্যতার মান ও ভর্তির বয়স। ৫) পরীক্ষা এবং বৃত্তি ইত্যাদি।

কমিটির সদস্যবৃন্দ

১) অনারেবল নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা কে. সি. আই এ, (সভাপতি)

২) অনারেবল নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর সি. আই. এ

৩) অনারেবল খান বাহাদুর মৌঃ আমিনুল ইসলাম, ইন্সপেক্টর জেনারেল রেজিস্ট্রেশন

৪) মি. এ. এইচ. হার্লি, প্রিন্সিপাল, আলিয়া মাদ্রাসা

৫) মওলানা মোঃ মাজেদ আলী, হেড মৌলবী, আলিয়া মাদ্রাসা

www.waytojannah.com

৬) মওলানা শফিউল্লাহ, আলিয়া মাদ্রাসা

৭) শামসুল ওলামা মওলানা মীর মোহাম্মদ, আলিয়া মাদ্রাসা

৮) শামসুল ওলামা মওলানা হেদায়েত হোসেন, হুগলী মাদ্রাসা

৯) শামসুল ওলামা মওলানা হাফিজুল্লাহ, ঢাকা মাদ্রাসা

১০) মৌলবী মোহাম্মদ মুসা, সুপাঃ, হুগলী মাদ্রাসা

১১) মৌলবী মোহাম্মদ ইসহাক, হেড মৌলবী, ঢাকা মাদ্রাসা

১২) মির্জা আবু জাফর, সহকারী ইন্সপেক্টর অব স্কুল্‌স, মুসলিম এডুকেশন, কলিকাতা

১৩) মৌলবী মোহাম্মদ, ঢাকা মাদ্রাসা

১৪) মৌ. এ, কে, ফজলুল হক, কলিকাতা, বেসরকারী সদস্য

১৫) খান বাহাদুর মির্জা শুজাত আলী বেগ, শিয়া প্রতিনিধি, কলিকাতা

১৬) শামসুল ওলামা মওলানা বেলায়েত হোসেন, কলিকাতা

১৭) মোতাওয়াল্লী, হুগলী ইমামবাড়া

১৮) মৌলবী আব্দুল হাদি, অধ্যাপক, সিটি কলেজ, কলিকাতা

১৯) মৌলবী সৈয়দ আঃ বারী লেকচারার, মেদিনীপুর কলেজ

২০) মৌঃ হাফেজ নজির আহমদ, সেক্রেটারী আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম, কলিকাতা

২১) মৌঃ হাফেজ আঃ রাজ্জাক, হাম্মাদিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা

২২) মৌঃ আবু তাহের, অধ্যাপক, সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ

২৩) মিঃ জে. এ. টেলর, সহকারী ডিরেক্টর, মুসলিম এডুকেশন সেক্রেটারী

এই কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৬ সালের ১৫ই এপ্রিল। অতঃপর ৬ই জুলাই দ্বিতীয় বৈঠক বসে। এই বৈঠকে দুইটি সাব কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। একটি কমিটি মাদ্রাসার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও অপর কমিটি মাদ্রাসার শিক্ষার পাঠ্য বিষয়াদি সম্পর্কে রিপোর্ট তৈয়ার করিবে। অতঃপর দুই সাব কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটিদ্বয় যথা সময়ে তাঁহাদের নিজ নিজ রিপোর্ট মূল কমিটির কাছে পেশ করেন।

এই কমিটির সভাপতি স্যার সৈয়দ শামসুর হুদা অসুস্থতা বশত এই কমিটির কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাহার বদলে পালাক্রমে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও শামসুল ওলামা হেদায়েত হোসেন সাহেব কার্য সম্পাদন করিয়াছেন।

www.waytojannah.com

এই কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট ১৯২৫ সালের ২৩শে নভেম্বর জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের খেদমতে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। কমিটির রিপোর্টের তর্জমা নিম্নরূপ ঃ

"সরকার ৪৫০ নং রেজুলেশন টি জি (তাং ৩১ শে জুলাই ১৯১৪) অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করিয়াছেন। মাদ্রাসাকে টিকাইয়া রাখিতে হইবে, এই সম্পর্কে সরকারের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১. এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, একটি জাতি (সম্প্রদায়) হিসাবে মুসলমানরা এমন সব শিক্ষাবিদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যাহারা সত্যিকারভাবে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে ব্যুৎপন্ন। মুসলমানদের প্রাণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নর ইন কাউন্সিল এমন একটি সরকারী মাদ্রাসা থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যেখানে বিশেষভাবে ইসলামী শিক্ষা দেওয়া হইবে। এখানে ইংরেজি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে থাকিবে অথবা ইংরেজি থাকিবেই না, এই ব্যাপারে মুসলমানদের মতামত আহবান করা হইলে আলিয়া মাদ্রাসা, কলিকাতার নামই সকলে উল্লেখ করেন। অতএব এজন্য অদ্য একটি আলাদা স্থায়ী স্কীম তৈয়ার করা হইতেছে। আশা করা যাইতেছে যে, এই নূতন পরিকল্পনাধীনে আলিয়া মাদ্রাসার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার হইবে এবং মহাকালের বুকে চিরদিন এই প্রতিষ্ঠান নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়া বাঁচিয়া থাকিবে।

২. সরকারের উদ্দেশ্য হইল, আলিয়া মাদ্রাসায় এমন সব ছাত্রদের জন্য শিক্ষা চালু থাকিবে, যাহারা প্রকৃত অর্থে পরবর্তীকালে ধর্মযাজক বা ধর্মীয় নেতা হইবে। কিন্তু কমিটি এ ব্যাপারে মনোভাব পোষণ করেন যে, যেসব ছাত্র এখানকার শিক্ষা সমাপনের পর ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে পরিচয় লাভ করিতে চায় তাহাদের জন্যও সুযোগ-সুবিধা থাকিতে হইবে।

৩. এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কমিটি মাদ্রাসার আভ্যন্তরীণ শৃংখলা এবং শিক্ষার কাঠামো সংক্রান্ত কতগুলি জরুরী পরিবর্তন সাধনের সুপারিশ করিয়াছে। এই পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে যদি কার্যকরী করা হয় তাহলে আলিয়া মাদ্রাসা ইসলামী ভাষা ও প্রাচ্য বিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রথম সারিতে স্থান পাইবে। এই প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনমাফিক ইংরেজি রাখা হইয়াছে। বর্তমানে আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা তৎপরতা পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত।

১) আরবী বিভাগ
২) এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ
৩) উডবার্ন মিডল ইংলিশ স্কুল
৪) মুসলিম ইন্সটিটিউট
৫) বেকার ও ইলিয়ট হোস্টেল

www.waytojannah.com

কমিটি প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে আলাদাভাবে পর্যালোচনা করে এবং রিপোর্ট তৈরি করে।

আরবী বিভাগ ঃ

এই বিভাগের ব্যর্থতার মূলে নিম্নলিখিত কারণগুলি বিশেষভাবে কার্যকরী

ক) সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠ্য বিষয়ের ত্রুটির জন্য।

খ) ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক রামপুর, দেওবন্দ বা দারুল নোদওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত নিবিড় ও আন্তরিকতাপূর্ণ নহে।

গ) বই-পুস্তক রচনা ও গবেষণার ব্যাপারে ছাত্রদের উৎসাহিত করা হয় না।

ঘ) মাদ্রাসার প্রশাসন ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে।

ঙ) মাদ্রাসার অধিক সংখ্যক ছাত্র পূর্ব বাংলার অধিকাসী কিন্তু মাদ্রাসার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কোন বাঙালি নিয়োগ করা হয় নাই।

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দুইটি সাব কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কিন্তু পরে এই দুইটি কমিটির কাজের সুবিধার জন্য তাহারা কমিটিতে আরো সদস্য তালিকাভুক্ত করিতে পারিবেন বলিয়া একটি ধারা প্রবর্তন করেন। এই ধারা অনুযায়ী যে সিলেবাস কমিটি করা হইয়াছিল উহাতে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন ঃ শেষোক্ত পাঁচজনকে নূতন সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

১) শামসুল উলেমা মওলানা বেলায়েত হোসেন

২) মওলানা মাজেদ আলী

৩) মওলানা মোঃ মোবারক করিম

৪) হাফেজ আবদুর রাজ্জাক

৫) মৌলবী মোঃ হায়দার

৬) মওলানা মোঃ ইসহাক

৭) খান বাহাদুর মোঃ মুসা, সেক্রেটারী

৮) মি. এ এইচ হার্লি

৯) শামসুল উলেমা মীর মোহাম্মদ

১০) হালিম সৈয়দ মোহাম্মদ বশির

১১) মৌঃ সাইদুল হাসান, বি. এ.

১২) মওলানা মোঃ মোজহার

সিলেবাস সাব কমিটি যথা সময়ে মূল কমিটির কাছে তাহাদের রিপোর্ট পেশ করে। আর মূল কমিটি নানা পর্যালোচনা ও বাদানুবাদের পর তাহাদের প্রস্তাব মঞ্জুর

www.waytojannah.com

করেন এবং মন্তব্য করেন যে, এই মোতাবেক জুলাই মাস (১৯২৩) হইতে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে। এই কমিটি প্রস্তাব পেশ করে যে, জুনিয়র এবং সিনিয়র প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার মাধ্যম উর্দু থাকিবে এবং বাদবাকী উচ্চতর ক্লাসগুলির আরবী সাহিত্য আরবী ভাষার মাধ্যমে পড়াইতে হইবে।

১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন আলিয়া মাদ্রাসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই কমিটি উক্ত সুপারিশ কার্যে পরিণত করিবার জন্য খুবই সচেষ্ট ছিলেন। তাহাদের মতে, ইহাতে ছাত্ররা সহজেই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বৈষয়িক ব্যাপারে অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্নিবেশিত হওয়ার পূর্বে মাদ্রাসার ইংরেজি শিক্ষায় উৎকর্ষ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিতে হইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী উপস্থাপন করেন ঃ

ক) মাদ্রাসায় যেসব ছাত্র ইংরেজিকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে জুনিয়র চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়িবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিক মানের ইংরেজি সাহিত্যের বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে এবং ইহার বিনিময়ে অংশগ্রহণকারী ছাত্রকে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে যে, সে শুধু ইংরেজি বিষয়ে ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে।

খ) এসব ইংরেজি সনদপ্রাপ্ত ছাত্ররা যখন টাইটেল ক্লাসে উঠিবে, টাইটেল ১ম বর্ষের সময় আই. এ. ও টাইটেল দ্বিতীয় বর্ষের সময় বি. এ পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকেও অনুরূপভাবে শুধু ইংরেজিতে আই. এ ও বি. এ-র সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে।

গ) ইংরেজিতে বি. এ পাস করার পর ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী, ফারসী অথবা ইংরেজিতে এম. এ ক্লাসের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে এবং বি. এল. ক্লাসে ভর্তিরও সুযোগ দিতে হইবে।

মাদ্রাসার যেসব ছাত্র শুধু ইংরেজি পরীক্ষা দিয়া বি. এ, এম. এ পাস করার সুযোগ লাভ করিবে তাহাদের মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদের সমতুল্য জ্ঞান করিতে হইবে বলিয়া কমিটি তাহাদের সুপারিশে বলেন। সরকারী চাকুরীর বেলায়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মতো তাহাদের সমান অধিকার থাকিবে। বিশেষত আরবী বা ফারসী অধ্যাপক নিয়োগের বেলায় তাহাদের প্রাধান্য দিতে হইবে।

www.waytojannah.com

পরীক্ষাসমূহ

এই সময় পর্যন্ত মাদ্রাসার পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব ছিল বোর্ড অব একজামিনেশন্স-এর উপর। বোর্ডের রেজিস্ট্রার ছিলেন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এবং সহকারী রেজিস্ট্রারের পদে ছিলেন মাদ্রাসার হেড মৌলবী। এই পরীক্ষা সম্পর্কে কমিটির মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ

১) আগামী হইতে সেন্ট্রাল বোর্ড অব একজামিনেশন্স্-এর কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্ন লিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হইবে ঃ

ক) এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন,
মোহামেডান এজুকেশন, সভাপতি

খ) প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন সিনিয়র অধ্যাপক, সদস্য

গ) দুইজন বেসরকারী প্রতিনিধি। সভাপতি তাহাদের নির্বাচন করিবেন।

ঘ) প্রিন্সিপাল, আলিয়া মাদ্রাসা, রেজিস্ট্রার।

ঙ) ভাইস প্রিন্সিপাল, আলিয়া মাদ্রাসা, সহকারী রেজিস্ট্রার

চ) একজন মুসলমান স্কুল ইন্সপেক্টর।

এই বোর্ডের অধীনে মাদ্রাসার তিনটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। যথা ঃ সিনিয়র দ্বিতীয় বর্ষ শেষে, সিনিয়র চতুর্থ বর্ষ শেষে ও টাইটেল দ্বিতীয় বর্ষ শেষে।

২) উত্তীর্ণ ছাত্রদের পাসের হার শতকরা ৬০, ৪৫ ও ৩৬ থাকিবে এবং পাসের মান ১ম, ২য় ও ৩য় বিভাগ হিসাবে চিহ্নিত হইবে।

৩) যেসব ছাত্র প্রথম পরীক্ষায় পাস করিবে তাহাদেরকে আলিম, দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণকে ফাজিল এবং টাইটেল পাস করিলে তাহারা বিষয় ভিত্তিতে মোমতাজুল মুহাদ্দেসীন, মোমতাজুল ফোকাহা ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হইবেন।

৪) যেসব ছাত্র এই কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে চায় নির্দিষ্ট ক্লাসে তাহাদের বৎসরের হাজিরার সংখ্যা শতকরা ৭০ দিন হইতে হইবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এই শর্ত শিথিল করা যাইবে।

৫) যাহারা টাইটেল পরীক্ষা দিতে চায় তাহাদিগকে পূর্ববর্তী সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। যাহারা ওদিকে আলিম পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক কোন অনুমোদিত মাদ্রাসায় তাহাদিগকে এক বছর পড়িতে হইবে।

৬) বিশেষ ক্ষেত্রে ছাত্ররা বোর্ডে প্রাইভেটভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে, তবে টাইটেল বা ফাজিল পরীক্ষা দিতে হইলে পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় পরীক্ষার পর নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রান্ত হইতে হইবে।

www.waytojannah.com

৭) টাইটেল ক্লাসের ছাত্র যদি এক বিভাগের পর অন্য বিভাগেও পরীক্ষা দিতে চায় তবে মাত্র এক বছরের শিক্ষা মেয়াদে পরীক্ষা দিতে পারিবে।

৮) টাইটেল এবং ফাজেল ক্লাসের আরবী সাহিত্যের প্রশ্নপত্র আরবীতে থাকিবে এবং পরীক্ষার খাতায়ও আরবীতে জবাব লিখিতে হইবে।

৯) বাধ্যতামূলক বিষয়াদি পাস করিলেই পরীক্ষার্থীকে পাসের সার্টিফিকেট দেওয়া যাইতে পারে। তবে কোন ছাত্র যদি কোন ঐচ্ছিক বাড়তি বিষয়েও পরীক্ষা দিতে চায় সার্টিফিকেটে সে বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে।

শিক্ষক মণ্ডলী

উপরোক্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসার শিক্ষক মণ্ডলীরও রদবদল অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। কমিটির মতে, মাদ্রাসার সিনিয়র অধ্যাপক হিসাবে এমন একজন লোক থাকিবেন যিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন। এ ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন কোন লোক ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের সমমানের বেতন ছাড়া পাওয়া যাইবে না। এজন্য মাদ্রাসার শিক্ষক মণ্ডলীর মান প্রথম শ্রেণীর ইংরেজি কলেজগুলির সমতুল্য করিতে হইবে। অতএব মাদ্রাসার জন্য প্রিন্সিপাল এবং ভাইস প্রিন্সিপাল ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের লোক হইতে নিয়োগ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য কর্মরত শিক্ষককে প্রফেসর, লেকচারার ও টিউটর হিসাবে আখ্যায়িত করিতে হইবে (যেমন সংস্কৃত কলেজে প্রচলিত আছে)।

আলিয়া মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বলিয়া সরকার মন্তব্য করিয়াছেন। এজন্য কমিটি এই মর্মে সুপারিশ করিয়াছেন যে, মাদ্রাসার পরিচালনা কার্যে ইউরোপীয় প্রিন্সিপালের বদলে একজন মুসলমান শিক্ষাবিদকে নিয়োজিত করিতে হইবে। ভবিষ্যতে প্রিন্সিপাল নিয়োগের প্রশ্ন উঠিলেই মুসলমান প্রিন্সিপাল নিয়োগ করিতে হইবে। মাদ্রাসার অন্যান্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কমিটি নিম্নরূপ সুপারিশ করিয়াছেন ঃ

ক) মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে যোগ্য বাঙালি ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

খ) আরবী, ফারসী এবং উর্দু শিক্ষা দিবার জন্য এমন অধ্যাপক নিয়োগ করিতে হইবে যাহাদের মাতৃভাষা আরবী, ফারসী এবং উর্দু।

গ) বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাবিদকে আমন্ত্রণ জানাইয়া বিভিন্ন মূল্যবান বিষয়ের উপর বক্তৃতার আয়োজন করিতে হইবে এবং ইহার বিনিময়ে তাহাদিগকে সম্মানযোগ্য নজরানা দিতে হইবে।

ঘ) একজন অধ্যাপক একই বিষয়ে বিভিন্ন ক্লাসে শিক্ষাদান করিবেন। একই অধ্যাপককে একাধিক ভাষা বা বিষয়ের জন্য নিয়োগ করা চলিবে না। যিনি সাহিত্যে

www.waytojannah.com

পারদর্শী তিনি শুধু সাহিত্যই পড়াইবেন, অনুরূপভাবে যিনি দর্শনে অভিজ্ঞ তিনি শুধু দর্শন পড়াইবেন। শিয়া ছাত্রদেরকে আকৃষ্ট করিবার জন্য মাদ্রাসায় একজন শিয়া শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে।

কমিটি এই ব্যাপারে খুবই সচেতন যে, এই সব প্রস্তাবনা একই সময়ে মাদ্রাসায় কার্যকরী করা সম্ভব নয়। তবুও সময় এবং সুযোগ মতো এইসব নতুন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা যাইবে, কমিটির এ-ই ইচ্ছা।

মাদ্রাসার গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য কমিটি একটি সংশোধিত বৃত্তি তালিকা পেশ করেন এবং বলেন, যেহেতু মাদ্রাসার সকল বৃত্তি বা ভাতা এ যাবত মোহসীন তহবিল হইতে দেওয়া হইতেছে। এই নতুন তালিকার সমুদয় বৃত্তি যদি মোহসীন ফান্ড দিতে অপারগ হয় তাহা হইলে বাদবাকি টাকা সরকার দিবেন।

ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বর্তমানে চার টাকা হারে দশটি এবং দুই টাকা হারে ছয়টি বৃত্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু কমিটি মনে করেন বর্তমানের খরচ পত্রের মান যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে সেই অনুপাতে কোন বৃত্তিই পাঁচ টাকার নিচে না হওয়া উচিত। বর্তমান শিক্ষাসূচী অনুযায়ী সর্বমোট ৮টি ক্লাসে ইংরেজি পড়ানো হয়। অতএব বৃত্তির সংখ্যা এখন ষোলটি। কিন্তু কমিটি এই বৃত্তি ২০টিতে উন্নীত করার সুপারিশ করেন।

কমিটি আরো একটি সুপারিশ করেন যে, ৫০ টাকা হারে ৫টি রিসার্চ স্কলারশীপ প্রবর্তন করা উচিত। ছাত্ররা মাদ্রাসার উচ্চতর ক্লাস পাস করার পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগারে বিভিন্ন বিষয় গবেষণা করিবার জন্য বিদ্যোৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু ছাত্রদের জন্য এই বৃত্তি বরাদ্দ থাকিবে। এই সব রিসার্চ স্কলারদের গবেষণালব্ধ পাণ্ডুলিপি প্রকাশনারও বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ম্যানেজিং সাব কমিটি

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে মাদ্রাসার জন্য একটি ম্যানেজিং সাব কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়।

১) অনারেবল খান বাহাদুর আমিনুল ইসলাম
২) খান বাহাদুর মির্জা সুজাআত আলী বেগ
৩) শামসুল ওলামা মওলানা বেলায়েত হোসেন,
৪) মৌলবী মির্জা আবু জাফর এম. এ. সেক্রেটারী
৫) মওলবী হাফেজ নজির আহমদ
৬) মওলবী সৈয়দ আবদুল বারী
৭) মৌলবী মোহাম্মদ

www.waytojannah.com

Contents

সরকারের সকল কলেজ গভর্নিং বডির অধীনে পরিচালিত হয়। কিন্তু মাদ্রাসার জন্য এই ধরনের কোন গভর্নিং বডি নাই। এজন্য কমিটি মাদ্রাসার আরবী বিভাগের জন্য একটি গভর্নিং বডির সুপারিশ করিয়া কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন।

১) সহকারী ডিরেক্টর, মোহামেডান এডুকেশন, বেঙ্গল, সভাপতি

২) প্রিন্সিপাল, আলিয়া মাদ্রাসা, সেক্রেটারী

৩) শিক্ষক মণ্ডলীর পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি - সদস্য

৪) শিক্ষা বিভাগের একজন অফিসার।

৫) তিনজন বেসরকারী সদস্য। তন্মধ্যে একজন ছাত্রদের গার্জিয়ান।

৬) একজন শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।

২. পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মাদ্রাসার ছাত্র এবং শিক্ষকদের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য পরিলক্ষিত হয় নাই। এই জন্য কমিটি প্রস্তাব করেন যে, ইলিয়ট হোস্টেলে ছাত্র এবং শিক্ষকদেরকে একত্রে থাকিবার জন্য অচিরেই বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে ছাত্র এবং শিক্ষকদের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে। ছাত্র এবং শিক্ষকদের নিকট হইতে এজন্য নামমাত্র ভাড়া নেওয়া হইবে।

৩. মাদ্রাসায় এখন হইতে রবিবারের বদলে শুক্রবারে সাপ্তাহিক ছুটি থাকিবে। মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে টুপিসহ ইসলামী পোশাক পরিধান করিতে হইবে।

৪. মাদ্রাসার পাঠাগার মুসলিম ইন্সটিটিউট ভবনে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। গরীব ছাত্রদের জন্য লাইব্রেরী হইতে পুস্তকাদি বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে। আরবী ও ফারসীর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ক্রয় ও সংগ্রহের জন্য বিশেষ পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করিতে হইবে।

৫. প্রতি শিক্ষা বৎসরান্তে মাদ্রাসার পাঠ্য বিষয়ের রদবদলের প্রয়োজন বিধায় গভর্নিং বডিকে অধিকার প্রদান করিতে হইবে যে, এই কমিটি বিশেষজ্ঞদের সহিত সলাপরামর্শ করিয়া পাঠ্য-পুস্তকের রদবদল করিবেন এবং নূতন বই প্রবর্তন করিবেন।

এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ

এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের সর্বশেষ স্বরূপ এই দাঁড়াইয়াছে যে, ইহা একটি সাধারণ হাইস্কুলের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। কলিকাতা মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার

www.waytojannah.com

সমতুল্য এই স্কুলের শিক্ষার মান। এই স্কুলের নিয়ম-কানুন অন্যান্য হাইস্কুলের মতো প্রায় একই ধরনের। এই স্কুলের ব্যাপারে কমিটির প্রস্তাবাদি ও সুপারিশ নিম্নরূপ ঃ

১. একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, এ্যাংলো পার্সিয়ান স্কুলের জন্য যতটুকু স্থানের দরকার, মাদ্রাসা ভবনের নির্দিষ্ট এলাকায় সে পরিমাণ জায়গা নাই। এত বড় একটি স্কুলের জন্য এতটুকু স্থান যথেষ্ট নয়। ইতিপূর্বেও এ ব্যাপারে প্রস্তাব আনয়ন করা হইয়াছিল যে, মোহামেডান কলেজের জন্য ওয়েলেসলী স্ট্রীট-এ যে একটু জায়গা নেওয়া হইয়াছে সেখানে এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের জন্য একটি আলাদা ভবন নির্মাণ করা হউক। কমিটি বাংলার মুসলমানদের জন্য অচিরেই একটি কলেজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অতএব কমিটি এ ব্যাপারে নিম্ন বর্ণিত সুপারিশ করেন ঃ

ক) সরকার যেন মুসলমানদের জন্য অনতিবিলম্বে একটি ফার্স্ট ক্লাস কলেজ পত্তনের জন্য ওয়েলেসলী স্ট্রীটের জায়গাটুকুর উপর একটি ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং এই নূতন কলেজের জন্য একটি কার্যনির্বাহক কমিটিরও পত্তন করা হয়। মুসলমানদের জনশিক্ষার সহকারী ডিরেক্টর এই কমিটির প্রধান হিসাবে নিয়োজিত হইবেন।

খ) এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও স্থান সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বিভাগের একটি আলাদা ভবন নির্মার্ণের জন্য মাদ্রাসার কাছাকাছিই এক খণ্ড জমি সংগ্রহ করা হউক। এই ভবনে ছাত্রদের হোস্টেল এবং হেড মাস্টারের আবাসের বন্দোবস্ত থাকিবে।

এই বিভাগের স্টাফ

ক) এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের সুনাম এবং যশ অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। কেননা, ইহা বাংলাদেশের মুসলমানদের একটি নির্ভরযোগ্য এবং উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অতএব এই প্রতিষ্ঠানের হেড মাস্টার পদের জন্য ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস হইতে একজনকে নিয়োগ করিতে হইবে।

খ) এই প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্রই যেহেতু মুসলমান, এজন্য ইহার প্রতিজন শিক্ষককে পাকা মুসলমান এবং ধর্মভীরু হইতে হইবে। ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্ন আসিলেই এসব গুণের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাছাড়াও এই বিভাগের জন্য এমন একজন শিয়া ও একজন সুন্নী শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে যাহারা ছাত্রদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবেন।

গ) ছাত্রদের ব্যায়াম ও ড্রিল ইত্যাদির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। বয়স্কাউট দল সৃষ্টির ব্যাপারে চেষ্টা করিতে হইবে।

ঘ) এই বিভাগের ছাত্রদেরকে একই ধরনের ইসলামী পোশাক পরিধান করিতে হইবে।

www.waytojannah.com

ঙ) এ্যাংলো বিভাগকে যখন নতুন ভবনে স্থানান্তরিত করা হইবে (যেখানে ছাত্রদের জন্য হোস্টেলও থাকিবে), ইলিয়ট হোস্টেলকে মাদ্রাসার আরবী বিভাগের জুনিয়র এবং সিনিয়র ক্লাসের ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে।

চ) শেষ সুপারিশ এই যে, নূতনভাবে স্থানান্তর করার পর কোন ক্লাসকে দ্বিধা বিভক্ত করার প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে হইবে এবং এজন্য বাড়তি শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন হইলেও করিতে হইবে।

হোস্টেলদ্বয়

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মাদ্রাসার সহিত দুইটি হোস্টেল সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ইলিয়ট হোস্টেল ও বেকার হোস্টেল নামে এই দুইটি ছাত্রাবাসের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু কলিকাতা নগরীর আটজন বিজ্ঞ ও প্রভাবশালী মুসলমান এই ছাত্রাবাস দুইটির পরিদর্শক হিসাবে নিয়োজিত। হোস্টেলের ছাত্রদের দেখাশুনা ও তদারকের জন্য প্রত্যেক হোস্টেলে একজন সুপারিনটেনডেন্ট ও একজন সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োজিত আছেন। কমিটি হোস্টেলের উন্নতিকল্পে কতিপয় সুপারিশ করেন ঃ

ক) ইলিয়ট ও বেকার হোস্টেল দুইটিকে একটি শক্তিশালী ম্যানেজিং কমিটির অধীনে ন্যস্ত করিতে হইবে। মোহামেডান এডুকেশনের সহকারী ডিরেক্টর এই কমিটির সভাপতি থাকিবেন। এই কমিটির সেক্রেটারীর পদে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বহাল থাকিবেন। সদস্যদের মধ্যে হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্টদ্বয় এবং ছাত্রদের চারজন গার্জিয়ান থাকিবেন।

খ) ছাত্রদের খাদ্য ব্যবস্থা বর্তমানে যেভাবে চালু আছে তাহা বাতিল করিয়া সরকারের পক্ষ হইতে একজন সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োগ করিয়া তাহার অধীনে একটি মেস চালু করিতে হইবে। ইনি হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্টের নির্দেশ ও আজ্ঞাবহ হিসেবে কাজ করিবেন। সকল ছাত্রের জন্য সমমানের খাদ্য পরিবেশন করিতে হইবে। মেসের থালা-বাসন ইত্যাদি খরিদ করিবার জন্য সরকার এককালীন কিছু অর্থ প্রদান করিবেন।

গ) উভয় হোস্টেলের ছাত্রদের জন্য টুপি পরিধান একান্ত অপরিহার্য।

২) এই কমিটি মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে মসজিদের জন্য শামছুল উলামা আতাউর রহমান (মরহুম) অর্থ দান করিয়াছেন এবং অনুরূপভাবে রেঙ্গুনের স্যার এ. কে. জামালও প্রায় ৩৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই সমুদয় দানের অর্থ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব নহে। কেননা, মসজিদ নির্মাণের কাজে ১ লক্ষ টাকার প্রয়োজন রহিয়াছে। বাংলাদেশের সাধারণ লোকদের অবস্থা এতখানি সচ্ছল নহে যে, চাঁদা সংগ্রহের দ্বারা বাকি টাকা পূরণ করা যায়। অতএব এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি

www.waytojannah.com

আকর্ষণ করিয়া কমিটি জানান যে, মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে সরকারই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া এমন একটি প্রশস্ত মসজিদ নির্মাণ করিবেন যেখানে উভয় হোস্টেলের ছাত্ররা একত্রে নামায আদায় করিতে পারে।

৩) ছাত্রদের জন্য ফজর এবং এশার নামায জামাতসহ আদায় করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪) ইলিয়ট হোস্টেলের বর্তমান বাবুর্চিখানা মাদ্রাসার আওতার বাইরে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

মুসলিম ইন্সটিটিউট

মুসলিম ইন্সটিটিউট পত্তনের প্রধান কারণ ছিল ঃ

ক) মুসলমান নবীন যুবকদের পারস্পরিক মেলামেশার পথ সুগম করা।

খ) নৈতিক, সাহিত্যিক এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

গ) বিদেশী পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তকাদি আনয়ন করিয়া ছাত্রদের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাধারণ প্রজ্ঞাশক্তির উৎকর্ষ সাধন করা।

ঘ) দৈহিক এবং মানসিক বুদ্ধি বিকাশের জন্য উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

প্রাথমিক পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি শক্তিশালী কমিটির অধীনে ছিল এবং বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করিয়াছিল। সব সময় এখানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হইত। কলিকাতার মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক এই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সবিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইয়া এখানকার নবীন পরিবেশের সহিত একাত্ম হইবার জন্য সবাই আগ্রহ পোষণ করিত। কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবত এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি লোকদের মনোযোগ যেন কমিয়া আসিয়াছে। কমিটি মনে করেন যতদিন মুসলিম ইন্সটিটিউট মাদ্রাসা ভবনে থাকিবে, কোন মতেই প্রতিষ্ঠানটির আসল উদ্দেশ্য কার্যকরী হইবে না। কলিকাতার প্রতিটি কলেজ হইতে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য সদস্য সংগ্রহ করিতে হইবে। শহরের গণ্যমান্য মুসলমানদেরকেও সদস্য পদভুক্ত করার সুযোগ দিতে হইবে। এই সম্পর্কে কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাব আনয়ন করেন ঃ

১) অচিরেই ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের মতো মুসলিম ইন্সটিটিউটের জন্যও একটি ভবন নির্মাণ করিতে হইবে। যদি সরকার আপাতত এ ধরনের কোন ভবন নির্মাণ করিতে অপারগ হন তবে সাময়িকভাবে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ চালাইবার জন্য মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের কোয়ার্টার ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং ইহার বিনিময়ে প্রিন্সিপালের জন্য একটি বিশেষ ভাতা প্রদান করিতে হইবে।

২) ইন্সটিটিউটের চারিদিকে মাদ্রাসার যেসব নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী বসবাস করে তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে।

www.waytojannah.com

রিপোর্ট ও সরকারী পদক্ষেপ

এই বক্ষ্যমাণ শামসুল হুদা কমিটির রিপোর্ট জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর (চিঠি নং ১০৩৬ তাং ২৩শে নভেম্বর ১৯২৫) সরকারের খেদমতে পেশ করেন। সরকার প্রায় দেড় বৎসর যাবত এই রিপোর্ট সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা ও চিন্তা-ভাবনা করেন। এই রিপোর্ট কার্যকরী করার প্রথম পদক্ষেপেই সরকার এক নির্দেশে (নং ৩৮৫৯ তাং ২৯শে আগস্ট ১৯২৭) মাদ্রাসার কতিপয় নতুন পদের সৃষ্টি করেন ঃ

		বেতন
১)	আরবীর জন্য একজন অতিরিক্ত সহকারী শিক্ষক	৭৫-২০০ প্রতিমাসে
২)	আধুনিক আরবীর জন্য লেকচারার	১৫০-৪০০ প্রতিমাসে
৩)	ইংলিশ শিক্ষককে লেকচারার পদে উন্নীত	১৫০-৪০০ প্রতিমাসে
৪)	ইংলিশ টিচার	৫০-১২০ প্রতিমাসে

৫) সুপারিশকৃত সকল বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। ইহার বার্ষিক আনুমানিক ব্যয় ২৪৯৬ টাকা। এই সমুদয় খাতে সর্বমোট নতুন খরচ বাৎসরিক ৯০২২ টাকা।

এই রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারের দ্বিতীয় পদক্ষেপ একটি সুদূরপ্রসারী নির্দেশ বিশেষ। সরকারের পরবর্তী নির্দেশ নং ২৩২ EDN (তাং ২০শে জানুয়ারী ১৯২৮) নিম্নরূপ ঃ

জে এইচ ল্যাণ্ডসে এম, এ, আই, এস, সি, সেক্রেটারী বাংলা সরকারের পক্ষ হইতে বাংলার জনশিক্ষা বিভাগ প্রধানের নামে প্রদত্ত ঃ

অনারেবল নওয়াব মোশাররফ হোসাইন খান বাহাদুর (শিক্ষা উজির) মহোদয়ের আমলে প্রদত্ত সরকারের উক্ত নির্দেশের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

১) বাংলা সরকার শিক্ষা দফতরের সমুদয় প্রস্তাব বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করেন এবং সেই অনুপাতে মাদ্রাসার নূতন শিক্ষক নিয়োগের একটি তালিকা অনুমোদন করেন। এই নূতন পরিকল্পনানুযায়ী সরকারের বাড়তি ৯০২২ টাকা খরচ হইবে।

২) কমিটি প্রদত্ত মাদ্রাসার পাঠ্য বিষয়টি পূর্বেকার পাঠ্য বিষয় তালিকা হইতে উৎকৃষ্ট এবং প্রশংসার দাবিদার। অতএব সরকার পাঠ্য বিষয়ের এই রিপোর্ট সর্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহা অবিলম্বে কার্যকরী করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। রিপোর্টে ইউনানী চিকিৎসা বিষয়টিকে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, সরকার উহা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। কেননা সরকার অনেক চিন্তা-ভাবনার পর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, ইহা প্রবর্তন করা আদৌ সম্ভব নয়।

www.waytojannah.com

সরকার রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী টাইটেল ক্লাসের আদব ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভাগের প্রস্তাবিত পাঠ্য বিষয়ের আশু সংশোধনের নির্দেশ দিয়াছেন এবং এই পাঠ্য-পুস্তক আলিয়া মাদ্রাসায় প্রবর্তন করা হইবে। ইহার বিস্তারিত ব্যবস্থাপনা জনশিক্ষার ডিরেক্টর সম্পন্ন করিবেন। পরন্তু টাইটেল ক্লাসের প্রস্তাবিত ফেকা বিভাগ নূতন স্টাফ নিয়োগের পূর্বে খোলা হইবে না।

৩) সরকার উক্ত সুপারিশ অনুযায়ী মাদ্রাসার জুনিয়র ক্লাসসমূহে এবং সিনিয়র ক্লাসের ১ম দুই বর্ষের শিক্ষার মাধ্যম উর্দু করিবার অনুমোদন করিয়াছেন। বাকি ক্লাসগুলিতে আরবী সাহিত্য আরবী ভাষার মাধ্যামে পড়াইতে হইবে।

৪) সরকার কমিটির প্রস্তাবিত ভাইস প্রিন্সিপাল পদ অনুমোদন করেন নাই। এজন্য বোর্ড অব একজামিনেশন্স-এর সহকারী রেজিস্ট্রারের পদে মাদ্রাসার কোন যোগ্য শিক্ষককে নিয়োগ করিতে হইবে।

সরকার ইহা ছাড়া কমিটির সমূদয় প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। তবে পরীক্ষার প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে পরীক্ষা দিবার বিষয়টিকে বিবেচনা করেন এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবার অনুমতি দেন তবে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুইজন প্রতিনিধিকে মাদ্রাসার একজামিনেশন বোর্ডে গ্রহণ করা হইবে।

৫) পরীক্ষার অন্যান্য রীতি কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী হইবে। তবে পরীক্ষার্থীকে ন্যূনপক্ষে শতকরা প্রতি বিষয়ে ৪০ নম্বর রাখিতে হইবে। সর্বমোট নম্বরের বেলায় শতকরা ৫০ ভাগ নম্বর থাকিতে হইবে। যাহারা শতকরা ৬৬ নম্বর পাইবে তাহারা ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইবে। বাদবাকিরা দ্বিতীয় বিভাগে। তৃতীয় বিভাগে পাস করাইবার কোন ব্যবস্থা থাকিবে না।

৬) মাদ্রাসার সাপ্তাহিক ছুটি কমিটির প্রস্তাবানুযায়ী শুক্রবারে না হইয়া প্রদেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ রবিবারই ছুটি থাকিবে। পোশাকের ব্যাপারেও সরকার কমিটির সুপারিশের প্রশংসা করেন। তবে মাদ্রাসার সকল ছাত্রকে এক বিশেষ ধরনের টুপি পরিধান করিতে হইবে।

৭) লাইব্রেরী সম্পর্কে সকল প্রস্তাব বারান্তরে বিবেচনা করা হইবে। মুসলিম ইন্সটিটিউটের নূতন ভবন নির্মাণের পূর্বে এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়।

৮) মাদ্রাসার পাঠ্য-পুস্তক নির্ধারণ সম্পর্কে বোর্ড অব একজামিনেশন্সকেই সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করা হইবে এবং বিভিন্ন সময়ে মাদ্রাসার সমস্যাদির ব্যাপারে সরকার তাহাদের পরামর্শ দ্বারা চালিত হইবেন।

www.waytojannah.com

Contents

১৯২২ সালের পুরানাপন্থী মাদ্রাসাসমূহ

১) কাঠগড় ইসলামিয়া মাদ্রাসা, সন্দ্বীপ, নোয়াখালী ২) কমিদপুর কাদেরিয়া মাদ্রাসা, রংপুর ৩) দারুল উলূম মাদ্রাসা, ঢাকা ৪) লতিফিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, মীরেশ্বরাই, চট্টগ্রাম ৫) কেরামতিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, নোয়াখালী ৬) ফেনী সিনিয়র মাদ্রাসা, নোয়াখালী ৭) নাজিরিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, কুমিল্লা ৮) মনিরুল ইসলাম সিনিয়র মাদ্রাসা, আজমপুর, চট্টগ্রাম ৯) সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, পাবনা ১০) সীতাকুণ্ড সিনিয়র মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম ১১) দারুল উলূম মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম ১২) ফুরফুরা সিনিয়র মাদ্রাসা, হুগলী ১৩) হাম্মাদিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা ১৪) বশিরিয়া আহমদিয়া মাদ্রাসা, সন্দ্বীপ, নোয়াখালী ১৫) শামসুল উলূম মাদ্রাসা, ঢাকা ১৬) ইসলামিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী ১৭) বসুরহাট ইসলামিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী ১৮) নীলাম বাজার মাদ্রাসা, আসাম ১৯) সাসারাম সিনিয়র মাদ্রাসা আড়া, বিহার।

১৯৩২ সাল নাগাদ নবপ্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহ

১) শর্ষিনা সিনিয়র মাদ্রাসা, বরিশাল ২) ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, ভোলা, বরিশাল ৩) কাতলাসেন সিনিয়র মাদ্রাসা, ময়মনসিংহ ৪) আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা, ঢাকা ৫) রায়পুরা সিনিয়র মাদ্রাসা, নোয়াখালী ৬) কেরামতিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, ভবানীগঞ্জ, নোয়াখালী ৭) ফয়জিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, ত্রিপুরা ৮) শাহতলী সিনিয়র মাদ্রাসা, ত্রিপুরা ৯) দারুল উলূম কুদশিয়া মাদ্রাসা, আকড়া, চব্বিশ পরগনা ১০) আইনুল উলুম মাদ্রাসা, বড়তলা, ২৪ পরগনা ১১) রমজানিয়া মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা ১২) মোহাম্মদিয়া, কামারখন্দ, পাবনা ১৩) চর সেঙ্গাস সিনিয়র মাদ্রাসা, পাবনা ১৪) নুরুল হুদা মাদ্রাসা, কড়াই, বগুড়া ১৫) কদমতলা ইসলামিয়া মাদ্রাসা, বরিশাল ১৬) হাজিপুর ইসলামিয়া মাদ্রাসা, বরিশাল ১৭) টেংরাপাড়া মাখজানুল উলূম মাদ্রাসা, ময়মনসিংহ ১৮) কারিআটা সিনিয়র মাদ্রাসা, ময়মনসিংহ ১৯) ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ময়মনসিংহ ২০) ওসমানিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, চাঁদপুর, ত্রিপুরা ২১) বাগাদি আহমদিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা ২২) কুমরাদী দারুল উলূম মাদ্রাসা, ঢাকা ২৩) ইখওয়ানুস সাফা, ময়মনসিংহ ২৪) কিশোরগঞ্জ ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ময়মনসিংহ ২৫) হামিদিয়া ইসলামিযা মাদ্রাসা, ত্রিপুরা ২৬) শখিপুর দারুল উলূম মাদ্রাসা, ফরিদপুর ২৭) দারুল উলূম সিনিয়র মাদ্রাসা, ময়মনসিংহ ২৮) ফয়জে আম সিনিয়র মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম ২৯) হামিদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, নোয়াখালী ৩০) আলিয়া মাদ্রাসা, কুমিল্লা ৩১) লক্ষ্মিপুর দারুল উলূম মাদ্রাসা, নোয়াখালী ৩২) দক্ষিণ চন্দ্রগঞ্জ ইসলামিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী।

www.waytojannah.com

এই সময় মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ও উত্তীর্ণ ছাত্রদের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

সাল	ক্লাস	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	১ম বিভাগে উত্তীর্ণ	২য় বিভাগে উত্তীর্ণ	৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ
১৯৩০-৩১	টাইটেল	২২৮	৮		
	ফাজেল	২৯৭	৩৩	১২৮	৭৩
	আলেম	৬৪২	২৮	১০৮	১৪৯
১৯৩১-৩২	টাইটেল	৩৫৪	২০		
	ফাজেল	২৮৪	১৫	১৭	১১৭
	আলেম	৬৯৪	১৫	১৫৬	২২৬

এই সময় আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক্লাস	সাল ১৯৩০-৩১	সাল ১৯৩১-৩২
টাইটেল	৫৭	৬৫
সিনিয়র ক্লাসসমূহ	৩৫০	৩৩৭
জুনিয়র ক্লাসসমূহ	১০৬	৮৭

মুসলিম এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি

১৯৩১ সালে বাংলা সরকার মুসলিম এডুকেশন এডভাইজারী কমিটি নামে আরো একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর আবদুল মোমেন সাহেব। এই জন্য এই কমিটিকে মোমেন কমিটি বলা হইত। বাংলাদেশের মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে সরকারী নীতির সহযোগিতা করাই ছিল এই কমিটির উদ্দেশ্য। এই কমিটি দীর্ঘদিন যাবত শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন এবং সরকারের কাছে ১৯৩৪ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

১) পূর্বেকার নূতন স্কীম (রিফর্‌ম) চালু থাকিবে। তবে এই ব্যাপারে কিছু রদবদলের প্রয়োজন রহিয়াছে।

২) নতুন স্কীমভুক্ত মাদ্রাসা ও ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার মাঝে পাঠ্যগত একটি সামঞ্জস্য থাকিতে হইবে। যাহাতে ছাত্ররা ইচ্ছানুযায়ী হাইস্কুল বা উক্ত মাদ্রাসায় পারস্পরিকভাবে ভর্তি হইতে পারে।

www.waytojannah.com

৩) নূতন স্কীমভুক্ত জুনিয়র এবং হাই মাদ্রাসার ইংরেজি, ভার্ণাকুলার এবং অংক ইংরেজি হাই স্কুল বা মাধ্যমিক স্কুলের সমমানের হইতে হইবে।

৪) জুনিয়র মাদ্রাসায় উর্দু ভাষাকে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করা যাইবে না। তবে প্রয়োজন বোধে বাংলার বদলে উর্দুকে ভার্ণাকুলারের মর্যাদা দিতে হইবে।

৫) চতুর্থ শ্রেণী হইতে আরবী বিষয় চালু করিতে হইবে।

৬) মাতৃভাষার মাধ্যমে দীনিয়াত শিক্ষা দিতে হইবে।

৭) ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হইতে দুইজন প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

৮) ইসলামিক গ্রাজুয়েটদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইন্সপেক্টরের পদ প্রদান করিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা মাদ্রাসাগুলিও তদারক করিতে পারেন।

৯) সাময়িকভাবে চট্টগ্রাম কলেজে যে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ খোলা হইয়াছে, উহা স্থায়িভাবে অনুমোদন করা হউক।

১০) হুগলী গভঃ মাদ্রাসাকে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের মান অবধি উন্নীত করা হউক। যাহাতে পশ্চিম বাংলার ছাত্রদের কলেজে পড়ার কোন অসুবিধা না থাকে।

১১) ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট এবং হাই মাদ্রাসাসমূহে সরকারী সাহায্য প্রদানের বেলায় একই নীতি অনুসৃত হইবে।

১২) ঢাকাতে যে বোর্ড গঠন করা হইতেছে উহাতে শতকরা ষাটজন মুসলমান সদস্য থাকিতে হইবে। কেননা বোর্ডের অধীনে মাত্র ষোলটি হাইস্কুল ও তিনটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ আছে।

১৩) বোর্ডের সভাপতি এবং সেক্রেটারী তিন বছরের জন্য মনোনীত হইবেন।

১৪) হুগলী মাদ্রাসাকে বর্তমান ভবন হইতে অন্যত্র স্থানান্তরের ব্যাপারে ঘোর আপত্তি রহিয়াছে। কেননা বর্তমান ভবন মোহসীন ফান্ডের অর্থেই মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পত্তনের জন্য খরিদ করা হইয়াছিল।

১৫) মাদ্রাসাসমূহের ছাত্র বেতন কোনক্রমেই বৃদ্ধি করা চলিবে না।

১৬) টাইটেল ক্লাসের ফেকা বিভাগকে (বর্তমানে অস্থায়ী) স্থায়ী করা হউক।

১৭) টাইটেল ক্লাসের অন্যান্য বিভাগও অচিরেই খোলা হউক। এই ব্যাপারে আর্ল কমিটি ও শামসুল হুদা কমিটিরও জোর সুপারিশ রহিয়াছে।

১৮) আলিয়া মাদ্রাসায় তিব্বিয়া চিকিৎসা ক্লাস খোলার জন্য অচিরেই জরুরী বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

www.waytojannah.com

ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার জন্য সরকারী সাহায্য

ইতিমধ্যে প্রদেশে ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইসব মাদ্রাসা সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত ছিল। এই ব্যাপারে মাদ্রাসার শুভাকাঙ্ক্ষীরা নানাভাবে সরকারী সাহায্য পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সরকার এই ব্যাপারে কোনরূপ কর্ণপাত করেন নই। অবশেষে ১৯৩৭ সালে জনাব এ. কে. ফজলুল হক যুক্ত বাংলার প্রদানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন এবং এই ব্যাপারে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

এ. কে. ফজলুল হকের ভাষণ

১৯৩৯ সালে আলিয়া মাদ্রাসার একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হক সাহেব সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন ঃ

"আমার সরকার ইহা অপছন্দ করেন যে, সরকারী সাহায্য দেওয়ার বেলায় উভয় মাদ্রাসা ব্যবস্থার মধ্যে এই বৈষম্য থাকিবে কেন? আমি বরং চাই, মাদ্রাসা শিক্ষার আরো উৎকর্ষ সাধন করা হউক এবং এই জন্য একটি আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন করা হউক।

জনাব এ. কে. ফজলুল হক তাঁহার ভাষণে আরো জানান যে, তিনি ক্ষমতা হাতে নেওয়ার পর মাদ্রাসা শিক্ষার একটি সঠিক চিত্র ও সমস্যা তুলিয়া ধরিবার জন্য একটি কমিটির রিপোর্ট এখনো তাঁহার হাতে আসিয়া পৌঁছে নাই। বলা বাহুল্য, এই কমিটি ছিল 'মওলা বখ্স কমিটি'।

মোটকথা, এই প্রয়াসের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৩৮-৩৯ সালে এই খাতে ত্রিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং সময়ান্তরে সরকার এই সাহায্য প্রদেশের ওল্ড স্কীম মাদ্রাসাসমূহে প্রদান করিতে থাকে।

মওলা বখ্স কমিটির সদস্যবৃন্দ

১) মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, এম. এল. সি
২) খান বাহাদুর মওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী, এল. এল. সি
৩) মওলবী আবদুর রাজ্জাক, এম. এল. এ
৪) মওলানা শাসুল হুদা এম. এল. এ
৫) মওলানা আবদুল আজিজ এম. এল. এ
৬) মওলবী আমিনুল্লা (খান সাহেব) এম, এল, এ
৭) মওলবী শাহ গোলাম সারোয়ার হোসাইনী এম. এল. এ
৮) মওলবী মোঃ ইব্রাহিম, এম. এল. এ
৯) খান বাহাদুর মওলবী আলফাজুদ্দিন, এম. এল. এ
১০) খান বাহাদুর মওলবী মাহতাবুদ্দিন, এম. এল. এ

১১) মিঃ মোহাম্মদ বরাত আলী এম. এল. এ

১২) মওলবী মোঃ মোজাম্মেল হক এম. এল. এ

১৩) মওলবী দেওয়ান মোস্তফা আলী এম. এল. এ

১৪) আলহাজ ডঃ সানাউল্লাহ এম. এল. এ

১৫) মওলানা মোঃ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এম. এল. এ

১৬) খান বাহাদুর মোঃ মওলা বখ্‌স, সহকারী ডিরেক্টর মোহামেডান এডুকেশন. সভাপতি

১৭) ডঃ মোহাম্মদ জোবায়ের সিদ্দিকী, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্বদ্যিালয়

১৮) খান বাহাদুর মওলবী মোঃ মুসা, এম. এ. প্রিন্সিপাল, আলিয়া মাদ্রাসা, সেক্রেটারী

১৯) মওলবী ফজলুর রহমান বাকী, লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২০) ডঃ এস. এম. হোসেন, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২১) ডঃ সিরাজুল হক, লেকচারার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২২) খান সাহেব মৌলবী জিয়াউল হক, প্রিন্সিপাল, রাজশাহী মাদ্রাসা

২৩) মওলানা মোহাম্মদ মোজহার, লেকচারার, আলিয়া মাদ্রাসা, কলিকাতা

২৪) শামসুল ওলামা মওলানা বেলায়েত হোসেন, হেড মওলানা, আলিয়া মাদ্রাসা, কলিকাতা

২৫) মওলানা আবদুর রহমান কাশগরী, লেকচারার, আলিয়া মাদ্রাসা, কলিকাতা

মওলা বক্স কমিটি সারা দেশের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ প্রশ্নপত্র ছাড়েন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রশ্নাবলীর মূল ধারাগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১) ওল্ড এবং নিউ এই দুই স্কীমের মাদ্রাসাই কি চালু থাকিবে, না উহার যে কোন একটি?

২) ওল্ড স্কীম মাদ্রাসায় ইংরেজিকে ঐচ্ছিক, না কোন বাধ্যতামূলক করা হইবে?

৩) ওল্ড স্কীম মাদ্রাসায় উর্দু ভাষার প্রাধান্য কতটুকু থাকিবে?

৪) ওল্ড স্কীম মাদ্রাসায় বাংলা ভাষা কতটুকু থাকিবে?

৫) হস্তশিল্প ও অন্যান্য কারিগরি বিষয় এই মাদ্রাসায় চালু করা উচিত হইবে কিনা?

৬) মাদ্রাসায় ব্যায়াম শিক্ষা প্রবর্তন করিলে কেমন হয়?

৭) বেসরকারী মাদ্রাসায় টাইটেল ক্লাস খোলার অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন কিনা?

৮) জুনিয়র ক্লাস সমাপনের পর কোন পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?

www.waytojannah.com

৯) ওল্ড স্কীম মাদ্রাসায় বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে উহার সংশোধনের প্রয়োজন আছে কিনা?

১০) ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা বর্তমান কালের সময়োপযোগী কিনা? সময়োপযোগী না হইলে কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে?

১১) আপনি কি এই কথা বিশ্বাস করেন যে, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়ার পর সেকেণ্ডারী স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে?

১২) মাদ্রাসায় চিকিৎসা বিজ্ঞান (তিব্বিয়া) প্রবর্তন করা হইবে, না কোন এই জন্য আলাদা একটি তিব্বিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে?

১৩) বর্তমানে মাদ্রাসার বোর্ড অব একজামিনেশন্স-এ সারা দেশের লোকের সমান প্রতিনিধিত্ব রহিয়াছে কিনা?

১৪) সরকারের প্রাইমারী এ্যাক্ট মাদ্রাসার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে?

১৫) আপনি কি মনে করেন, জুনিয়র মাদ্রাসার পরীক্ষার যাবতীয় পাঠ্য-পুস্তক সরকারকে প্রকাশ করিতে হইবে?

এই প্রশ্নপত্রগুলি প্রদেশের সকল উৎসাহী শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিতদের নামে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষাবধি ১৬৮ জন লোক এসব প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই জবাবে বেশির ভাগ সুপারিশ নিম্নরূপ ছিল ঃ

১) নিউ স্কীম সম্পূর্ণ তুলিয়া দিয়া ওল্ড স্কীম ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, ইহার স্বপক্ষে ৭৮ ভোট ছিল।

২) ওল্ড স্কীম বন্ধ করিয়া নিউ স্কীম চালু রাখিবার স্বপক্ষে ১৫টি ভোট ছিল।

৩) উভয় ব্যবস্থাই চালু রাখিতে হইবে, তবে কিছু সংশোধনের প্রয়োজন রহিয়াছে, ইহার স্বপক্ষে ৭০ ভোট ছিল।

৪) উভয় ব্যবস্থাই তুলিয়া দিয়া নূতন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য মাত্র ৫টি ভোট প্রদান করা হয়।

মওলা বখ্স কমিটির সুপারিশসমূহ কার্যকরী করার সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশকেও সংক্রমিত করে। যাহার ফলে প্রধানমন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হক এক ভাষণে বলেন ঃ

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, কমিটি কতগুলি অত্যন্ত জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে আমার সরকার এইসব পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে অক্ষম।

অতঃপর এইভাবে মওলা বখ্স কমিটির সম্পূর্ণ প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

www.waytojannah.com

মোয়াজ্জেমউদ্দিন কমিটি (১৯৪৬)

অতঃপর শেষাবধি মাদ্রাসা সংস্কার, সংশোধন ও পরিবর্তনের এমন একটি হিড়িক পড়িয়া গেল যে, দুই-এক বৎসর পরই মাদ্রাসার জন্য একটি কমিটি গঠন করা এবং মাদ্রাসার সমস্যা নিয়া সভা ও জল্পনা কল্পনা করা একটি প্রচলিত ধারায় পরিণত হয়। দেশ বিভাগের পর আলিয়া মাদ্রাসাকে ঢাকাতে স্থানান্তরিত করার পূর্বে মাদ্রাসার সংস্কার ও উন্নতিকল্পে সর্বশেষ যে কমিটি প্রবর্তিত হয়, উহাই ছিল মোয়াজ্জেমউদ্দিন কমিটি (১৯৪৬)। উক্ত সালের ৪ঠা জুলাইয়ে গঠিত এই কমিটিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন ঃ

১) মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, বাংলা সরকার, সভাপতি
২) সহকারী ডিরেক্টর, পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, মুসলিম এডুকেশন
৩) খান বাহাদুর এম. এ. আসাদ, ডিরেক্টর, পাবলিক ইনস্ট্রাকশন
৪) প্রিন্সিপাল, আলিয়া মাদ্রাসা, কলিকাতা
৫) শামসুল উলামা মওলানা বেলায়েত হোসেন, হেড মৌলবী, আলিয়া মাদ্রাসা, কলিকাতা
৬) ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭) মিঃ এ. এফ. এম আবদুল হক, স্পেশাল অফিসার, প্রাইমারী এডুকেশন
৮) মওলানা মোঃ রুকনুদ্দিন. এম. এল, এ
৯) খান বাহাদুর ওয়াহিদুল্লাহ, প্রিন্সিপাল, ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, সিরাজগঞ্জ
১০) ডঃ আই. এইচ. জোবায়রী, পি. এইচডি. প্রিন্সিপাল ইসলামিয়া কলেজ, কলিকাতা
১১) মওলানা ওবায়দুল হক, সুপারিনটেনডেন্ট, ফেনী মাদ্রাসা, নোয়াখালী
১২) সুপারিনটেনডেন্ট, দারুল উলূম, চট্টগ্রাম
১৩) সৈয়দ মুজাফফরউদ্দিন, অধ্যাপক, ইসলামিয়া কলেজ, সেক্রেটারী
১৪) শামসুল উলামা আবু নসর ওয়াহিদ, এ. আই. ই. এস
১৫) খান বাহাদুর মোঃ মুসা, এম. এ
১৬) লেঃ কর্নেল এম. হাসান, এম. এ, ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৭) মওলানা তাজাম্মুল হোসেন খান, প্রিন্সিপাল, শর্ষিনা মাদ্রাসা, বরিশাল
১৮) অনারেবল মিঃ এফ. রহমান, এম. এল. এ, রাজস্ব মন্ত্রী
১৯) মওলানা আবদুল আজিজ, এম. এল. এ

www.waytojannah.com

মোয়াজ্জেম উদ্দিন কমিটির সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবসমূহ

১) যথাশীঘ্র সম্ভব বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য একটি মুসলিম ইউনিভার্সিটি পত্তনের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হউক।

২) সেন্ট্রাল মাদ্রাসা একজামিনেশন বোর্ডকে নূতনভাবে পুনর্বিন্যাস করা হউক এবং এইজন্য স্থায়ী সেক্রেটারীসহ অফিসের বন্দোবস্ত এবং অফিসের কর্মচারী নিয়োগ করা হউক। অচিরেই এই বোর্ডের নাম পরিবর্তন করিয়া উহার নাম রাখা হউক 'মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড, বেঙ্গল।

৩) উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারী তাহার অফিসের যাবতীয় কাজকর্ম উর্দুতে সম্পাদন করিতে পারিবেন এবং এইজন্য উর্দু জানা কেরানী এবং বিশেষ মেশিন আমদানী করিতে হইবে।

৪) যুদ্ধোত্তর কালের পরিকল্পনাধীনে মাদ্রাসার জন্য একজন ইন্সপেক্টর ও তাহার আলাদা দফতর কায়েম করিতে হবে। ইন্সপেক্টরকে মুসলমান ও ইসলামী শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন হইতে হইবে।

৫) যেসব ছাত্র ইসলামী রীতিনীতি পালন করিবে না তাহাদিগকে মাদ্রাসা হইতে বহিষ্কার করা হইবে।

৬) বেঙ্গল টেক্সট বুকের অধীনে একটি সাব কমিটির পত্তন করিয়া জনশিক্ষার সহকারী পরিচালককে উহার সভাপতি নিয়োগ করিয়া মাদ্রাসার জন্য নতুন পাঠ্য-পুস্তক নির্ধারণ করিতে হইবে।

৭) ক) মাদ্রাসার শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর জন্য একটি কলেজ পত্তন করিতে হইবে। যোগ্য শিক্ষকদেরকে শিক্ষা ও অন্যান্য দেশের ইসলামী শিক্ষায়তনে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

খ) অনুরূপভাবে মাদ্রাসার ইন্সপেক্টরদের জন্য ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৮) ওল্ডস্কীম মাদ্রাসায় সরকারী সাহায্য প্রদানের বেলায় অন্যান্য বিশেষ সাহায্য তহবিল থাকার শর্তাবলীর বিলোপ সাধন করিতে হইবে।

৯) ওল্ডস্কীম বা নিউস্কীম মাদ্রাসা সামান্য সংশোধন সাপেক্ষে প্রাইমারী বিভাগ সংযোজন করিতে হইবে এবং এই বিভাগের জন্য জেলা প্রাইমারী ফাণ্ডের তহবিল হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।

১০) সকল প্রাইমারী ক্লাস হইতে ইংরেজি ভাষা উঠাইয়া দিতে হইবে।

www.waytojannah.com

১১) প্রাইমারী স্কুলসমূহের পাঠ্য বিষয় সাধারণ স্কুলের মত হইবে না। প্রাইমারী স্কুলে মুসলমানদের জন্য আলাদা ইসলামী শিক্ষা থাকিতে হইবে, মুসলমানদের শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য মকতব ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। সাধারণ প্রাইমারী স্কুলগুলিতে কুরআন ও দীনিয়াত থাকিতে হইবে।

১২) ওল্ডস্কীম মাদ্রাসার জুনিয়র ক্লাসগুলিতে বাংলা বাধ্যতামূলক থাকিবে। তবে বাংলা পড়াইবার জন্য নর্মাল পাস শিক্ষক না হইলেও চলিবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য ক্লাসে বাংলা ঐচ্ছিক থাকিবে।

১৩) বোর্ড অব একজামিনেশন্‌স্‌-এর পুনর্বিন্যাসের পর মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের কার্যকরী কমিটি নিম্ন লিখিত পদস্থ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হইবে ঃ

ক) হাইকোর্টের একজন মুসলমান জজ, সভাপতি

খ) আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, সহ-সভাপতি

গ) সেক্রেটারী থাকিবেন, একজন স্থায়ী ব্যক্তি

ঘ) আলিয়া মাদ্রাসার একজন সিনিয়র অধ্যাপক, সদস্য

ঙ) মাদ্রাসাসমূহের চীফ ইন্সপেক্টর, সদস্য

চ) সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাসমূহের ছয়জন প্রতিনিধি

ছ) ঢাকা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিয়াত বিভাগের প্রধানদ্বয়।

জ) তিনজন বেসরকারী সদস্য। তন্মধ্যে একজন শিয়া।

ঝ) জনশিক্ষার সহকারী ডিরেক্টর

মোয়াজ্জেম হোসেন কমিটির সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে সরকার মাদ্রাসার বিভিন্ন উন্নয়ন ও সংস্কারমুখী কার্যক্রমে হাত দেন। ১৯৪৭ সালের জুলাইতে মাদ্রাসাসমূহের জন্য নতুন পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন করা হয়, এবং বোর্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসায় সেসব পাঠ্য-বই প্রবর্তন করা হয়। এইখানে স্মর্তব্য যে, পরবর্তী মাসেই দেশ ভাগাভাগি হইয়া যায়। পাকিস্তান নামে একটি আলাদা রাষ্ট্র কায়েম হয়। পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অংশে চিহ্নিত হয়। ঢাকা পূর্ববাংলার রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। দেশ বিভাগের মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভাগ-বন্টন সম্পর্কে সকলেই একরকম অস্থিরচিত্ত ছিলেন। এই জটিল সময়ে আলিয়া মাদ্রাসা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়। শিক্ষা দফতর কর্তৃক গঠিত একটি কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে

www.waytojannah.com

মাদ্রাসাকে ঢাকাতে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা করা হয় এবং মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল খান বাহাদুর জিয়াউল হকের প্রাণান্ত চেষ্টায় মাদ্রাসা স্থানান্তরিত হয়। কমিটির সিদ্ধান্ত হয় যে, মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ কলিকাতাতেই থাকিবে। আরবী বিভাগ স্থানান্তরিত করিতে হইবে। Steering Committee এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রস্তাব তৈরি করেন।

(নির্দেশ নং ৮৭৭ এস. সি, তারিখ ১০ই আগস্ট ১৯৪৭ ক)

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল যে, আলিয়া মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ কলিকাতাতেই থাকিবে এবং মাদ্রাসার অন্যান্য বিভাগ পূর্ব বাংলায় স্থানান্তরিত করা হইবে। তবে শর্ত হইল, পশ্চিম বাংলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মুসলিম লীগের লীডার (এ সময় খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন) যদি ইহাতে সম্মত হন। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে যে, অন্তর্বর্তীকালীন যে সাব কমিটি গঠিত হইয়াছে, ইতিপূর্বে তাহারা মাদ্রাসার আসবাবপত্র, রেকর্ড, গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য জিনিসপত্রের একটি তালিকা তৈরি করিয়া ফেলিবেন। কেননা, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর যেন সব কিছু পূর্ব বাংলায় স্থানান্তরিত করিতে কোন অসুবিধা না হয়।

তালিকা প্রস্তুতের পর স্থানান্তর সম্পর্কিত খরচাদি কেন্দ্রীয় কমিটির দফতরে দাখিল করিতে হইবে। এই প্রস্তাব গ্রহণের পর দ্বিপক্ষীয় লোকদের স্বাক্ষরও গ্রহণ করা হইল। ভারতের পক্ষ হইতে এস. এন. রায় এবং পাকিস্তানের পক্ষ হইতে জনাব এম. এম. খান দস্তখত করেন।

মুসলিম লীগের লীডার এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং মাদ্রাসার আসবাবপত্র ইত্যাদিসহ পূর্ব বাংলায় স্থানান্তরিত করার জন্য শিক্ষক মণ্ডলীকে সম্মতিদান করেন।

দুইজন শিক্ষক ছাড়া মাদ্রাসার সকল শিক্ষক মাদ্রাসা স্থানান্তরের সহিত পাকিস্তানে চলিয়া আসিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দেশ বিভাগের এই সন্ধিক্ষণে মাদ্রাসা স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে তাহারা প্রাণান্ত পরিশ্রম করেন। মাদ্রাসার বৃহৎ লাইব্রেরী, সমুদয় গ্রন্থাবলী এবং অন্যান্য আসবাবপত্র স্থানান্তরের ব্যাপারে মাদ্রাসার শিক্ষক মওলানা ওয়াজিউল্লাহর ভূমিকা সবিশেষ প্রশংসার দাবিদার। মাদ্রাসার সমুদয় আসবাবপত্র (ইলিয়ট হোস্টেলেরও) ট্রাক বোঝাই করিয়া হুগলী নদীর একটি ফ্লাটে তুলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মওলানা আবদুর রহমান আলকাশগরী ও মওলানা হাবিবুল্লাহকে তদারকের জন্য নিয়োজিত করা হয়।

মাদ্রাসার আসবাবপত্র স্থানান্তরিত করার সময়েই মাদ্রাসার শিক্ষক মণ্ডলী ঢাকাতে চলিয়া আসেন এবং ইসলামপুরস্থ ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের হোস্টেলে কোনমতে স্থান লাভ করেন। উক্ত ফ্লাট সদরঘাটের নদীতে আসিয়া নোঙ্গর করে।

www.waytojannah.com

প্রাথমিকভাবে মাদ্রাসার আসবাবপত্র ভিক্টোরিয়া পার্কস্থ ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে তোলা হয়। অতঃপর সরকারের নির্দেশ ও পরামর্শক্রমে এই কলেজেই সকাল ৭টা হইতে দশটা পর্যন্ত মাদ্রাসার ক্লাস চালু করিবার ব্যবস্থা করা হয়। আলিয়া মাদ্রাসার অধিকাংশ ছাত্রই পূর্ব বাংলার অধিবাসী ছিল। তাহারাও মাদ্রাসা স্থানান্তরের সহিত এইখানে চলিয়া আসে। এইভাবে আলিয়া মাদ্রাসা ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রায় এক বৎসর যাবত মাদ্রাসা কলেজ ভবনে চলিল। ইতিমধ্যে কলেজের আওতায় অবস্থিত ডাফেরিন হোস্টেল নামে একটি ভবনে অস্থায়ীভাবে মাদ্রাসাকে স্থানান্তরিত করা হয়। এই হোস্টেলে হাইস্কুলের কয়েকজন ছাত্র থাকিত। স্থান সংকুলানের অভাবে মাদ্রাসার লাইব্রেরী ও অন্যান্য আসবাবপত্র স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হয়। ফলে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও আসবাবপত্র বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৯৪৯ সালে সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী মাদ্রাসাটি ডাফেরিন হোস্টেলে স্থানান্তরিত হওয়ার পর নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্লাস চলিতে থাকে।

পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই সরকার পরীক্ষা সম্পর্কিত একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে মাদ্রাসার পরীক্ষার প্রশ্নটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় করিয়া দেন। পরীক্ষা সম্পর্কিত পরামর্শ এবং ব্যবস্থাপনা একটি উপদেষ্টা কমিটির হাতে ন্যস্ত করা হয়। কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন ঃ

১) খান বাহাদুর মোঃ জিয়াউল হক, প্রিন্সিপাল, আলিয়া মাদ্রাসা, সভাপতি
২) মওলবী ইব্রাহিম খান, সেকেণ্ডারী বোর্ডের সভাপতি, সদস্য
৩) মওলানা জাফর আহমেদ ওসমানী, হেড মওলবী, সদস্য
৪) মওলানা দীন মোহাম্মদ খান, ঢাকা, সদস্য
৫) মওলনা ফজলুর রহমান সদস্য
৬) মওলনা মোজাম্মেল আলী সদস্য
৭) জনাব ওবায়দুল হক সদস্য
৮) মওলানা মোসলেহ উদ্দিন সদস্য
৯) মওলানা মনসুর আহমেদ, দারুল উলূম, চট্টগ্রাম সদস্য
১০) মওলবী সৈয়দ আলী মোহাম্মদ, সদস্য
১১) মওলবী আলহাজ মোহাম্মদ কাশেম, এম. এল. এ সদস্য
১২) মওলানা আবদুস সাত্তার, (এই গ্রন্থের লেখক) সেক্রেটারী এবং আরো অনেকে।

www.waytojannah.com

মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড

সরকারের এক নির্দেশ অনুযায়ী (নং ১১৩৪ তাং ৩রা মে '৪৯) মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন ঃ

১) জাস্টিস এ. এস. আকরাম, চীফ জাস্টিস, ঢাকা হাইকোর্ট, সভাপতি
২) প্রিন্সিপাল, আলিয়া মাদ্রাসা, রেজিস্ট্রার
৩) মওলানা জাফর আহমদ ওসমানী, হেড মওলানা, সদস্য
৪) এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, সদস্য
৫) প্রিন্সিপাল, সরকারী মাদ্রাসা, সিলেট সদস্য
৬) মওলানা আবদুল আজিজ, এম. এল. এ সদস্য
৭) প্রিন্সিপাল, শর্ষিনা মাদ্রাসা, বাকরগঞ্জ সদস্য
৮) সুপারিনটেনডেন্ট, দারুল উলূম মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম
৯) সুপারিনটেনডেন্ট, ফেনী মাদ্রাসা, নোয়াখালী, সদস্য
১০) সুপারিনটেনডেন্ট, ঝিঙ্গাবাড়ী সিনিয়র মাদ্রাসা, সিলেট, সদস্য
১১) সুপারিনটেনডেন্ট, সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসা, পাবনা, সদস্য
১২) সুপারিনটেনডেন্ট, হায়াত নগর মাদ্রাসা, ময়মসিংহ, সদস্য
১৩) ডঃ সিরাজুল হক, অধ্যাপক, ইসলামিয়াত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য
১৪) মওলবী সৈয়দ আলী মোহাম্মদ, শিয়া প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য
১৫) মওলবী রুকনুদ্দিন. এম. এল. এ সদস্য
১৬) শামসুল উলামা বেলায়েত হোসেন, ঢাকা সদস্য
১৭) প্রিন্সিপাল, ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা সদস্য
১৮) মওলানা আবদুস সাত্তার (লেখক), আলিয়া মাদ্রাসা, সদস্য
১৯) মওলানা দীন মোহাম্মদ খান, সদস্য
২০) সুপারিনটেনডেন্ট, হাম্মাদিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা সদস্য

উক্ত মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড ছাড়াও মাদ্রাসার আভ্যন্তরীণ শৃংখলা, ব্যবস্থাপনা, ক্লাসের পুনর্বিন্যাস ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদির জন্য মওলানা মোঃ আকরম খান ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে আরো একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ঢাকাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত আলিয়া মাদ্রাসাকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে নূতনরূপে গঠন করিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে নানা প্রস্তাবের মাধ্যমে মাদ্রাসার পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করেন। মাদ্রাসার উন্নতি ও হৃত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এই কমিটি ও মাদ্রাসার ছাত্ররা বিভিন্ন সময়ে সরকারের কাছে দাবি পেশ করিয়াছে। কিন্তু সরকার মাদ্রাসাকে উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। ফলে

www.waytojannah.com

মাদ্রাসার উদ্দেশ্য ও মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের যে আন্তরিক দাবিটি এতকাল অপূর্ণ রহিয়াছিল উহা পাকিস্তান সৃষ্টির পরও যেন অপূর্ণ রহিয়া গেল।

১৯৫২ সালে আলিয়া মাদ্রাসা

ডাফেরিন হোস্টেলের সর্বমোট সাতটি কামরা ছিল। মাদ্রাসার কার্যক্রম চালাইবার জন্য একটি কামরাকে দেয়াল দিয়া দুই বা তিনটি কামরা তৈরি করিয়া তাহাতে ক্লাস বসিত। মাদ্রাসার বৃহৎ লাইব্রেরীর যাবতীয় পুস্তকাদি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের দুইটি ধারকৃত কামরায় স্তূপীকৃতভাবে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু স্থানের অভাবে অস্থায়ীভাবে এই ভবনেই কোন মতে টেবিল-চেয়ার পাতিয়া বোর্ডের কাজ চালানো হইত। দেশ বিভাগের পর অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা পূরণ করিতেই সরকার গলদঘর্ম। এমতাবস্থায় কলিকাতা হইতে সদ্য স্থানান্তরিত এই প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার কীইবা করিতে পারেন? বাধ্য হইয়া এমন একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে এই ক্ষুদ্র ভবনে বন্দি করিয়া রাখিতে হইল। মাদ্রাসার এহেন দুরবস্থা দূরীকরণার্থে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল নানাভাবে চেষ্টা চালান এবং মাদ্রাসার ছাত্ররাও সভা-সমিতি ও মিছিলের মাধ্যমে নানা দাবি-দাওয়া উত্থাপন করে। কিন্তু ১৯৫৮ সাল অবধি মাদ্রাসার অবস্থার কোন রকম পরিবর্তন হয় নাই। এই সময় মাদ্রাসার স্টাফ নিম্নরূপ ছিল ঃ

পদের নাম	সংখ্যা	বেতন	পদের মান
প্রিন্সিপাল	১	২৭৫-৮৫০-১০০০	EPES
হেড মওলবী	১	২৭৫-৮৫০	EPES
এডিশনাল মওলবী	১	২৭৫-৮৫০	EPES
লেকচারার (ফেকা ও অসুল)	২	২৫০-৫৫০	EPES
সহকারী মওলবী	৫	২৫০-৫৫০	"
লেকচারার (আধুনিক আরবী)	১	২৫০-৫৫০	"
লেকচারার (ইংরেজি)	১	২৫০-৫৫০	"
লেকচারার (উর্দু)	১	২৫০-৫৫০	"
সহকারী মওলবী	৬	১৫০-৩০০	"
ইংলিশ টিচার	২	১২৫-২৫০	"
সহকারী মওলবী	৪	১২৫-২৫০	SES
হেড কারী	১	১২৫-২৫০	"
ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর	১	১২৫-২৫০	"
সহকারী মওলবী (জুনিয়র)	৩	৮০-১৬০	L.S.E.S
সহকারী কারী	২	৮০-১৬০	"
	৩২		

www.waytojannah.com

এই সময় মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল ঃ

ক্লাসের নাম	সাল ১৯৫২-৫৩	সাল ৫৩-৫৪	সাল ৫৪-৫৫	সাল ৫৫-৫৬	সাল ৫৬-৫৭
(কামেল টাইটেল)	১৪৬	১৬১	১৯২	২২৭	২২৮
সিনিয়র ক্লাসসমূহ	১২৬	১৫৯	১৩৩	১৪০	১৩৬
দাখিল ক্লাসসমূহ	৩১	২২	১৭	১৭	১৪

১৯৫৭ সাল নাগাদ প্রদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার সংখ্যা ৭২৮টিতে উন্নীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১২টি কামেল, ১২৫টি ফাজেল, ১৭৭টি আলেম ও ৪১৭টি দাখেল পর্যায়ের মাদ্রাসা ছিল।

হোস্টেল

মাদ্রসার ছাত্রাবাস সমস্যা শেষাবধি প্রকট হইয়া দেখা দিল। সাময়িকভাবে ছাত্রদের অবস্থানের জন্য ঢাকার ঘিঞ্জিগলিতে অবস্থিত দুইটি বাড়ি ভাড়া করিয়া সেখানে ছাত্রদেরকে থাকিতে দেওয়া হয়। এই বাড়ি দুইটি ও উহার পারিপার্শ্বিকতা ছাত্রদের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। কিন্তু ভবিষ্যতের আশায় ছাত্ররা এই দীনহীন পরিবেশেই থাকিয়া নিজেদের পড়াশুনা চালাইয়া যাইতে লাগিল।

মাদ্রাসার নূতন ভবন

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মাদ্রাসার জন্য নূতন ও উপযোগী ভবন এবং সব রকম সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা সচেষ্ট ছিলেন। এতদব্যতীত মাদ্রাসার ছাত্ররাও এই ব্যাপারে সভা-সমিতি ও মিছিলের মাধ্যমে দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। ফলে, একদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল এবং তদানীন্তন ক্ষমতাসীন সরকার (যুক্তফ্রন্ট) মাদ্রাসার ন্যায্য দাবি-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

১৯৫৬ সালের ২০শে মার্চ জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মাদ্রাসার ছাত্রদের দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এক নূতন বর্ণনায় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন যে, মাদ্রাসার জন্য অচিরেই নূতন ভবন নির্মাণ করিতে হইবে। সরকারকেও এই নূতন ভবন নির্মাণের জন্য ন্যূনপক্ষে ২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। জনশিক্ষা কর্তৃপক্ষের এই মতামতের উপর ভিত্তি করিয়া মাদ্রাসার তদানীন্তন প্রিন্সিপাল মওলবী মকবুল আহম্মদকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিনি পূর্ত বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া মাদ্রাসা ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কার্যাদি

www.waytojannah.com

সারিয়া ফেলেন। অতঃপর মাদ্রাসার জন্য একটা নকশা তৈরী করা হয় এবং পূর্ত বিভাগ এই নকশার ভিত্তিতে ৩৫ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা খরচের বাজেট পেশ করেন। ইহার পর নানা কার্য কারণে এই কাজ কিছু দিনের জন্য চাপা পড়িয়া যায়। অতঃপর পরবর্তী জুন মাসে জাস্টিস এস, এম, মুর্শেদ মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন, মাদ্রাসা সম্পর্কে এহেন অবহেলায় তিনি ব্যথিত হন। মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র (ইংরেজী বিভাগের) জনাব মুর্শেদ মাদ্রাসার হৃত ঐতিহ্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং উক্ত পরিকল্পিত টাকা মঞ্জুর করাইয়া মাদ্রাসার জন্য নতুন ভবন নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করেন।

১৯৫৮ সালের ১১ই মার্চ বখসীবাজারের একটি পতিত জায়গায় মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। তদানীন্তন উজিরে আলা জনাব আতাউর রহমান খান উহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

মাদ্রাসার নূতন ভবন নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে এই নূতন ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয় এবং একই সময়ে ডাফেরিন হোস্টেলস্থ মাদ্রাসাকে বখসীবাজারে স্থানান্তরিত করা হয়।

বিভিন্ন সময়ে নিয়োজিত আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল বৃন্দ

নাম	কার্যকাল
১) এ স্প্রীঙ্গার এম, এ	১৮৫০ ইং
২) স্যার উইলিয়াম নাসনলীজ এল, এল, ডি	১৮৭০
৩) জে স্যাটক্লিফ এম, এ	১৮৭০
৪) এইচ, এফ, ব্রকম্যান এম, এ	১৮৭৩
৫) এ, ই, গাফ এম, এ	১৮৭৮
৬) এ, এফ, আর. হোর্ণেল সি, আই, ই, পি, এইচ,ডি	১৮৮১
৭) এইচ প্রথেরো এম, এ (অস্থায়ী)	১৮৯০
৮) এ, এফ হোর্ণেল	১৮৯১
৯) এ, জে রো, এম, এ (অস্থায়ী)	১৮৯২
১০) এ, এফ হোর্ণেল	১৮৯২
১১) এফ, জে রো (অস্থায়ী)	১৮৯৫
১২) এ, এফ হোর্ণেল	১৯৯৭
১৩) এফ জে রো (অস্থায়ী)	১৮৯৮

www.waytojannah.com

১৪) এফ, সি হল বি, এ, টি, এস সি (অস্থায়ী) ১৮৯৯
১৫) স্যার অর‍্যাল স্টেইন, পি, এইচ, ডি, (অস্থায়ী) ১৮৯৯
১৬) এইচ, এ, ষ্টার্ক বি, এ (অস্থায়ী) ১৯০০
১৭) লেঃ কর্ণেল জি, এস এ রেঙ্কিং (অস্থায়ী) ১৯০০
১৮) এইচ, এ, ষ্টার্ক, বি এ (অস্থায়ী) ১৯০১
১৯) স্যার, এড ওয়ার্ড ভেনিসন রাস, পি, এইচ, ডি ১৯০৩
২০) এইচ ই স্টেপেল্টন, বি, এ, বি এস সি (অস্থায়ী) ১৯০৩
২১) স্যার এড ওয়ার্ড ডেনিসন রাস ১০০৪
২২) মিঃ চীফম্যান (অস্থায়ী) ১৮০৭
২৩) স্যার এড ওয়ার্ড ডেনিসন রাস ১৯০৮
২৪) এ, এইচ হারলি এম এ ১৯১১
২৫) মিঃ জে, এম, বুটামলি বি, এ (অস্থায়ী) ১৯২৩
২৬) এ, এইচ হারলি এম, এ ১৯২৫
২৭) শামসুল ওলামা কামালুদ্দিন এম, এ, আই, ই, এস১৯২৭
২৮) খান বাহাদুর মোঃ হেদায়েত হোসেন, পি, এইচ, ডি ১৯২৮
২৯) খান বাহাদুর মোঃ মুসা এম, এ ১৯৩৪
৩০) খান বাহাদুর মোঃ ইউসুফ এম, এ (অস্থায়ী) ১৯৩৭
৩১) খান বাহাদুর মোঃ মুসা এম, এ ১৯৩৮
৩২) খান বাহাদুর মোঃ ইউসুফ এম, এ ১৯৪১
৩৩) খান বাহাদুর মোঃ জিয়াউল হক এম, এ ১৯৪৩
৩৪) মওলবী শেষ শরফুদ্দিন এম, এ, এর, এল, বি ১৯৫৪
৩৫) মওলবী মকবুল আহমদ এম, এ ১৯৫৫
৩৬) মওলানা হাফেজ আবদুল হাফিজ এম, এ ১৯৫৭

www.waytojannah.com

মুসলমান প্রিন্সিপালদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শামসুল উলামা কামালুদ্দিন আহমদ
এম. এ. আই. ই এস

কলিকাতার গোড়াচাঁদ দাস রোডে কামালউদ্দিন আহমদের পৈতৃক নিবাস ছিল। পিতা মওলানা জুলফাক্কার আলী একজন সুযোগ্য আলেম এবং আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষক ছিলেন। জনাব কামালুদ্দিন আলিয়া মাদ্রাসাতে পড়াশুনা করেন এবং সুনামের সহিত মাদ্রাসার উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর ইংরেজি শিক্ষা লাভের জন্য কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯০৫ সালে এম. এ পাস করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পরই তিনি চট্টগ্রাম মাদ্রাসায় সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। এইখানে কিছুকাল কাজ করার পর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলী হন। সেখানে খুবই সুনামের সহিত অধ্যাপনা করেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পর পুনরায় তিনি চট্টগ্রামে আসেন এবং চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে আলিয়া মাদ্রাসা, কলিকাতার প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত হন। এই একই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি ১৯২৮ সাল পর্যন্ত নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। ইহার পর তিনি পর পর চট্টগ্রাম বিভাগ ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ নিয়োজিত হন। শেষ বয়সে পুনরায় তিনি কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল পদ গ্রহণ করেন এবং এইখানেই রিটায়ার করেন। তিনিই ছিলেন আলিয়া মাদ্রাসার প্রথম মুসলমান প্রিন্সিপাল।

খান বাহাদুর মোঃ হেদায়েত হোসেন. পি. এইচ ডি

১৮৮৭ সালে খান বাহাদুর হেদায়েত হোসেন কলিকাতায় জন্মলাভ করেন। পিতার নাম মওলানা বেলায়েত হোসেন। ইনি আলিয়া মাদ্রাসা হইতে ফাইনাল ক্লাস পাস করেন। পাস করার পর তিনি কিছুকাল মাদ্রাসায় শিক্ষকতাও করেন। মাদ্রাসায় কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের আরবী ফারসীর অধ্যাপক হিসাবে নিয়োজিত হন। মাদ্রাসার শিক্ষা ছাড়া তিনি আর কোন রকম ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন নাই এবং কোন ডিগ্রীও তাহার ছিল না। কিন্তু শিক্ষকতার ফাঁকে তিনি ব্যক্তিগত চেষ্টায় ইংরেজি অধ্যয়ন করেন এবং যোগ্যতা অর্জন করেন। ১৯২৮ সালে তিনি আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হিসাবে নিয়োজিত হন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যথেষ্ট আদর্শপরায়ণ এবং অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। ছোট-বড় সকলের সহিত তিনি

www.waytojannah.com

সমান ব্যবহার করিতেন। গরীব এবং অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করিতে পারিলে তিনি কৃতার্থ হইতেন। ১৯৩৪ সালে তিনি পদচ্যুত হন। তিনি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির একজন পুরনো সদস্য ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির বহু প্রকাশিত গ্রন্থের তিনি সম্পাদনা ও পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

খান বাহাদুর মোহাম্মদ মুসা, এম. এ

পশ্চিম বঙ্গে বাঁকুড়া জেলার নলডাঙ্গাতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোহম্মদ মুজতবা। স্থানীয় পাঠশালায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। মৌলবী আমজাদ হোসেন রসূলপুরীর কাছে ফারসী শিক্ষা লাভ করার পর তিনি বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে আরবী ও সামান্য ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন এবং কলিকাতা চলিয়া আসেন। ১৮৯৮ সালে আলিয়া মাদ্রাসার আরবী বিভাগে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ফাইনাল মাদ্রাসা পরীক্ষার সময় আকস্মিকভাবে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। ছেলের রোগের খবর শুনিয়া তাঁহার পিতা কলিকাতা আসেন এবং নিজেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করেন। মুসা সাহেব অচিরেই রোগমুক্ত হন। ১৯০২ সালে তিনি পুনরায় মাদ্রাসা ফাইনাল পরীক্ষা দেন এবং পাস করেন। ইহার পর তিনি মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে ভর্তি হইয়া ১৯০৫ সালে মেট্রিক পাস করেন। পাঠ্য জীবনে তিনি আর্থিক দুর্দশায় কাটান। আই. এ পড়ার সময় তিনি পড়ার খরচ চালাইবার জন্য টিউশনি করিতেন। ১৯০৬ সালে তিনি আকস্মিকভাবে হুগলী কলেজে প্রফেসর হিসাবে নিয়োজিত হন। এই চাকুরীতে থাকিয়া তিনি ১৯০৮ সালে আই. এ পাস করেন। তৎপর তিনি জুবিলী স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এ ক্লাসে ভর্তি হন। ইহার পর তিনি ঢাকা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এই সময় (১৯১০) তিনি বি. এ পাস করেন। বি. এ পাস করার পর তিনি গৌহাটি কলেজে বদলী হন এবং এক মাস পরই হুগলী মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন। এইখানে তিনি দীর্ঘ এগার বছর যাবত কাজ করেন। ইতিমধ্যে তিনি এম. এ পাসও করেন। ১৯২১ সালে চট্টগ্রাম মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল পদে নিযুক্ত হন এবং এশিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দেন। তিনি এই সময় তাহার বিখ্যাত কেতাব 'তাইসিরুল মনতেক' রচনা করেন। ১৯২৭ সালে ঢাকাস্থ ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত হন। ইহার পর ১৯৩৪ সালে আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল পদ লাভ করেন এবং ১৯৪১ সাল অবধি এই গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব পালনের পর রিটায়ার করেন। অবসর প্রাপ্ত জীবন তিনি পৈতৃক নিবাস বাঁকুড়াতে কাটাইবার জন্য চলিয়া যান। কিন্তু দেশ বিভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কবলে পড়িয়া তিনি সর্বস্ব হারাইয়া বসেন এবং রিক্ত হস্তে ঢাকাতে চলিয়া আসেন।

www.waytojannah.com

শেষ বয়সে তাহার দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি আরবী, ফারসী ও উর্দুতে প্রায় তিন হাজার কবিতা (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) রচনা করেন। নিম্ন লিখিত পাঠ্য পুস্তকসমূহ তাহার অমূল্য অবদান ঃ

ছোবহাতুল আদব, কিতাবুল ইনশা (৩ খণ্ড) আলমুজতাবা আরকানে আরবা, আল মুজতাবা মিনাল মাজতাবা ও শরহে কাসিদায়ে বুরদা (আরবী, ইংরেজি ও বাংলাতে) ইত্যাদি।

খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইউসুফ, এম. এ

১৮৮৭ সালে তিনি শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। পাঞ্জার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে গোল্ড মেডেল ও নগদ পুরস্কারসহ এম. এ পাস করেন। একজন যোগ্য শিক্ষক ও এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১৯১১ সালে মাদ্রাসার হেড মাস্টার হিসাবে নিয়োজিত হন এবং ১৯৪১ সাল অবধি অধিষ্ঠিত থাকেন। এই বছরেই তিনি আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল পদ অলংকৃত করেন। ১৯৪৩ সাল অবধি এই পদে থাকার পর রিটায়ার করেন এবং শিয়ালকোটে চলিয়া আসেন। শেষ বয়সে লাহোরের একটি বেসরকারী কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে কার্যরত ছিলেন।

খান বাহাদুর মওলানা আলহাজ মোহাম্মদ জিয়াউল হক, এম. এ

চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ থানার মোহাম্মদপুর গ্রামে ১৮৯৫ সালে তিনি জন্ম-গ্রহণ করেন। পিতার নাম আলহাজ মৌলবী আমানত আলী। চট্টগ্রাম মাদ্রাসা হইতে কৃতিত্বের সহিত উলা (ফাজেল) পাস করেন। ১৯০৭ সালে মেট্রিক পাস করেন। ১৯২১ সালে চট্টগ্রাম কলেজ হইতে বি. এ পাস করেন। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরবী ও ফারসীতে এম. এ পাস করেন এবং গোল্ড মেডেল লাভ করেন। শিক্ষালাভের পর সর্ব প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ফারসীর অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯২৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের আরবী ও ফারসীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩০ সালে রাজশাহী মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৪১ সালে হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল ও পরে (১৯৪৩) আলিয়া মাদ্রাসার (কলিকাতা) প্রিন্সিপালের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইনি প্রিন্সিপাল থাকাকালীন মাদ্রাসা ঢাকাতে স্থানান্তরিত হয়। ঢাকাতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর ১৯৫৪ সাল অবধি তিনি ঢাকাতেও প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং অবসর গ্রহণ করেন। তিনি মাদ্রাসাতে ইল্‌মে কেরাত ও তাজবিদ বিভাগের প্রবর্তন করেন। ১৯৩৫ সালে হজব্রত পালন করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের

www.waytojannah.com

সদস্য ছিলেন। তাঁহার রচিত Rhetorical Prosody ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি অনুপম পাঠ্য। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকাতে পরলোক গমন করেন।

মওলবী শেখ শরফুদ্দিন, এম. এ

১৯০০ সালের ১লা অক্টোবর পৈতৃক নিবাস ফুলবাড়ীতে (সিরাজগঞ্জ, পাবনা) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বনোয়ারী লাল হাই স্কুল হইতে ১৯১৭ সালে ১ম বিভাগে মেট্রিক পাস করেন। কারমাইকেল কলেজে পড়াশুনা করার পর ১৯২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ পাস করেন। ইহার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরবী ও ফারসীতে আলাদাভাবে এম. এ পাস করেন। এই সময় তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আবদুল্লা আলমামুন সোহরাওয়ার্দী, শামসুল উলামা বেলায়েত হোসেন ও মওলানা আবু মূসা আহমদুল হকের মতো শিক্ষাবিদ ও সুধীজনের সংস্পর্শে আসেন।

শিক্ষা লাভের পর প্রায় এক বছর যাবত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার ছিলেন এবং অতঃপর ১৯২৬ সালে রাজশাহী গভঃ কলেজে যোগদান করেন। প্রথমে লেকচারার ও পরে প্রফেসর হিসাবে এখানে তিনি ১৯৩৪ সাল অবধি কাজ করেন। এই সময় তিনি বি. এল,ও পাস করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে চট্টগ্রাম কলেজ, ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ঢাকা, রাজশাহী কলেজ ও ইসলামিয়া কলেজে (কলিকাতা) অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল (ঢাকা) পদে উন্নীত হন। এরপর ১৯৫৪ সালে তিনি আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং কিছুকাল পরই তিনি জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। তিনি ইসলামী ইতিহাসের উপর অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। সরকার তাঁহাকে Organising Committee of Central Institute of Islamic Research-এর সদস্যপদ প্রদান করেন। তিনি একজন সুপণ্ডিত ও সুদক্ষ এডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন।

মওলবী মকবুল আহমদ, এম. এ

১৯০২ সালে জনাব মকবুল আহমদ বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার পারতাশী গ্রামে জন্মলাভ করেন। শৈশবে স্থানীয় মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং পরে আলিয়া মাদ্রাসা, কলিকাতায় আসেন। অত্যন্ত সুনামের সহিত তিনি এইখানে পড়াশুনা এবং ১৯১৮ সালে ফাইনাল মাদ্রাসা পাস করেন। অতঃপর মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে ভর্তি হইয়া ১৯২০ সালে মেট্রিক পাস করেন। মেট্রিক পাস করার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই. এ, বি. এ ও এম. এ পাস করেন।

১৯২৭ সালে ইসলামিয়া কলেজে (কলিকাতা) লেকচারার নিযুক্ত হন। এইখানে এক বৎসর কাজ করার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলী হন ক্রমে প্রেসিডেন্সী

www.waytojannah.com

Contents

কলেজে প্রফেসর পদে উন্নীত হন এবং ১৯৪২ সাল অবধি এখানে অতিবাহিত করেন। ১৯৪২ সালে তিনি রাজশাহী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। তৎপর সিনিয়র সার্ভিসে উন্নীত হইয়া হুগলী ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত হন।

দেশ বিভাগের পর তিনি রাজশাহী কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি বিশেষ বেতন ও অন্যান্য ভাতাসহ এক হাজার টাকারও বেশি পাইতেন। ১৯৫৫ সালে তিনি আলিয়া মাদ্রাসার (ঢাকা) প্রিন্সিপাল হিসাবে বদলী হন। ১৯৫৭ সালে এখান হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরই সরকার তাহাকে প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পাঁচ বৎসর মেয়াদী সদস্য নির্বাচিত করেন। কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি Mr H. E. Stapleton-এর সহযোগিতায় "এগার শতকের রাসায়নিক আবিষ্কার" নামক একখানি মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেন। পরে উহা এই সোসাইটির পক্ষ হইতে প্রকাশিত হয়। এশিয়াটিক সোসইটির পত্রিকা Numiamatic-এর সম্পাদনার ব্যাপারেও তাহার সক্রিয় ভূমিকা রহিয়াছে।

ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি খুবই রক্ষণশীল ছিলেন। রীতিমত নামায-রোযা আদায় করিতেন। তাঁহার আমলেই সরকার গবেষণা কার্যের জন্য মাদ্রাসাকে মোটা অংকের টাকা প্রদান করে। শেষ বয়সে তিনি ঢাকাতেই বসবাস করেন।

হাফেজ মোঃ আবদুল হাফিজ, এম. এ

হাফেজ মোঃ আবদুল হাফিজ কলিকাতাস্থ মুসলমান পাড়ার অধিবাসী ছিলেন। শৈশবে তিনি কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন। মাদ্রাসার সাবেক শিক্ষক মওলানা হাফেজ আবদুল্লা ও শামসুল উলামা বেলায়েত হোসেনের অনুপ্রেরণা তাঁহার জীবনে বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছিল। তিনি আলিয়া মাদ্রাসা হইতে ফাইনাল মাদ্রাসা পাস করেন। অতঃপর ১৯২৪ সালে টাইটেল ক্লাসে ভর্তি হন। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে মেট্রিক পাস করেন। ১৯২৪ সালে ফখরুল মুহাদ্দেসীন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর আই. এ এবং বি. এ পাস করার পর ১৯৩৩ সালে ফারসীতে এম. এ পাস করেন। পরবর্তী বৎসরে তিনি চট্টগ্রাম কলেজের আরবী লেকচারার হিসাবে নিয়োজিত হন। ১৯৩৫ সালে তিনি আরবী সাহিত্যে এম. এ পাস করেন। ১৯৩৭ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের লেকচারার হিসাবে বদলী হন। ১৯৩৯ সালে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (ঢাকা) প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৫৭ সালে আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। জনাব হাফেজ আশৈশব অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। একজন পাকা ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবেও তাঁহার বেশ খ্যাতি ছিল।

ইফাবা ২০০৪-২০০৫/প্র-২১৮০ (উ) ৩,২৫০

www.waytojannah.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক কয়েকটি বই

	বইয়ের নাম	লেখক/সম্পাদক/অনুবাদক	পৃষ্ঠা	মূল্য
১.	বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের সূচনা	হোসেন মাহমুদ	৮৮	৩০.০০
২.	বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান	শেখ তোফাজ্জল হোসেন সম্পাদিত	২৯৬	৬২.০০
৩.	তাওবাতুন নাসূহ	শামসুল উলামা ড. নাযীর আহমদ	১৬০	৪০.০০
৪.	ইকবাল ও নজরুল কাব্য ভাবধারা	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্	১৬০	৪৬.০০
৫.	পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম	স্যার টমাস আরনল্ড	৪৪৪	১০৫.০০
৬.	তসলিমুদ্দীন রচনাবলী	তসলিমুদ্দীন	৫৪৪	১৩৮.০০
৭.	বেহেশতের সুসংবাদ পেলেন যাঁরা (১ম খণ্ড)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	৩৬০	৬৮.০০
৮.	বেহেশতের সুসংবাদ পেরেন যাঁরা (২য় খণ্ড)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	১৫২	৬০.০০
৯.	বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্	১৯২	৫০.০০
১০.	আহমদ দীদাত রচনাবলী	ফজলে রাব্বী ও মোহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা অনূদিত	২৫২	৫৪.০০
১১.	আযাদ পত্রাবলী	অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত	১৯২	২৫.০০
১২.	আল্লাহ্ পাক স্রষ্টা মহান	দেলওয়ার বিন রশিদ	২০	১৮.০০
১৩.	আরবী প্রবাদ সাহিত্য	ড. আ. হ. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী	৬২৫	১৩৮.০০
১৪.	মেঘলা রাতের তারা	ড. আসকার ইবনে শাইখ	২৩৬	৬২.০০
১৫.	আফ্রিকী দুলহান	মাহমূদুর রহমান	২৪০	৭৫.০০
১৬.	কাফেলা	ফররুখ আহমদ	১১২	৪৫.০০
১৭.	নজরুল সাহিত্য বিচার	শাহাবুদ্দীন আহমদ	৪৪৮	১১০.০০
১৮.	বন্দেগি	ফজল-এ-খোদা	১৩২	৪৮.০০
১৯.	সভ্যতা সংস্কৃতি ঃ ইসলামী প্রেক্ষিত	সংকলক	২৮৮	৬১.০০
২০.	আরজি	জেব-উন-নেসা জামাল	৭২	২২.০০
২১.	পৃথিবীর ছাদে আগুন	মমতাজ মহল মুক্তা	৮০	৩০.০০
২২.	মাহফিল	ফররুখ আহমদ	১১৬	৪৫.০০
২৩.	স্বর্ণ-ঈগল	মুহাম্মদ রুহুল আমীন খান	১৪৪	৩৮.০০
২৪.	আলোর পরশ	এম. এ. হাশেম খান	৪১৫	৮৫.০০
২৫.	Dhaka The City of Mosques	Dr. S.M. Hassan	১১৮	৫৫.০০

www.waytojannah.com